এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

# বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্র উত্থানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
## একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ


গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



Dhaka University Library
449932
449932

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার



**উপস্থাপনকারী**
মো: গোলাম সারওয়ার
শিক্ষা বর্ষ - ২০০৩-০৪
রেজিষ্ট্রেশন নং -২৬০
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

GIFT

## সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রত্যয়ন পত্র**

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য মোঃ গোলাম সারওয়ার রচিত "বাংলাদেশ ঃ জাতিরাষ্ট্র উত্থানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট" –একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। গবেষক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

এই অভিসন্দর্ভটি ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল ফাইনাল ডিগ্রীর জন্য সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করা হলো।

449932

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

স্বাক্ষর---M. Hossain

এপ্রিল, ২০১১

ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণা

আমি মোঃ গোলাম সারওয়ার এম.ফিল. গবেষক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করছি যে, অত্র গবেষণা কর্মটি আমি সম্পূর্ণ এককভাবে সম্পন্ন করেছি।

মোঃ গোলাম সারওয়ার

449932

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পৃথিবীর আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে স্বাধীন স্বার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি অনন্য ঘটনা। বাঙালী জাতির স্বার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রয়েছে দীর্ঘ এক সংগ্রাম মুখর ইতিহাস। বাঙালীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতি ক্ষেত্রে আত্ম নিয়ন্ত্রণাধীকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এত অল্প সময়ে এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে যা পৃথিবীর আর কোন জাতির ইতিহাসে আছে বলে যানা যায় না। চূড়ান্ত বিজয়ের লড়াই ৯ মাসের হলেও জাতি হিসাবে বাঙালীর মানস গঠন ও প্রস্তুতির রয়েছে এক সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস। অত্র ভূখন্ডে নির্দিষ্ট কোন্ কোন্ আর্থ সামাজিক কারণ ভাষা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাতিরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের উত্থানের অনুঘটক বা উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল তার সমাজতাত্ত্বিক কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে অত্র গবেষণার অবতারণা।

গবেষণা কর্মটি যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা আমার জন্য হয়ে উঠেছিল প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার তবুও এক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা আমার গবেষণা কর্মটিকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছে। যাঁদের নাম উল্লেখ না করা গবেষণা কর্মটির অসম্পূর্ণতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান **ড.এ.আই.মাহবুব উদ্দিন আহমেদ** যার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অন্যজন হলেন অত্র বিভাগের অধ্যাপক ও অত্র গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক **ড.খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন**, যাকে আমি বারবার গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে বিরক্ত করা সত্ত্বেও হাসি মুখে দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণাটি সফল করেছেন। এছাড়াও গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে বিভিন্ন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দের স্বরনাপন্ন হয়ে সহযোগিতা পেয়েছি, কেউ কেউ প্রুফ দেখে ও মুদ্রণ কাজে সহযোগিতা দিয়ে আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন, সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**মোঃ গোলাম সারওয়ার**

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচীপত্র


| শিরোনাম | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | | ০২-০৫ |
| ১. | ভূমিকা | ০২ |
| ১.১ | পটভূমি | ০২ |
| ১.২ | গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণা পদ্ধতি: | ০২ |
| ১.২.১ | উদ্দেশ্য | ০৩ |
| ১.২.২ | গবেষণার গুরুত্ব | ০৩ |
| ১.২.৩ | গবেষণা পদ্ধতি | ০৪ |
| ১.৩ | কার্যকরী সংজ্ঞা | ০৪ |
| ১.৪ | গবেষণার সীমাবদ্ধতা | ০৪ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | | ০৬-১৫ |
| ২.০ | সাহিত্য পর্যালোচনা | ০৬ |
| তৃতীয় অধ্যায় | | ১৬-১৯ |
| ৩.০ | গবেষণা পদ্ধতি | ১৬ |
| ৩.১ | গবেষণার গুরুত্ব | ১৬ |
| ৩.২ | গবেষণার এলাকা | ১৭ |
| ৩.৩ | গবেষণা নমুনা | ১৮ |
| ৩.৩.১ | নমুনা বিশ্লেষণ একক | ১৮ |
| ৩.৩.২ | নমুনা নির্বাচনের যৌক্তিকতা | ১৮ |
| ৩.৪ | তথ্য সংগ্রহের কৌশল | ১৯ |
| ৩.৫ | তথ্য বিশ্লেষণ | ১৯ |

*Dhaka University Institutional Repository*


চতুর্থ অধ্যায় ২০-৩৬

৪.০ তাত্ত্বিক কাঠামো ২০

৪.১ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ধারণা ২০

৪.১.১ রাষ্ট্র সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের ধারণা ২০

৪.১.১.১ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসের মতামত ২০

৪.১.২ রাষ্ট্র সম্বন্ধে গামপ্লোভিজ এর ধারণা ২৪

৪.১.৩ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওপেনহেইমার এর ধারণা ২৬

৪.২ জাতি-রাষ্ট্র উদ্ভবের তত্ত্বসমূহ ২৯

৪.২.১ হ্যান্স কোহন ৩০

৪.২.২ রুশোর মতবাদ ৩১

৪.৩ জাতীয়তাবাদ তত্ত্ব ৩২

পঞ্চম অধ্যায় ৩৭-৪৫

৫.০ বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশ: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ৩৭

৫.১ নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৩৭

৫.২ বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় ৩৮

৫.৩ সাংস্কৃতিক পরিচয় ৩৯

৫.৪ বাংলা নামের উৎপত্তি ৪০

৫.৫ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস ৪২

৫.৬ গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদান ৪২

*Dhaka University Institutional Repository*


ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৬-১০৩

৬.০ বাংলাদেশ: জাতি রাষ্ট্র উত্থানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ৪৬

৬.১ বৃটিশ শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ৪৮

৬.১.১ শিল্প ধ্বংস ৪৯

৬.১.২ কৃষি ধ্বংস ৫২

৬.২ পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ৫৬

৬.২.১ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি কাঠামো ৫৬

৬.২.২ শিল্প ও বাণিজ্য ৬৮

৬.৩ সমাজ কাঠামো ৮২

৬.৩.১ গ্রামীন জোতদার ৮২

৬.৩.২ ধনী কৃষক ৮৩

৬.৩.৩ মাঝারি কৃষক ৮৩

৬.৩.৪ ছোট ও প্রান্তীক কৃষক ৮৪

৬.৩.৫ ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুর ৮৪

৬.৩.৬ গ্রামীন কুটির শিল্প ৮৫

৬.৩.৭ বড় শিল্পপতি ৮৬

৬.৩.৮ মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি ৮৬

৬.৩.৯ শহরে মধ্যবিত্ত ৮৭

৬.৩.১০ শহুরে শ্রমিক শ্রেণী ৮৮

৬.৪ পূর্ব পাকিস্তানক কর্তৃক শোষণের চিত্র ৮৯

৬.৪.১ বহিঃসাহায্যের বন্টন ও ব্যবহার ৯১

৬.৪.২ বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ৯৪

*Dhaka University Institutional Repository*

৬.৪.৩ মুনাফা ও মূলধন বৈষম্য ১০০

৬.৪.৪ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের বৈষম্য ১০২

সপ্তম অধ্যায় ১০৪-১৬৭

৭.০ বাংলাদেশঃ জাতি রাষ্ট্র উত্থানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ১০৪

৭.১ সাতচল্লিশ পূর্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ১০৫

৭.২ ১৯৪৫ এর সাধারণ নির্বাচন ও ভারতের বিভক্তি ১০৭

৭.৩ বিভক্তি পরবর্তী সংকট ১১১

৭.৪ জটিলতার আবর্তে শাসনতন্ত্র প্রনয়ন ১১৪

৭.৫ গণতন্ত্র ধ্বংসের চক্রান্ত ১১৫

৭.৬ ভাষা আন্দোলনে জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা ১১৬

৭.৭ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ১৩৯

৭.৮ গণতন্ত্রের কবর রচনা ১৩০

৭.৯ স্বৈরশাসকের অবৈধ সংবিধান (১৯৬২) ১৩২

৭.১০ ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন ১৩৩

৭.১১ ছাত্র আন্দোলন (১৯৬৩-১৯৬৪) ১৩৫

৭.১২ ছয় দফা ও এগার দফা কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ ও আকর্ষণ ১৩৮

৭.১৩ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৪৪

৭.১৪ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ১৪৮

৭.১৫ সাধারণ নির্বাচন ১৫২

৭.১৬ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ১৪৬

৭.১৭ ২৫শে মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ১৬০

*Dhaka University Institutional Repository*


| | | |
|---|---|---|
| অষ্টম অধ্যায় | | ১৬৮-১৮৮ |
| ৮.০ | গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার | ১৬৮ |
| ৮.১. | বাঙালী জাতির উৎপত্তি গত দিকঃ নৃ-তাত্ত্বিক প্রভাব | ১৬৮ |
| ৮.২. | ঐতিহাসিক প্রভাবে জাতিরাষ্ট্র | ১৬৮ |
| ৮.৩. | বাংলাদেশে জাতীয়তার বিকাশ | ১৬৯ |
| ৮.৪ | পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া | ১৭০ |
| ৮.৫ | মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিরাষ্ট্রের অনন্য অভ্যুদয় | ১৭১ |
| উপসংহারঃ | | ১৭৩ |
| গ্রন্থপঞ্জী | | ১৮২ |
| পরিশিষ্ট-০১ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু ছবি ও দলিল পত্র | | I-XXXV |

*Dhaka University Institutional Repository*

# সারণি ও চিত্র সূচী


| | শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৬.১ | ১৮৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯১৩-১৯১৪ সাল পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানি পুঁজির পরিমাণ | ৫২ |
| ৬.২ | ১৯৫১-৬১ কালপর্বে আবাদী জমির সাথে কৃষকদের সম্পর্কের প্রকৃতি | ৫৮ |
| ৬.৩. | ১৯৫১-৬১ সালপর্বে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির বিন্যাস (লক্ষ লোকের হিসাব) | ৫৯ |
| ৬.৪ | ১৯৬০ সালে ভূমি মালিকানা ও মহাজনী ঋণের ধরন | ৬১ |
| ৬.৫ | ১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের খামার সংখ্যা ও খামার আয়তনের তুলনামূলক চিত্র। | ৬৩ |
| ৬.৬ | পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ এলাকায় আয়ে বন্টনের স্বরূপ | ৬৬ |
| ৬.৭ | খামারে উৎপাদিত ফসলের সথে সংসারের প্রয়োজনের সম্পর্কের মাত্রা | ৬৭ |
| ৬.৮ | সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্পকারখনার সংখ্যা | ৭০ |
| ৬.৯ | পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত ভারি শিল্প সমূহে ষাট দশকে উৎপাদনের পরিমাণ | ৭১ |
| ৬.১০ | ১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব বাংলার শিল্পপণ্য উৎপাদনের খতিয়ান | ৭২ |
| ৬.১১ | ১৯৬৯-৭০ সালে প্রধান প্রধান শিল্পে স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও মুনাফার হার | ৭৪ |
| ৬.১২ | ১৯৪৯/৫০-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের খাতওয়ারী খতিয়ান | ৭৮ |
| ৬.১৩ | শহরে শ্রমশক্তির বিন্যাস | ৮১ |
| ৬.১৪. | কেন্দ্রীয় রাজস্বের আঞ্চলিক উৎস ১৯৬৫- ৬৮ | ৯০ |
| ৬.১৫ | পাকিস্তানে রাজস্ব ব্যয় ১৯৫০-৭০ | ৯১ |

*Dhaka University Institutional Repository*

৬.১৬ পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার ১৯৪৭-৪৭-১৯৬৯-৭০ ৯৩

৬.১৭ পাকিস্তানের প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বরাদ্দ ১৯৪৭-৭০ ৯৪

৬.১৮ পাকিস্তানের রপ্তানী ৯৬

৬.১৯ বৈদেশিক লেনদেনের ১৯৪৭-৭০ ৯৮

৬.২০ পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বানিজ্য ১৯৪৭-৬৯ ৯৯

৭.১ নির্বাচনের ফলাফল ১৯৭০-৭১ (জাতীয় পরিষদ) ১৫৪

চিত্র-১ পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রের রাজস্ব আদায় ১৯৪৮-৫৬ ৯০

*Dhaka University Institutional Repository*

## সারসংক্ষেপ:

জাতিরাষ্ট্রের উত্থান আধুনিক প্রপঞ্চ। যা ইউরোপে উৎসারিত এবং মাত্র দুশো বছর আগে এই উত্থান পর্বের সূত্রপাত। প্রাথমিক দশায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল তিন আন্ত:সম্পর্কিত প্রক্রিয়া: রাজনৈতিক ক্ষমতার ঘনীভবন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ। বাঙালী লোক গোষ্ঠীর এথনিক সত্তার বিকাশ থেকে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে কিভাবে একটি জাতি রাষ্ট্রের উত্থিত হলো সেটির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষক একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেন। অত্র গুনগত গবেষণাটি আধেয় বিশ্লেষণের পাশাপাশি ডকুমেন্টারী ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে প্রধান পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করে সম্পন্ন করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় জাতিরাষ্ট্র হিসাবে কোন রাষ্ট্রের উত্থানের পিছনে যে সমস্ত উপাদান এবং উদ্দীপক সমূহ মৌলিক নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে তা বাংলাদেশের মত অন্য কোন রাষ্ট্র অতটা সুদৃঢ় ছিল না। তাই অত্র গবেষণায় গবেষিত এলাকা হিসেবে বাংলাদেশকে নির্বাচন যথেষ্ঠ যুক্তিকতার প্রমাণ দেয়। উক্ত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত অবিচ্ছেদ্য প্রপঞ্চ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্র সমাজের মানুষের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এটি একটি সামাজিক সংগঠন এখানে সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকারের কাঠামোবদ্ধ চর্চা, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা, তদুপরি নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক সংহতি ও ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধের উন্নয়ন ইত্যাদি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পাদন করেন। ধর্ম-বর্ন, শ্রেণী- পেশা, অঞ্চল, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের রাজনৈতিক অধিকারের সমান ও যথাযথ গুরুত্ব নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক। অন্যথায় রাষ্ট্রে উপেক্ষিত, বঞ্চিত, জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব জন্ম নেওয়া আবশ্যম্ভাবী, যার ফলে রাষ্ট্রের সংহতি বাধাগ্রস্থ হয়। যখন রাষ্ট্র উক্ত হতাশা, ক্ষোভ-বিক্ষোভের যৌক্তিকভাবে সমাধান না করে, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈবতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে জনসাধারণের দাবীকে উপেক্ষা ও অবদমন করতে থাকে, শোষণ, নির্যাতন, নিপিড়ন, নিবর্তনমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে, তখন তা অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। রাষ্ট্রের শোষিত, নিপিড়ীত, নির্যাতিত, বঞ্চিত শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর জন্ম নেয় ও তাদের আন্দোলন সংগ্রাম বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখে তথা-কথিত, ভিত্তিহীন, অবাস্তব, ভ্রান্ত-ধারণা প্রসূত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের পরিণতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় তারই প্রকৃষ্ট নজির।

অত্র গবেষনায় পাকিস্তান রাষ্ট্র-যন্ত্র কতৃক পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি শোষণ, অবদমন, নিপিড়ন, নির্যাতনের স্বরূপ ও মাত্রা এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ধ্বংসের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভবের আর্থ সামাজিক, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত সামাজিক প্রক্রিয়া অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত অবিচ্ছেদ্য প্রপঞ্চসমূহ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়

## ১. ভূমিকা:

### ১.১ পটভূমিঃ

ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ যে-যুগের ভাবধারা ও আন্দোলন, দূর্ভাগ্যক্রমে বাঙালাদেশ তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ভাবধারার উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল সমাজের স্বাভাবিক অন্তরগরজে বাইরের কোন শক্তির কিংবা বহিরাগত বা আরোপিত কোন চিন্তাধারার বা মতবাদের প্রভাবে নয়। ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ব্রিটেন প্রভৃতি কয়েকটি দেশে রেনেসাঁ ও শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে এই ভাবধারার উদ্ভবের পূর্বে পৃথিবীর কোথাও এর প্রকাশ দেখা যায়নি। এই ভাবধারার আলোকে পুরাতন বিশ্বকে বিলুপ্ত করে নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে যেসব আন্দোলন ও বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেগুলো ছিল বহিঃপ্রভাবমুক্ত ও স্বাভাবিক। ফলে এই যুগে ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা ও কাঠামো যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে বহিঃপ্রভাবজাত বিকৃতি তেমন ঘটেনি কিন্তু বাঙালাদেশ ঔপনিবেশিক নিগড়ে বন্দী থাকার ফলে তার বিকাশ স্বাভাবিক হয়নি, বৈদেশিক শাসকদের অভিপ্রায় ও প্রভাবে ততে দেখা দিয়েছে নানা বিকৃতি।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়, সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই তার ধ্বংসের বীজ তার অন্তরে নিহিত ছিল এবং এ রাষ্ট্রের স্থায়িত্বেও সম্ভাবনা ছিল একান্তই দুর্বল। পাকিস্তানের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও ছিল পাকিস্তানেরই অন্তরে।

পাকিস্তানের এই যে-অন্তঃস্থিত দুর্বলতা, একে ঘোচাবার কোন স্বাভাবিক উপায় ছিল না। আর এই দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। পূর্ব বাঙলা যখন পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয় তখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রেও আলো তার চিত্তকে স্পর্শ করতে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানবাদীরা পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার কোন স্বাভাবিক উপায় খুঁজে না পেয়ে নানা বিকৃত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল, আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব বাঙলার চিত্তে পরিপুষ্ট হতে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রতার স্বপ্ন।

### ১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণা পদ্ধতি:

একটি গবেষণা কিভাবে পরিচালিত হবে এ ব্যাপারে কতিপয় প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ পদ্ধতি অনুসরন করে গবেষণা শুরু করতে হয় এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রমের মধ্য দিয়ে তা শেষ করতে হয়। কোনো গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারন করা

*Dhaka University Institutional Repository*

হচ্ছে গবেষণার প্রাথমিক অথচ মৌলিক কাজ। এ পর্যায়ে যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যখ্যা প্রদান করা হয়। বিষয়টির বর্ণনায় ঐতিহাসিক বিকাশের প্রসঙ্গে থাকা শ্রেয়। এর ফলে বিষয়টির বর্তমান ধারণা পেতে সুবিধা হয়। সর্বোপরি নির্ধারিত বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে গবেষণা করা হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

### ১.২.১ উদ্দেশ্যঃ

গবেষণার উদ্দেশ্যে কি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গবেষক কি উদ্দেশ্যে অর্জন করার জন্য গবেষণা করেছেন, সুনির্দিষ্টভাবে তা বর্ণনা করতে হবে। যদি উদ্দেশ্যে সম্পর্কে গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তা হলে তা অর্জন করা কঠিন। তবে একটি গবেষণার একটি মাত্র উদ্দেশ্যে থাকতে পারে বা একাধিক উদ্দেশ্যে ও থাকতে পারে। উদ্দেশ্যের সংখ্যা যতোই হোক না কেন, সে গুলোকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আবার কোন গবেষকের প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় ধরনের উদ্দেশ্য গুরুত্বে ও ক্রম অনুসারে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রধান উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কাজেই গবেষণার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে পরবর্তী পর্যায়গুলেতে তা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিৎ। আমার গবেষনার ৪টি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

(i) ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ। বৃটিশদের জবরদস্তিমূলক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনে প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ।

(ii) পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ।

(iii) পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক শোষণ, নির্যাতন নীপিড়ন ও অবদমনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ।

(iv) বৃটিশদের অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া এবং এর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ।

(v) ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ৬ দফা কর্মসূচি, ছাত্রদেও ১১ দফা কর্মসূচি, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, সামরিক জান্তাদের ভূমিকা, ৭০ এর সাধারণ নির্বাচন ইত্যাদিও প্রেক্ষাপট ও ফলাফল বিশ্লেষণ ।

### ১.২.২ গবেষণার গুরুত্বঃ

প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রেই গবেষনার গুরুত্বের দিকটি বিবেচনা করা হয়। কারণ মানুষের সময় ও শ্রমের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করাই মানুষের কাম্য। কাজেই এমন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা উচিত নয় যার সামাজিক ও তাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই। যেমন– প্রশান্ত মহাসাগরে কত ফোটা পানি আছে এ বিষয়টি সম্পর্কে জানার কোন সামাজিক গুরুত্ব নেই। কাজেই এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন নেই। গবেষককে অবশ্যই যুক্তি সহকারে তার গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা

*Dhaka University Institutional Repository*

করতে হবে। জাতিরাষ্ট্র হিসেবে যে কোন রাষ্ট্রের উত্থানের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ঐ জাতির শিকড় অনুধাবনের মূল সূত্র। তেমনি জাতিরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পিছনে যে সমস্ত আর্থ সামাজিক কারণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে সে গুলোর স্বরূপ অনুসন্ধান বর্তমান গবেষণা কর্মটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। বর্তমান গবেষণা কর্মটির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো:

⇒ বাঙালী জাতির উত্থানের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ

⇒ গবেষণা কর্মের প্রাপ্তব্য তথ্য থেকে ধারণা নিয়ে সমাজ থেকে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, শোষন, নির্যাতন, নিপীড়ন বঞ্চনার অবসান ঘটাতে সর্ব সাধারণকে দিক নির্দেশনা দানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে সুখী, সমৃদ্ধশালী, উন্নত, স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ গড়তে প্রস্তাবিত এ গবেষণা কর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

### ১.২.৩ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য বা বাস্তবায়নের জন্য যে সব তথ্যের প্রয়োজন এগুলো দু'ধরনের উৎস থেকে সংগহ করা যেতে পারে। (১) প্রাথমিক উৎস (২) মাধ্যমিক উৎস। এ ক্ষেত্রে আমি মাধ্যমিক পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ইত্যাদির সাথে পরিচিতি লাভের চেষ্টা করেছি। কেননা পুস্তক পর্যালোচনা থেকে নির্ধারিত গবেষণার বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত যা কিছু পাওয়া যাবে তা গবেষণার জন্য সহায়ক হতে পারে।

### ১.৩ কার্যকরী সংজ্ঞাঃ

**বাংলাদেশঃ** একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড যার আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। যা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে উত্থিত হয়। যা সাবেক পূর্বপাকিস্তানের ভূখন্ড নিয়ে গঠিত।

**জাতিঃ** সুসংঠিতভাবে এমন একটি জনগোষ্ঠি যাদের রয়েছে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নির্দিষ্ট ভুখন্ড।

**রাষ্ট্রঃ** সমাজের মানুষের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও আচরনের একটি সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান যার আছে সার্বভৌমত্ব, নির্দিষ্ট ভুখন্ড, সরকার ব্যবস্থা ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

### ১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি গবেষণারই কিছু না কিছু দুর্বলতার দিক থাকে। পর্যাপ্ত সময়, উপযোগী পরিবেশ, কাঙ্খিত অর্থ, ইত্যাদির অভাবে যে কোন গবেষণা তার যথার্থতা হারাতে পারে এবং গবেষণার কিছু দুর্বল দিক ফুটে উঠতে পারে। গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরুপ:

*Dhaka University Institutional Repository*

⇒ আমার গবেষণাটি অতীত নির্ভর বিধায় আমাকে শুধুমাত্র মাধ্যমিক তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। যা গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা।

⇒ গবেষণা কর্মটি একটি ব্যপকতর বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত বিধায় গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য বড় অংকের একটি অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন । নিজস্ব অর্থায়নে আমাকে সীমাবদ্ধতার ভিতর থেকেই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে হয়েছে । আরও অর্থের যোগান নিশ্চিত করার সম্ভব হলে গবেষণা কর্মটি আরো ফলপ্রসু হতে পারতো।

⇒ গবেষণা কর্মটি যেহেতু বিশ্ববিদ্যলয়ের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পাদন করার শর্তটি অন্যতম যেহেতু সময়ের স্বল্পতার কারণে যথসম্ভব দ্রুততার সাথে কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। যা এই গবেষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ২.০ সাহিত্য পর্যালোচনা:

বাঙালি জাতির উদ্ভব বা বাঙালি জাতির ইতিহাস সম্পর্কে অনেক লেখা রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বর্ণনামূলক। যেহেতু আমার এই অধ্যায়নটি গবেষণা কর্ম তাই অতীত সাহিত্য থেকে আমি গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে তথ্য উপাত্ত ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরনের চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বই, অনুচ্ছেদ জার্নাল, পত্র পত্রিকা ডকুমেন্ট ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমার গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেতে যথযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। নীচে তার কিছু উল্লেখ করা হল:

রওনক জাহান-১৯৭২, জাতি গঠন (Nation Building) এবং ঐক্য সাধন প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন যার মূলত কৌশলগত ও সেবামূলক দিক রয়েছে। এ সম্পর্কে Karl W. Deutsch (1963), বলেন যে-"জাতি গঠন" বা "Nation Building" হল-

"...an architectural or mechanical model. As a house can be built from timber, bricks, and mortar in different patterns, quickly or slowly. Through different sequences of assembly, in partial independence from its setting and according to the choice, will and power of its builders, so a nation can be built according to different plans, from various materials, rapidly or gradually, by different sequences or steps, and in partial independence from its environment"

জাতি গঠন এমন একটি কৌশলগত বহুমূখী প্রক্রিয়া যার সাথে মূলত পাঁচটি কার্যক্রম সম্পর্কযুক্ত ঃ-

১। একটি নিদৃষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আঞ্চলিক জাতিয়তাবাদের চেতনার উন্মেষন ঘটানো-যা মূলত পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী নিগৃত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধের চেতনা কার্যকরী চেতনা কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

২। একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় কৃর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা।

৩। এলিট শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীভূত করা।

৪। ন্যূনতম মূল্যবোধ চেতনা জাগ্রত করা।

৫। স্বমন্বিত প্রতিষ্ঠান ও আচরনের শুদ্ধিতা গঠনের প্রক্রিয়া করা।

*Dhaka University Institutional Repository*

রওনক জাহান মূলত জাতি রাষ্ট্র গঠনের এই উপাদানসমূহের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ব্যখ্যা দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেশীত পূর্ব পাকিস্তানী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিভাবে আঞ্চলিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে যা পরবর্তী কালে ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় সরকার (central Authority) ও বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধের চেতনা উন্মেষ ঘটে তার প্রতি আলোকপাত করেছেন।

রওনক জাহান তার গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন যে দুই পাকিস্তানের মধ্যে ধর্মীয় দিক থেকে মিল থাকলেও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কারনে দুই পাকিস্তানের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব ছিলনা যার ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে জনগোষ্ঠীর ভিতর একধরনের " অভ্যন্তরীন জাতিগত ক্রোধ" ক্রমাগত ভাবে জন্ম নিতে থাকে যা পরবর্তীকালে বাঙালী জাতিকে "বাংলাদেশ" নামক একটি সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা করাতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। যার এই সকল উপাদান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-

১। ***ভৌগলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা*** ঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট আয়তন ৩,৬৫,৫২৯ হাজার বর্গমাইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫,১২৬ কর্গমাইল। অন্যদিকে ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১.৯ ও ৫০.৮ মিলিয়ন যেকানে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১৯৫১ ও১৯৬১ সালে ছিল যথাক্রমে ৩৩.৭ ও ৪২.৯ মিলিয়ন। অতএব আয়তনের দিক তেকে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে ছিল অনেক ঘনত্বপূর্ণ (জাহান, ১৯৭২) যা বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের বৃহতৎ জাতীয় শক্তির চেতনা জাগ্রত করে যেটি বাঙালী জাতিরাষ্ট্র গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

***ভাষাগত পার্থক্য*** ঃ দুই পাকিস্তানের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ছিল বিস্তর যা ১৯৫২ সালে বাঙালী জাতির মধ্যে ভাষাগত চেতনাবোধ জাগ্রত করে এবং জাতিরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে।

***সমাজ ও সংস্কৃতি*** ঃ দিক সংস্কৃতির দিক থেকে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানী সমাজ ছিল স্বল্প স্তরায়িত এবং অধিক একত্রিত যা বাঙালী জাতির মধ্যে এক ধরনের ঐক্যবোধের চেতনা জাগ্রত করে।

জাহান প্রধানত তার গ্রন্থটিতে যে সকল উপাগদানের অবতারনা করেছেন যেমন- ভৌগলিক অবস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ও স্বল্প স্তরায়িত সমাজ কাঠামো ব্যবস্থা যা ১৯৫২ সালে থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত (মুক্তি সংগ্রামরে পূর্ব পর্যন্ত) সমগ্র বাঙালী জাতি একত্রিত করে এবং বাংলাদেশ নামক স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনে বিভিন্ন দিক নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করেছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

রওনক জাহান বইটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোন থেকে চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করে পাকিস্তানের সংহতিতে ততকালীন কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারি ও শোষকের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তার বইতে অসংখ্যা তথ্য সন্নিবেশ করে বহুমাত্রিক রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। বইটিতে কোন সমাজতাত্ত্বিক কার্যকারণ সম্পর্কের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যন্ত্রটি সংহতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল তার ব্যখ্যা অনুপস্থিত। অবশ্য সমাজতাত্ত্বি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তা বইটি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না। তথাপি, বইটি থেকে যেকোনো আগ্রহী পাঠক ও গবেষক মূল্যবান তথ্য নিয়ে উপকৃত হবেন/ হতে পারেন। আমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সিরাজুল ইসলাম-এর "বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)" নামক তিন খন্ডের এই গ্রন্থটি এমনভাবে পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হয়েছে যেন নবাবি শাসনের প্রারম্ভ থেকে বাংলাদেশ বিপন্নের প্রাক্কাল পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশধারা সম্পর্কে মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। মোট ষাটটি অধ্যায় সম্বলিত এই গ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছে বিষয়ভিত্তিকভাবে। যেমন প্রথম খন্ডের বিষয় রাজনৈতিক, দ্বিতীয় খন্ডের বিষয় অর্থনৈতিক এবং তৃতীয় খন্ডের বিষয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক।

গ্রন্থটি ১৭০৪ সালে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে, তিন তিনটি ভিন্নধর্মী রাষ্ট্রের যে উত্থান পতন ঘটেছে, যথা নবাবি, বৃটিশ ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানী রাষ্ট্র, তা দেখিয়েছেন। গ্রন্থটির ভাষ্যমতে- বোধগম্য কারনেই বাঙালী সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি তথা বাঙালী জাতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও অগ্রযাত্রা ঘটেছে কোন সংক্ষিপ্ত সরলরেখায় নয়, বরং দীর্ঘ এক বক্ররেখা ধরে। এ বক্ররেখার আঁকেবাঁকে রয়েছে রাজা- মহারাজা, বানিয়া-মুৎসদ্দি, জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী, প্রশাসনিক বাবুআমলা, হিন্দু ভদ্রলোক, মুসলিম আশরাফ; আরো রয়েছে সম্প্রদায়ভিত্তিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য, আধিপত্য-অধীনতা সম্পর্কের আর্থসামাজিক কাঠামো। এ কাঠামোর সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হচ্ছে এতকালের লালিত বাঙালী জাতিসত্তা পরিত্যাগ করে হিন্দু ভদ্রলোকদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিলীন হওয়া আর মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে দীক্ষা গ্রহণ এবং অচিরেই আবার বাঙালী জাতীয়তাবাদে প্রত্যাগমন। এসব ঘটনা প্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার এক যৌথপ্রয়াস এই গ্রন্থটি।
গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের উদ্ভব বিকাশ সংক্রান্ত অজস্র তথ্য রাশির সমাহার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষকগণ ও উৎসাহী পাঠকগণ সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।
গ্রন্থটির শিরোনাম যেহেতু বাংলাদেশের ইতিহাস, সুতরাং এখানে বাংলাদেশ জন্মের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। উক্ত ঘটনা সমূহের কার্যকারণ সম্পর্ক বইটিতে অনুপস্থিত যা লেখকের দাবি এবং উক্ত বইটি রচনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যও নয়। (ইসলাম, ১৯৯৩)

*Dhaka University Institutional Repository*

শেখ হাফিজুর রহমান-২০০১, জোনাকী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত," *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*" শিরোনামের গ্রন্থটিতে "গত পাঁচ ছয় দশকে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় সে অভূতপূর্ব বিবর্তণ সুচিত হয়েছে তার একটি বিশ্লেষণমূলক বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এ দেশের জনগণ বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানরা কিভাবে মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বেড়াজাল ছিন্ন করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হল তার একটা তথ্যনির্ভর পর্যালোচনা করেছেন শেখ হাফিজুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ফলে। কিন্তু এই যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানী সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে বাংলার এই অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই বাংরাদেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এক ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়েছিল সেটা পূর্বে কখনও সম্ভব হয় নি।

গ্রন্থটি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ (১৯৪৭), ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র সালে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের বিজয় যার ফল বাঙালিরা ভোগ করতে পারেনি, ৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা, এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরেছে। এখানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি আলোচিত হয় নি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকালীন ইতিহাসের উপর এটি নিঃসন্দেহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বই (রহমান, ২০০১)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয়া থেকে বিদেশী উপনিবেশবাদ বিদায় নিতে বাধ্য হয়। এই বিষয়ে বহু গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশী উপনিবেশবাদের অপসারণের পর যে অভ্যন্তরীণ (বা স্বদেশী) উপনিবেশবাদ তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে- যেমন হয়েছিল বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭-৭১ সময়ে এ সম্পর্কে খুব বেশি পুস্তক রচিত হয়নি। যেগুলি রচিত হয়েছে, তাদের অনেকগুলিই- বিশেষত সেগুলো পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত- আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের স্বরূপ উন্মোচনে ব্যর্থ হয়েছে প্রধানত, দুটি কারণে। এক বিদেশী গবেষকদের ক্ষমতাসীন সরকারের উপর নির্ভরশীলতা। যদি দীর্ঘকাল গবেষণা অব্যাহত রাখতে হয়। তাহলে বারবার ও ঘন ঘন সরকারের অনুমতি নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রে (যেমন তৎকালীন পাকিস্তানে) প্রবেশ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সত্যকথন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, বিদেশী প্রবেশাধিকার বিনষ্ট হতে পারে, বিশেষত যে রাষ্ট্র (যেমন পাকিস্তানে) অধিকাংশ সময়েই সামরিক শাসন প্রচলিত থাকে। দুই, পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের ভাষা- বাংলা ভাষা ব্যবহারে প্রায়শই পারদর্শী নন। ফলে আভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদের ত্রিবিধ রূপের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক উপলব্ধি ও বর্ণনা তাদের সাধ্যাতীত হওয়াই স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

হারুন-অর-রশিদ রচিত 'বাঙালী ও বাংলাদেশ ০-২০০৫' শিরোনামের গ্রন্থটি পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বাঙালী এই সাধারণ সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বাঙালী এই সাধারণ সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যে যুগ থেকে এই বইয়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে যুগের বাঙালী আর আজকের বাঙালী ঠিক একই অর্থ সূচিত করে না। যে ভূ-খন্ড কিছুকাল আগে বঙ্গদেশ বলে পরিচিত ছিল, প্রাচীন যুগে তার বিশিষ্ট কোন নাম ছিল না। এর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, সূক্ষ্ম, রাঢ় বাত্রালিত, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ইত্যাদি। মুসলমান যুগে এই সমুদয় অঞ্চল একক 'বাঙালা' নামে পরিচিত লাভ করে। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই নামের জনক। এ সময় থেকে সমগ্র দেশ বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

আর উনিশ শতকে বাংলাদেশের অধিবাসীরা নিজেদের এক স্বতন্ত্র বাঙালী জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে। উনিশ শতকের পূর্বে বাঙালার কোন স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না বললেই চলে। তখন বাংলাদেশ মুগল সাম্রাজের একটি অংশ মাত্র ছিল এবং আঠারো শতকে যখন এই সাম্রাজের পতন ঘটে তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে পূর্ব ভারতের এই অঞ্চল একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। মূলত ইংরেজ আমল থেকেই বাঙালী স্বাধীনতার জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে থাকে। আর তখন থেকেই বাঙালীর ঘটে বহুমুখী স্ফুরণ। কিন্তু বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতি প্রশ্নটি উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি হলেও ১৯৪৭ সালে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের নেতৃত্ব অবৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় উন্মাদনায় পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র তৈরী করা হয়। বাংলার পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রে। হাজার মাইলের ব্যবধানে এ রাষ্ট্রের দু' অংশের মধ্যে সেতু বন্ধনের জন্য ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়। ইসলাম বন্ধনের অন্তরালে পাকিস্তানী অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদ শুরু হতে সময় লাগেনি। ফলে বাঙালীর মোহভঙ্গ হতে দেরী হয় নি। নতুন করে শুরু হয় বাঙালীর স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বাঙালীর হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিঃসন্দেহে ১৯৭০ সালের মুক্তিযদ্ধ। এ যুদ্ধে বাঙালী জনগোষ্ঠী পেয়েছে তার স্বতন্ত্র স্বাধীন আবসভূমি বাংলাদেশ। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস ক্রমানুসারে দেওয়া রয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী লেখা এই গ্রন্থে স্থান পায় নি (রশিদ, ২০০১)।

লেঃ কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী এবারের সংগ্রাম স্বাধীনাতর সংগ্রাম নামক গ্রন্থটিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রামান্য দলিল হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াপত্তন বর্ণনা করতে গিয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক সকল ঘটনা প্রবাহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পুলিশী অত্যাচার ও উৎপীড়ন, আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহীতার ও নাশকাতামূলক তৎপরতার মিথ্যা অভিযোগে

*Dhaka University Institutional Repository*

অভিযুক্ত করে শুরু হয় তাদের উপর ধরপাকড় ও জেল জুলুম এবং এই নির্যাতন অত্যাচারই কিভাবে বাঙালীর মনে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ঘটনা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা পাওয়াকে তিনি এভাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন–''বহু বেদনা ,বহু যাতনা,বহু ক্লেদাক্ত ও কণ্ঠকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে অবশেষে বাংলা পেলো অন্যতম রাষ্ট্রভাষা তথা জাতীয় ভাষার মর্যাদা। আমরা আবার দেখতে পেলাম মুদ্রা, মানি অর্ডার ফরম ও ডাক টিকেটের উপর ইংরেজী ও উর্দুর সাথে বাংলার ব্যবহার। জয় হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জয় হলে বাংলার মানুষের। (চৌধুরী,১৯৯১)

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উত্থানে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল,তা তিনি এ সংক্ষেপে দেখানের চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন জনসাধারনের অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুই পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর এবং ঐ সময় থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনভার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের কুক্ষিগত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে কেন্দ্রীয় শাসমকগণ প্রথম থেকেই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারনের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিই দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান তাদের কাছে একটি অলিখিত উপনিবেশ রূপেই পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এসব বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যখন দেউলিয়াপনার সম্মুখীন তখনই তার প্রতিকার দাবীতে ১৯৬৬ সনে শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলার মুক্তির সনদ ৬ দফা ফর্মূলা পেশ এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন দেশের আপামর জনসাধারণকে দিল পথের নির্দেশ। যা পরবর্তীতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ করতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয় অংশে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণ বাঙালীর সশস্ত্র প্রতিরোধ ও পশ্চাদপসরনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এ অংশে লেখক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগনের প্রতিরোধ ও পাকিস্তানি বাহিনীর পতনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সেক্টর ভিত্তিক যুদ্ধের ঘটনা, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফোর্স যেমন, জেড ফোর্স, এস ফোর্স কে ফোর্স, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনীর ভূমিকা ইত্যাদি এ অংশে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির তৃতীয় অংশে মুক্তিবাহিনীর পুনর্গঠন, প্রশিক্ষণ, সংগ্রাম ও বিজয়লাভের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থটি মূলত বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ।

Subbrato Ray Chowdhury তার The Genesis of Bangladesh গ্রন্থে পূর্ব বাংলার ঔপনিবেশিক অবস্থা, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, আন্তজার্তিক আইন ও বাংলাদেশে জাতিসংঘের ব্যর্থতা এবং পাকিস্তানি জান্তা ও বাংলাদেশ সরকারের বৈধতা এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটি প্রধানত আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রচিত। লেখক মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার

Dhaka University Institutional Repository

মূলে ছিল সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ক্রমাগত অস্বীকৃতি জ্ঞাপক (Chowdhury, 1972, P.7)। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এ অধ্যয়নে স্থান না পেলেও এ বিষয়টি অত:প্রোতভাবে জড়িত। তাই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক দলিলপত্র সংক্রান্ত লেখা ও রিভিও অত্যাবশ্যক। দলিলপত্র সংক্রান্ত লেকনীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (ষোল খন্ড)। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে ষোল খন্ডে পনের হাজার দলিল প্রকাশিত হয়। এ দলিলপত্র ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে। দলিলপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে মুক্তিযদ্ধের পটভূমি, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ডে মুজিবনগর সরকার, ষষ্ঠ খন্ডে বাঙালি গণমাধ্যম, সপ্তম খন্ডে পাকিস্তানি দলিলপত্র, অষ্টম খন্ডে স্বাধীনতা বিরোধীদের কার্যক্রম, নবম হতে একদশ খন্ড পযন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম, দ্বাদশ ও এয়োদশ খন্ডে বিদেশী প্রতিক্রিয়া, চর্তুদশ খন্ডে বিশ্ব জনমত, পঞ্চদশ খন্ডে সাক্ষাৎকার এবং সোড়শ খন্ডে ঘটনাপঞ্জী ও ছবি রয়েছে। দলিলপত্রে তৃণমূল পর্যায়ের গণহত্যা ও তার প্রতিরোধ কৌশল অনুপস্থিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও তার নেতা-কর্মী, ছাত্র সংগঠন ও এর নেতা-কর্মী, পেশাজীবী সংগঠন ও তার নেতা-কর্মী, সাধারণ নাগারিক, গ্রামীণ জনসাধারণের অংশগ্রহণ তুলে ধরা হয়নি বলেই মনে হয়। এছাড়া এ দলিলপত্রের বিরুদ্ধে প্রচুর তথ্য বিকৃতির অভিযোগ পাওয়া যায় (হোসেন, ১৯৯০)।

*আবুল মাল আবদুল মুহিত রচিত 'বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব' একটি মূল্যবান গ্রন্থ।* ষোল অধ্যায়ের এ গ্রন্থটিতে বাংলার প্রাথমিক ইতিহাস, ভৌগলিক বর্ণনা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সৃষ্টির পঠভূমি, একাত্তরের গণহত্যা, স্বাধীনতা ঘোষণা, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ, নামক প্রথম অধ্যায়ে- বাংলাদেশের ভৌগলিক কাঠামো, মানবগোষ্ঠী, ভাষা, এলাকা ও ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাকিস্তানের উদ্ভব, শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানদের অবস্থান, বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিকতা, নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, হিন্দু মুসলিম ঐক্য, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পাকিস্তান দাবি, ১৯৪৫, ৪৬ এর সাধারণ নির্বাচন ও ভারত বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাতিগঠনের দুরুহ দায়িত্ব ও সঙ্কীর্ণতার জন্ম, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সঙ্কট, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া, পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন : ১৯৫৪, গণতন্ত্র ও সংবিধানের ওপর নতুন আক্রমণ, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও ষড়যন্ত্রের বাজনীতি, আইউবের ক্ষমতায় কেন্দ্রায়ন, রাষ্ট্র পরিচালনীয় আমলাতন্ত্রের প্রভাব ও বাঙালিদের বঞ্চনা, সামরিক বাহিনী ও গণতান্ত্রিক ব্যর্থতা, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পদদলন, ভারত বিভাগকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে শোষণের প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এ গ্রন্থখানিতে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, গণঅভ্যুত্থান, মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, ইত্যাদি রাজনৈতিক পটভূমি এ গ্রন্থের আলোচনার মূখ্য বিষয়। এছাড়াও বাংলাদেশে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও মনোবল অব্যাহত রাখার উদ্যোগ বিষয়ক মূল্যবান আলোচনা এ গ্রন্থের শেষের দিকে স্থান পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে এ গ্রন্থে পটভূমির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এ গ্রন্থে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে যদিও তিনি যথেষ্ট উৎসের উল্লেখ করেছেন (মুহিত, ২০০০)।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রচিত বাঙালির জাতীয়তাবাদ গ্রন্থটির ভাষ্য–জাতীয়তাবাদের পক্ষে যেমন বিপক্ষেও তেমনি অনেক কিছু কথায় আছে এবং থাকবে। জাতীয়তাবাদ আর দেশপ্রেম এক বস্তু নয়; জাতীয়তাবাদ আরও বেশি রাজনৈতিক, বাঙালীর জাতীয়তাবাদ ভাষা ভিত্তিক এবং আত্মরক্ষামূলক। কথা ছিল জাতীয়তাবাদ বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ করবে, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। না-ঘটার কারণ হচ্ছে বৈষম্য। বৈষম্যের মূল্য প্রকাশ গুলোর মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণী বিভাজন সাম্প্রদায়িক কারণে বাংলা বিভক্ত হয়েছে, পরে প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বাংলাদেশের, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও সব বাঙালী যে ঐক্যবদ্ধ তা না, এখানে ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে রয়েছে শ্রেণী দূরত্ব।

ঐক্যের অন্তরায়গুলোকে চিহ্নিত করাই এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। অনৈক্য সৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও রাজনীতির ভূমিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তদুপরি জাতীয়তাবাদ নিজেই রাজনীতির সংগে যুক্ত; সে কারনে রাজনীতির আলোচনা নিয়েই বইয়ের দীর্ঘতম পরিচ্ছেদ। বৈষম্য রয়েছে অর্থনীতিতে, শিক্ষা, নারীর অবস্থানে। ভাষার দায় ও দায়িত্ব ছিল ঐক্য গড়ায় সাহায্য করা; কিন্তু ভাষা যে কাজ করতে পারেনি। প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাকে বাঙালী মধ্যবিত্তের অপারগতা ও অনৈক্য সৃষ্টির কারণ বটে। আমলাতন্ত্র বৈষম্যকে পুষ্ঠ করেছে এবং দায়িত্ব নিয়েছে তার সংরক্ষণের। বাঙালী ও বাঙালীর জীবনে আঞ্চলিক পার্থক্যও অসত্য ছিল না। বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। অবতরনিকা থেকে শুরু করে উপসংহার পর্যন্ত আমলে একটিই পর্যালোচনা, যেটিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ইংরেজ আগমনের পর থেকে; বইয়ের কাহিনীর সূত্রপাত মেলান থেকেই; শেষ হয়েছে সম্প্রতিক কালে এসে। যে বক্তব্যটি প্রছন্নভাবে অধিকাংশ সময়ে এবং কখনো প্রকাশ পেয়েছে তা হলো ঐক্যের সকল আয়োজনের আড়ালে জাতিগঠনের পরিবর্তে ভাগ্য গঠনের কাজটাই ঘটেছে (চৌধুরী, ২০০০)।

Talukder Maniruzzaman রচিত Bangladesh Revolntion and its Aftermath উল্লেখযোগ্য লেখক একজন বিদগ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জাতি হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কারণ এবং পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহে এর ভূমিকা অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। লেখক আরো উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের সৃষ্টি একটি জাতীয় বিপ্লবের চেয়ে বেশি

Dhaka University Institutional Repository

কিছু ছিল । তার মতে, পাকিস্তানি শাসকচক্রের নীতি এবং কৌশলই পূর্ব বাংলার নেতাদেরকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করে (Maniruzzaman : P-1)। গ্রন্থটির দশটি অধ্যায়ে যথাক্রমে পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণী, স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন, আঞ্চলিক রাজনীতি, ছাত্র আন্দোলনের বিকাশ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলন, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভারতের ভূমিকা বামপন্থীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থটিতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে (Maniruzzaman : 1980)।

Mizanur Rahman Shely রচিত Emengenee of a New Nation in a Muslty Pollar world গ্রন্থে বাংলাদেশ কেন এবং কিভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবিকৃত হল তা তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদের ভূমিকার পাশাপাশি পরাশক্তি সমূহের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের বৈষম্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বঞ্চিত করায় ঐ শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের অনুভূতি তীব্রতর হতে থাকে। এ অনুভূতি তাদেরকে প্রথমে স্বাধীকার এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যোগায়। অর্থাৎ জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা জাতি-রাষ্ট্র বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এবং যাদের জাতীয়তাবাদের বোধ অনেক বেশী শক্তিশালী, তাদের ভূমিকাকে মূখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আর্থ-সামাজিক কারণ যেমন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করেননি (Shelly, 1982)।

আবু আল সাঈদের গ্রন্থ "আওয়ামী লীগের ইতিহাস" স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ওত:প্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। অত্র গ্রন্থটিতে আবু আল সাঈদ বাংলাদেশ নামক যে নতুন জাতিরাষ্ট্রের উত্থান তার পিছনে যে রাজনৈতিক দলটির অনবদ্য অবদান সে বিষয়টিকে একটি তথ্য মূলক ও অনুসন্ধানী প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। অত্র গ্রন্থটিতে কেবল রাজনৈতিক দলের ইতিহাস গাথা নয়, বাংলাদেশের অভূত পূর্ব জনজাগরনের স্বরূপ এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। অত্র গ্রন্থে ১৯৪৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কিভাবে একটি রাজনৈতিক দল জাতিসত্তা বিকাশে সাংগঠনিক তৎপরতার পাশাপাশি জাতিরাষ্ট্র বিকাশের মৌলিক উৎপাদন সমূহের ভূমিকা কি তা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে অত্র গ্রন্থটি ভাষা আন্দোলন, আওয়ামী মুসলিম লীগের অধিবেশন, যুক্তফ্রন্ট ও ২১ দফা, চুয়ান্নর নির্বাচন শেখ মুজিবের জেল ও মুক্তি এবং মৌলিক গণতন্ত্র ইত্যাদি ইস্যুগুলোতে আওয়ামী লীগের কি ভূমিকা ছিল এবং জাতির রাষ্ট্রে উত্থানের ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দল কিভাবে জনগনের চিন্তা জগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছে। এছাড়াও অত্র গ্রন্থটিতে

*Dhaka University Institutional Repository*

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান, আওয়ামী লীগ থেকে ভাসানীর পদত্যাগ, আইউবী আমল, মার্শাল ল, এগারো দফা, ছয় দফা, ন্যাপ এ ভাঙ্গন, ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি বিষয় সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

সব শেষে এসে আবু আল সাঈদগণ অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন ও ৭১ এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ছাত্র সমাজ ও আম জনতার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ভূমিকা কথা তুলে ধরেছেন।

তবে অত্র গ্রন্থটিতে একটি রাজনৈতিক দলের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রেক্ষাপটকে গভীর গুরুত্বের সাথে দেখেছেন । অত্র গ্রন্থটি রাজনীতি ও সমাজ ভাবনায় উদ্বেলিত গবেষণা কর্মীদের আগ্রহ ও উদ্দিপনার অন্যতম পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রন্থটিতে প্রচুর তথ্য ও বিশ্লেষন এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্টক্ষেত্রের গবেষকগণ নিজ নিজ গবেষণায় পর্যাপ্ত পরিমানে তথ্য উপাত্ত পেলেও তথ্য সমূহের কার্যকরণ সম্পর্কের নির্দেশ অনুপস্থিত। অবশ্য গ্রন্থকারও তেমন দাবি করেন না।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা থেকে জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উত্থানের পিছনে যে সমস্ত উপাদানগুলি সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে সে গুলোর বিস্তারিত বিবরণ ও চিত্র পাওয়া গেলেও জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উত্থানে উক্ত শোষণ পিড়ন, নিপিড়ন নির্যাতন, নিবর্তন ইত্যাদি উপাদান গুলো কোন কার্যকারণ সম্পেকের মাধ্যমে যুক্ত তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। অত্র গবেষণা থেকে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও ইহাদের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে উক্ত উপাদান গুলোর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লোষণের মাধ্যমে জাতি রাষ্ট্র উত্থানের সামাজিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে চেষ্টা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

## ৩.০ গবেষণা পদ্ধতি

### ৩.১ গবেষণার গুরুত্ব:

প্রতিটি গবেষণা কর্ম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সু-নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। গবেষণা হল সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। সুশৃংখল অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে বোধগম্য ও যাচাই যোগ্য জ্ঞান সংযোজন প্রক্রিয়াই হলো গবেষণা (MacDonald, 1960), জ্ঞান সংশোধন বা যাচাই পূর্বক সাধারণীকরণের উদ্দেশ্যে বস্তু, প্রত্যয় বা প্রতীক নিয়ে কাজ করা, যাতে করে সেই জ্ঞান তত্ত্ব সৃষ্টি বা কোন কৌশল অনুশীলনে সহয়তা করতে পারে। আমার এই গবেষণাটি গুনবাচক গবেষণা। এখানে বাংলাদেশ নামক জাতি-রাষ্ট্রের উত্থানের প্রেক্ষাপট বিস্তারিত জানার জন্য গুণবাচক পদ্ধতিই যথাপোযুক্ত। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম এবং তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতি অনেক যুক্তিযুক্ত ভূমিকা পালন করেছে। অত্র গবেষণায় গুণবাচক পদ্ধতি অনুসরণের কারণ সমূহ নিম্নরূপ ঃ

- ⇨ অত্র গবেষণাটি ইতিহাস নির্ভর। ইতিহাস যেহেতু পরিমাণ করা যায় না কিন্তু অনুধাবন বা বিশ্লেষণ করা যায় সেহেতু গবেষণাটি গুণবাচক পদ্ধতিই অনুসরণ করে।
- ⇨ গুণবাচক গবেষণা প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও সামাজিক জীবনের উপর আলোকপাত করে থাকে ঠিক তেমনি অত্র গবেষণাটি ও বাংলাদেশ জাতি-রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করে বিধায় গবেষণাটি গুণবাচক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে।
- ⇨ পরিমাণ গত গবেষণার সিদ্ধান্ত বা ফলাফল গুণবাচক গবেষণার মত ততটা সুনিশ্চিত নয়। অত্র গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে একই ধরনের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি নাও হতে পারে। ফলে অত্র গবেষণাটি গুণবাচক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে।
- ⇨ যেহেতু এই গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে তত্ত্ব নির্মাণ অর্থাৎ জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের উত্থানের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের স্বরূপ উন্মোচণ যা আরোহ পদ্ধতিকে ইঙ্গিত করে ফলে অত্র গবেষণাটি গুণবাচক গবেষণার আশ্রয় গ্রহণ করে।
- ⇨ অত্র গবেষণার আরেকটি অন্যতম পদ্ধতি হল আধেয় বিশ্লেষণ।
- ⇨ অত্র গবেষণার চলক সমূহ পরিমাপ করা খুবই কঠিন এবং জটিল। ফলে অত্র গবেষণার গুণবাচক পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

- ⇨ সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার কার্যকরণ সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে গুণবাচক গবেষণা ঘটনার বিষয়বস্তু অনুধাবন ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে ক্রমেই তত্ত্ব নির্মানের পথকে উন্মোচন করে। অত্র গবেষণার গবেষককে মাধ্যমিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ঘটনার বিষয়বস্তু ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষনের মাধ্যমে গবেষককে ক্রমেই তত্ত্ব নির্মানের দিকে এ গিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে অত্র গবেষণাটি গুণবাচক পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করেছে।
- ⇨ অত্র গবেষণায় প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে পৌঁছানো হয়েছে। এবং পরবর্তী ধাপ থেকে সংগৃহীত তত্ত্ব তাৎক্ষনিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে পৌঁছানো হয়েছে। এভাবে গবেষক ক্রমেই তত্ত্ব নির্মানের পথকে প্রসারিত করেছে। নিম্নে বিষয়টিকে এভাবে দেখনো যায়:

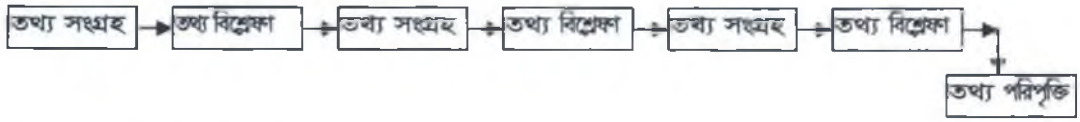


## ৩.২ গবেষণার এলাকা ঃ

গবেষণার এলাকা নির্বাচন সামাজিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকাংশ সামাজিক গবেষক তাদের গবেষণার জন্য বৃহৎ অঞ্চল অপেক্ষা ক্ষুদ্র অঞ্চলকে পছন্দ করেন। কারণ গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও অর্থের সংকুলান হয়তো নাও হতে পারে। অত্র গবেষণার বিষয়টি হল- বাংলাদেশ : জাতি-রাষ্ট্র উত্থানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ একটি সমাজ তাত্তিক বিশ্লেষণ।

এই গবেষণার জন্য গবেষক বৃহত্তর অর্থে-গবেষণা এলাকা বলতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশকেই নির্বাচন করেছেন। কেননা তৎকালীন জাতি-রাষ্ট্র উত্থানে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণকে স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে একটি নিদৃষ্ট ভূ-খন্ডের প্রয়োজনের চেতনাকে জাগ্রত করেছিল। তাই গবেষণার এলাকা হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করার কারণ সমূহ নিরূপ-

- ⇨ ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে কোন রাষ্ট্রের উত্থানের পিছনে যে সমস্ত সামগ্রিক উপাদান এবং উদ্দীপক সমূহ মৌলিক নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে তা বাংলাদেশের মত অন্য কোন রাষ্ট্রে অতটা প্রকট ছিল না। তাই অত্র গবেষণায় গবেষিত এলাকা হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচন যথেষ্ট যুক্তিকতার প্রমাণ দেয়।
- ⇨ সুনির্দৃষ্ট পর্যাপ্ত তথ্যের সমাহার থাকায় গবেষণা এলাকা হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করা হয়েছে।
- ⇨ জাতি-রাষ্ট্র উত্থানের পিছনে যে সমস্ত মৌলিক উপাদান থাকা দরকার তা বাংলাদেশে বিদ্যমান বিধায় গবেষক গবেষণা এলাকা হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

⇨ অত্র গবেষণায় গবেষকের পরিচিতি এলাকা এবং তথ্য সরবাহের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকায় গবেষণা এলাকা হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করা হয়েছে।

## ৩.৩ গবেষণা নমুনা ঃ

সামাজিক গবেষণায় নমুনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্রকের পরিবর্তে নমুনা নিয়ে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বেশি মাত্রায় গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হয় বলে সমাজ গবেষক মনে করেন। আমার এই গবেষণা কর্মে যেহেতু গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে তাই এখানে নিঃসম্ভাবনা নমুনার (Non probability sampling) অংশ হিসাবে উদ্দেশ্য মূলক নমুনায়ন (purposive sampling) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণার এলাকাটি উদ্দেশ্য মূলক ভাবে নির্বাচন করায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি গবেষণা কর্মটির জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এবং এই গবেষণায় নিদৃষ্ট কোন সমগ্রক নেই তাই বৃহৎ অর্থে গবেষণাটির নমুনা পূর্ব বাংলার তৎকালীন জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। যারা বাংলাদেশের জাতি-রাষ্ট্র উত্থানে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা সহ অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল।

### ৩.৩.১ নমুনা বিশ্লেষণ একক ঃ

গবেষণায় গবেষক যার বা যে বিষয়ে জানতে বা অনুসন্ধানে আগ্রহী ঐবিষয় বা ব্যক্তিকে বিশ্লেষণের একক বলে চিহ্নিত করে থাকে। এই গবেষণায় বিশ্লেষণের একক হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করা হয়েছে।

### ৩.৩.২ নমুনা নির্বাচনের যৌক্তিকতা ঃ

নমুনা হল সমগ্রক বা একক সমষ্টির একটি প্রতিনিধিত্বশীল অংশ। এই গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (pursposive sampling) অবলম্বন করা হয়েছে। যার মূল কথা এখানে অনুসন্ধানকারী উদ্দেশ্য মূলক ভাবে তার বিচার বুদ্ধি ও পছন্দ অনুযায়ী নমুনায়ন করেন। এ কৌশলে গবেষক নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে নমুনা চয়ন করেন। অত্র গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন নির্ধারণের কারন হল-

⇨ বৃহৎ আকারে সমগ্রক থেকে নমুনায়ন সুবিধাজনক;

⇨ নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের নিশ্চয়তা;

⇨ গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;

⇨ স্বল্প সময়ে প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নির্বাচন।

*Dhaka University Institutional Repository*

## ৩.৪ তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঃ

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তথ্য সংগ্রহের কৌশল যত বেশী বৈজ্ঞানিক হবে গবেষণা তত বেশী যথার্থ ও নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করবে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক মাধ্যমিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন। অর্থাৎ গবেষক এক্ষেত্রে বিভিন্ন বই, পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল, আর্কাইভ, জাতীয় পত্র পত্রিকা, দলিল, দস্তাবজ ও প্রত্নতাত্তিক নির্দশনের উপর নির্ভর করে তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও গবেষক এখানে অতীতে গবেষণা লব্ধ ফলাফল ও বিভিন্ন আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং মুক্তি সংগ্রামের সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী সেক্টর কমান্ডারদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিব্যক্তি আমার এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

## ৩.৫ তথ্য বিশ্লেষণ ঃ

যেহেতু এটি একটি গুণগত গবেষণা এবং গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ প্রধানত ডেস্ক নির্ভর সেক্ষেত্রে গবেষণার সংগৃহীত ঐতিহাসিক তত্ত্ব উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যৌক্তিকতা বিচার-বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

## ৪.০ তাত্ত্বিক কাঠামো:

তত্ত্ব ও গবেষণা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হলেও এদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এরা পরস্পরের পরিপূরক এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এক ধরনের mutual support and contribution এর মাধ্যমে। এই গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলঃ Bernerd Philips তত্ত্বকে গবেষণার ইতিহাসের সংকলন বলে অভিহিত করেন। কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য তত্ত্ব পথ নির্দেশ করে। সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে গবেষণার বিভিন্ন ধাপে ধাপে কিভাবে এগোতে হবে তার নির্দেশণা তত্ত্ব দিয়ে থাকে। তত্ত্ব ও গবেষণা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কেননা পুরানো তত্ত্ব থেকে যে ধারণা, পদ্ধতি ও Norms পাওয়া যায় তা গবেষণার জন্য গাইড স্বরূপ। Theory is a guiding source for research.

### ৪.১ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ধারণা

#### ৪.১.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ধারণা

কার্ল মার্কস জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ইতিহাস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মার্কস যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হেগেলীয় ধ্যান ধারণার আলোচনায় মুখর। মার্কস যৌবনের প্রথম ভাগেই বিপ্লবী ধ্যান ধারণায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এজন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি চাকরি লাভ করতে পারেননি। ফলে সাংবাদিকতাকেই তিনি জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কার্যকলাপ প্রুশিয়ার সরকার সহ্য করতে পারেনি। এজন্য তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয় দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ফ্রান্সে চলে আসেন। এখানেই Engels-এর সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তিনি ফ্রান্স হতে বহিস্কার হওয়ার পর কিছুদিন বেলজিয়াম অবস্থান করে। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি ইংল্যান্ডে চলে আসেন এবং এখানেই পরলোক গমন করেন।

মার্কস এঙ্গেলস যৌথভাবে ১৮৪৯ সালে বিখ্যাত 'Communist Manifesto' রচনা করেন। ১৮৬৭ সালে মার্কস তাঁর ' Capital ' গ্রন্থের প্রথম খন্ড লেখেন। সমাজে শিল্প বিপ্লবজনিত সমস্যা এবং সংঘাতসংকুল পরিবেশে তিনি তাঁর রাষ্ট্র দর্শন লিপিবদ্ধ করেন।

#### ৪.১.১.১ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রে উৎপত্তির সনাতনী তত্ত্ব হতে বহুলাংশে ভিন্নতর। মার্কস রাষ্ট্র উৎপত্তির সংঘাততত্ত্বে বিশ্বস্থতাঁর মতে অর্থনৈতিক কারণেই সমাজে শ্রেণীসমূহের উৎপত্তি এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের সূত্রপাত। মার্কস এঙ্গেলস লিখিত ÔCommunist Manifesto' তে রাষ্ট্রকে 'executive committee of the bourgeioes' বলে ঘোষণা করেন। রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসের তত্ত্বটি এঙ্গেলস-এর 'Anti Duhring', 'Origin of the Family, Private Property and the state' এবং লেনিন এর 'The State and Revolution ' নামক গ্রন্থে পরিপূর্ণরূপ লাভ করে। John Plamenatz মার্ক্সের রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাটি অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন এভাবে, 'That the state arises when society divides into claseis, that the state is an instrument of class rule, and that when society becomes classles there will be no need for a state.'

মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র কোন 'প্রাকৃতিক' (Natural) প্রতিষ্ঠান নয়। স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি, এটি সমাজবহির্ভূত কোন শক্তির ক্রমাগ্রগতিও নয়, বরং সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই ফল। 'রাষ্ট্র' মূলত একটি উপরি কাঠামো (Super structure) এটি 'মূল কাঠামো'র (Basic structure) সৃষ্টি। মার্ক্সের মতে অর্থনীতিই হচ্ছে সমাজের মূল কাঠামো; এটি অন্যান্য সকল উপরি কাঠামোর স্রষ্টা। রাষ্ট্র সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় দগারণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 'Anti-Duhring' নামক গ্রন্থে এঙ্গেলস বলেন যে, 'রাষ্ট্র কোন প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান নয়, রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীবিরোধের অমীমাংশেয়তার ফল ও অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রের উদ্ভব সেখানে, সে সময় এবং সে পরিমাণে, যেখানে, যে সময় এবং যে পরিমাণে বাস্তবক্ষেত্রে শ্রেণী বিরোধের সমাধান হতে পারেনি। মার্ক্সীয় ধারণায় রাষ্ট্রের উপত্তির মুলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শ্রেণীসংগ্রাম। এঙ্গেলস তাঁর The Origin of the Family, Private Property and the state' উৎপত্তির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন , "The state is in no way constitutes a forece imposed on society from outside. Nor is the state" the reality of the Moral idea," "The image and reality of Reason" as Hegel asserted. The state is the product of society at a certain stage of its development." অর্থাৎ, একটি শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রকে সমাজের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি; রাষ্ট্র হেগেলীয় নৈতিক ধারণার মূর্ত প্রকাশ," "যুক্তির প্রতিবম্ব এবং বাস্তবতা" ও নয়। সমাজের অগ্রগতির নির্দিষ্ট একটি পর্বে এর উৎপত্তি হয়েছে। এঙ্গেলস আরো বরেন, যে, রাষ্ট্র চিরকালই ছিল না। এমন সমাজও ছিল, যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলেছে। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার ধারণাও তাদের ছিল না। সামাজিক অগ্রগতির চারটি পর্বের প্রথম পর্বে অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কোন কিছু ছিল না এবং কোন প্রকার সামাজি শ্রেণীও ছিল না। এ পর্বে রাষ্ট্রও ছিল না। কালক্রমে উৎপাদন ব্যবস্তায় পরিবর্তন আসে এবং নতুন উৎপাদিকা শক্তির উদ্ভ ঘটে। ফলে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যায়। কালান্তরে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয় আর এ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলেই সমাজব্যবস্থায় শাসক ও শাসিত এ দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।

পর্যায়ক্রমে ক্রীতদাসভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। মার্ক্সের মতে এ তিনটি রাষ্ট্র ছিল শ্রেণী রাষ্ট্র। উৎপাদনের উপকরণসমূহের যারা মালিক, তারাই এ রাষ্ট্রের মালিক এবং প্রকৃত শাসকশ্রেণী। এরা সব সময়ই সংখ্যায় স্বল্প। শ্রম ভিন্ন যাদের আর কিছুই নেই, তারাই শাসিত শ্রেণী এবং সব সময়ই সংখ্যায় বেশি। শাসক শ্রেণীর একমাত্র স্বার্থ হচ্ছে শাসিত শ্রেণীকে শোষণ করা। এজন্যই রাষ্ট্র নামক নিপীড়নমূলক যন্ত্রটি শাসক শ্রেণীর প্রয়োজন। বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের শাসন ও শোষণকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য রাষ্ট্রে আইন কানুন প্রণয়ন করে, পুলিশ, আমলাতন্ত্র এবং সৈন্যবাহিনী নামক শক্তি প্রয়োগের হাতিয়ার সৃষ্টি করে। এভাবে মার্ক্সের মতে, লেনিনের ভাষায়, রাষ্ট্র হচ্ছে, "The organ of class domination, the organ of oppression of one class by another. Its aim is the creation of order which legalizes and perpetuates this oppression by moderating the collisions between the classes. "

রাষ্ট্র মার্ক্সের মতে, ক্ষুদ্রসংখ্যক শাসক ও শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে সৃষ্ট। কাজেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শ্রেণীসংঘাতের আপসহীন বিরোধকেই প্রমাণ করে। Lenin বলেন, The state is the product and the manifestation of the irreconcilability of class antagonisms. The existence of the state proves that the class antagonisms are irreeconcilable.

ক্রীতদাসভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ বিশ্লেষণ সমানভাবে প্রযোজ্য। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধ্বংসস্তুপের উপর প্রতিষ্ঠিত আদুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আবির্ভাব, শ্রেণীবিরোধের অবসান ঘোষণা করেনি বরং শ্রেণীশোষণের নতুন কৌশলের উদ্ভব হয়। পলে শ্রেণীসংঘাত তীব্র হতে তীব্রতর হয়। আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শ্রেণীবিভাগ শুধু স্পষ্টতর হয় না বরং শ্রেণী দুটি স্ব স্ব অবস্থানে আরো দৃঢ়াবদ্ধ হয়, চূড়ান্ত পরিণামে বুর্জোয়া সমাজ দুটি পরস্পর বিরোধী স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উৎপাদনের উপকরণ ও শক্তির ক্রমোন্নতি সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূচনা করে। সর্বহারা শ্রেণী শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে নিজেদেরকে একটি শ্রেণীতে এবং পরিণামে একটি দলে সংগঠিত করে। শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণী দুটির মধ্যে সংঘাত চরমরূপ ধারণ করে। ফলে, শ্রেণীসংগ্রামকেই অনিবার্য করে তোলে। বুর্জোয়া শ্রেণীর বলগাহীন শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত সর্বহারা শ্রেণী সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করে। মার্ক্সের মতে, এ সংগ্রাম ব্যতীত সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির কোন বিকল্প পথে নেই। তারা

*Dhaka University Institutional Repository*

বিপ্লবের মাধ্যমে বলপূর্বক বুর্জোয়াদের নিকট হতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত একনায়কতন্ত্রের পত্তন করে এবং সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্বটির শেষাংশ বোঝার জন্য Engles-এর Withering away of the state বা রাষ্ট্রের ক্রমশ বিলোপ হয়য়ার অর্থকে জানা আবশ্যক। প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের মাধ্যমে মূলত বুর্জোয়া রাষ্ট্র ধ্বংস হয়, কিন্তু এর ক্রমশ, বিলোপ বা Withers away হয় না । Lenin বলেন, The capitalist state does not wither away, according to Engels, but is destoyed by the proletariat in the course of revoulution. Only the proletarian state or, semi-state withers away after the revolution. মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্র একটি নিপীড়নমূলক শক্তি; এটিকে ধ্বংসের জন্য অপর একটি নিপীড়নমূলক শক্তির আবশ্যক। প্রলেতারিয়েত একনায়কতন্ত্র হচ্ছে একটি নিপীড়নমূলক শক্তি। মার্ক্সের মতে, এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন বা ক্ষণস্থায়ী বিষয় বা অবস্থা হলেও লেনিনের মতে, এটি দীর্ঘস্থায়ী বিষয়ও হতে পারে। প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর বুর্জোয়াদের নিশ্চিহ্ন করবে এবং তখন হতেই রাষ্ট্রের ক্রমশ বিলোপ হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ারও সূত্রপাত হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে মার্ক্সের বহু আকাঙ্খিত শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত হয়। রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র হিসেবে থাকে না; এ স্তরে উৎপাদনের উপকরসমূহের সামাজিক মালিকানা শ্রম বণ্টনের ক্ষমতা রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। Engels- এর ভাষায়, তখন " Governemnt of personas os replaced by the administration of things" । সাম্যবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতেও আর শ্রেণী হিসেবে থাকে না। তখন সবাই সবার কর্মদক্ষতা এবং প্রয়োজন অনুসারে জীবনধারণের সব কিছুই লাভ করে।

মার্ক্সের রাষ্ট্রতত্ত্বটি সমালোচনার উর্ধ্বে নয় এবং সীমাবদ্ধতা হতেও মুক্ত নয়। 'রাষ্ট্রে একমাত্র শ্রেণী সংঘাত হতেই উৎপত্তি হয়েছে, মার্ক্সের এরূপ ধারণাকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ একক কোন কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি। রাষ্ট্রের উপত্তিতে বিভিন্ন শক্তি কম বেশি সাহায্য করেছে। এর মধ্যে শ্রেণী সংঘাত একটি কারণ হতে পারে সত্য, কিন্নতু এটাই একমাত্র কারণ নয়।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্স রাষ্ট্রকে শ্রেণী সংগঠন এবং শ্রেণী শোষণের যন্ত্র ভিন্ন আর কিচু মনে করেননি। অথচ, রাষ্ট্র একটি কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান। এর অস্তিত্বকে নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতির কারণে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, 'রাষ্ট্রের ক্রমশ বিলোপ হয়ে যাবে' এবং " Government of persons" কে " Goverment of things"- এ রূপান্তরিত হবে, তা এখনো বোধগম্য নয়।

চতুর্থত, মার্ক্সের শ্রেণীবিহীন রাষ্ট্রের ধারণা Plato-র আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণার মতোই একটি অবাস্তব কল্পনা মাত্র। নৃতাত্ত্বিকগণের মতে রাষ্ট্রবিহীন সমাজ থাকলেও শ্রেণীবিহীন এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আশু প্রক্রিয়া অদ্যাবধি কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

পঞ্চমত, প্রলেতারিয়েত একনায়কতন্ত্র আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমন কি, সোভিয়েত ইউনিয়নেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অভিযোগ করা হয় যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রলেতারিয়েত একনায়কতন্ত্রের নামে দলীয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এভাবে দেখা যায় যে মার্ক্সের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বটি অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক।

## ৪.১.২ রাষ্ট্র সম্বন্ধে গামপ্লোভিজ এর ধারণা

সংঘাতই রাষ্ট্রের প্রসূতি, এ মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাদের মধ্যে Ludwig Gumplowicz অন্যতম। Don Martindale এর ভাষায়, Ludwign Gumplowicz was perhaps the most influential of the confict theorists of his time" । পোল্যান্ডের গ্র্যাকো নামক স্থানে বিখ্যাত একই ইহুদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অষ্ট্রো হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং এ সাম্রাজ্যেই চাকরি লাভ করেন। প্রথমে পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক। পরবর্তী জীবনে তিনি গ্র্যাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গামপ্লোভিজ সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেই অধিকতর অনুরাগী ও আগ্রহী ছিলেন। সমাজতত্ত্বেও তাঁর অনেক অবদান রয়েছে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রতত্ত্বে তাঁর অবিনশ্বর অবদান হচ্ছে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণাটি। The struggle Among Races, Race and State এবং Sociological concept of state নামক তিনটি মূল্যবান গ্রন্থে তিনি তাঁর রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণা বা তত্ত্বটি ব্যক্ত করেছেন।

গামপ্লোভিজের রাষ্ট্রের উপত্তি সংক্রান্ড় ধারণাকে জানতে হয়ে, তাঁর মতে, প্রথমে সমাজতত্ত্বের মূখ্য বিষয় সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ককে জানা আবশ্যক। কারণ এ সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের পরস্পরিক সম্পর্ক, কার্যক্রম এবং দ্বন্দ্ব সংঘাত হতেই সামাজিক ঘটনার উপত্তি, বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের জন্ম। তাঁর মতে, মানব সমাজের শুরুতে গোষ্ঠীসমূহ রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং তারা অপেক্ষাকৃতভাবে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করত। কিন্তু এ শান্তিপূর্ণ জীবন ছিল ক্ষণস্থায়ী। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই মানবগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। তিনি বলেন যে, দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী যখন একটি অপরটির কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে, তখনই সামাজিক ঘটনা বা প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে।

Dhaka University Institutional Repository

Gumplowicz বলেন যে, সমষ্টিগতভাবে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হচ্ছে মেষের ন্যায় দলবদ্ধভাবে চড়ে বেড়ানো। অতি সহজতর অবস্থায় মানুষকে যূথবদ্ধ হয়েই বসবাস করতে হত। একটি 'মানব গোষ্ঠী' (human group) যারা তখনও সহজাত "জীবন-তাড়না বা আবেগের" (animal impulse) উপর নির্ভলশীল, যাদের জীবনে এবং সামাজিক যৌন তৃপ্তি ছিল বিশৃঙ্খল এবং পুরুষের পিতৃত্ব স্বীকার ব করা হত না। ছেলে মেয়েরা ছিল মাতার সম্পত্তি। Gumplowicz বলেন যে, আন্তগোষ্ঠীর সংঘাত হতেই পরিবার এবং সম্পত্তি এ দুটি প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি । তাঁর মতে যৌন জীবনকে কেন্দ্র করেই প্রথমে মানব সমাজে সংঘর্ষ বাধে। একজন পুরুষকে তার জৈবিক তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য অপর একটি মানবগোষ্ঠীর নারীকে অপহরণ করে নিয়ে আসতে হত এবং তখন হতেই সমাজে " marriage by capture " এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় এ সময় হতেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার উৎপত্তি। তখন থেকে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সমাজে পুরুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ও সমাজের অবলুপ্তি ঘটে।

প্রাথমিক অবস্থায় সমাজে আন্তঃদলীয় বিরোধের কারণ ছিল প্রধানত নারী ধর্ষণ ও লুণ্ঠন। প্রথমে অনিয়মিতভাবে লুণ্ঠন সংঘটিত হয়ং এবং পরে যুদ্ধ অভিযান দ্বারা এক যূথ অপর যূথকে স্থায়ীভাবে অধীন এবং পরে পরাজিত যূথের ভূ-খন্ড ও জয়ী যূথ দখলে নিয়ে আসে। এভাবে দেখা যায় যে, অস্থাবর সম্পত্তি যুদ্ধ বিজয় হতেই সৃষ্টি হয়। সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের যুদ্ধের প্রথম পর্বে বিজয়ী মক্তি পরাজিত গোষ্ঠীকে হত্যার মাধ্যমে নির্মূল করে ফেলত; কিন্তু পরে এরূপ না করে এদেরকে দাসে পরিণত করে। এ দাসদের শ্রমশক্তিকে বিজয়ী শাসকশ্রেণী নিজেরদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য শোষণ করতে থাকে। এভাবে সমাজে শাসক ও শোষিত দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বিজয়ী শক্তি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্য চিরস্থায়ী করে রাখার উদ্দেশ্যে সমাজে আইন কানুন প্রণয়ন করে। শাসকশ্রেণী সব সময়ই সংখ্যায় ক্ষুদ্র। শাসিত জনগোষ্ঠীর এক অংশকে কতিপয় সুযোগ সুবদা দিয়ে তাদের সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা আদায় করে, শাসকশ্রেণী তাদের ক্ষমতার আসনকে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়াস পায়। এক গোষ্ঠী কর্তৃক অপর গোষ্ঠীর নারী হরণ এবং সম্পত্তি অর্জনের বৃত্তি হতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি হয়, গামপ্লোভিজ এর মতে তাই ' state ' বা রাষ্ট্র'। শাসকশ্রেণী তাদের শোষণকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য রাষ্ট্রকে একটি শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। গামপ্লোভিজ এর মতে, " The state was not a union or community for securing the common weal, for realizing justie... No state was ever founded with one of these ends in view. গামপ্লোভিজ আরো বলেন, Statyes have only arisen in the subjection of one stock by another in the economic interest of the latter." রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের সাথে বিভিন্ন মানুষ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও এরূপ ঐক্যের বন্ধন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করেনি। কারণ,

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তখনও সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এ সংঘাত রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের কোন কোন পর্বে কমে এসেছে, কখনও তীব্রতর হয়েছে। কোন একটি মানবগোষ্ঠী খুব বেশি দিন ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে নি। কালক্রমে ঐক্যে ফাটল ধরে এবং একাধিক গোষ্ঠীত বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তখনই আবার গোষ্ঠসিমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও আধিপত্য লাভের সংঘাত ও সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। গোষ্ঠসিমূহের এরূপ সংঘাত ও সংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক বিবর্তন ও প্রগতি সাধিত হয়েছে। গোষ্ঠীচেতনা রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের পরোক্ষবাবে সাহায্য করেছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে গামপ্লোভিজের উপরোক্ত মতবাদ নির্ভুল ও সমালোচনা মুক্ত নয়। রাষ্ট্র উৎপত্তির সংঘাত তত্ত্বটি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একটি প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হলেও এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গামপ্লোভিজ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে ডারউইনবাদের প্রয়োগ করেছেন। তাছাড়া, তিনি অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যে তাঁর সময়ে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা বিশেষবাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এ সাম্রাজ্যের সাথে এর অধীন জাতিসমূহের কোন না কোন প্রকারে সংঘর্ষ সর্বক্ষণ লেগেই থাকত। আবার অধীন জাতিগুলোর মধ্যেও অভ্যন্তরীণ সংঘাত বিরাজমান ছিল। অন্যান্য সংঘাত তাত্ত্বিকগণের মতো গামপ্লোভিজও রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ক্রমবিবর্তনে জনগণের পরস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির ভূমিকাকে কোন গুরুত্ব দেননি।

### ৪.১.৩ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওপেনহেইমার এর ধারণা:

ফ্র্যাঞ্জ ওপেনহেইমার (Franz Oppenheimer) ইউরোপীয় সংঘাততাত্ত্বিকগণের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় এবং মক্তিমী সংঘাততাত্ত্বিক (Conflict Theorist) হিসেবে খুবই সু পরিচিত।
রাষ্ট্র সম্বন্ধে ওপেনহেইমার তাঁর ' The state ' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমাজকে ওপেনহেইমার জীবদেহস্বরূপ মনে করেন, যেখানে রাষ্ট্রকে সহজেই নিরূপণ বা চিহ্নিত করা চলে। রাষ্ট্র একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান, যেখানে ন্যায় নীতির (Justice) আধিপত্য বিদ্যমান। ঠিক মনুষ্য প্রকৃতিতেও এমন কতকগুলো উপাদান আছে যা সংঘাত ও পারস্পরিক সহায়তা সৃষ্টিতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি বিদ্যমান ব্যক্তিগণ বা গোষ্ঠীর ওপর তৃতীয় ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীর চাপ প্রয়োগ থেকেও ন্যায় নীতির ধারণার সৃষ্টি হয়। বাস্তবে ন্যায় নীতি সব সময়ই ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে। আদর্শ থেকে প্রতিটি সমাজে বিচ্যুতির মূলে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণসমূহ দায়ী। ওপেনহেইমার বলেন যে, সমাজতত্ত্বের মৌলিক নিয়মাবলির মধ্যে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র, আইন, সামাজিক শ্রেণী, সম্পত্তি, উদ্বৃত্ত মূল্য ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিকাশের মূলে সু সংঘবদ্ধ সমন্ধপতা আছে। এ নীতি উদঘাটন করতে গিয়ে তিনি অর্থনৈতিক উপায় (Economic means) এবং রাজনৈতিক উপায় (Political means) এর কমধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে, সমাজ জীবনকে দুটি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত করা যায়। একটি মূলতই শান্তিপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

এবং এটাই তাঁর মতে অর্থনৈতিক উপায়। তিনি বলেন যে, অর্থনেতিক উপায়ে অর্থনৈতিক প্রয়েঅজন মেটানোই অর্থনৈতিক কার্যাবলি । দ্বিতীয় নীতিটি অশান্তিপূর্ণ বা হিংসাত্মক (Violent) এবং এটাই হচ্ছে রাজনৈতিক উপায়। যুদ্ধজয় এবং অধীন করাই রাজনৈতিক উপায়। জন গিটারম্যান অনুদিত ওপেনহেইমারের ' State ' গ্রন্থের ভূমিকায় সি. হ্যামিল্টন বলেন যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এ দুটি উপায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাই ওপেনহেইমারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ওপেনহেইমার বলেন যে, অর্থনেতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন রাজনৈতিক উপায় প্রয়োগ করা হয়, তখনই আদিম কালে অর্থনেতিক অসমতার সৃষ্টি হয়; শাসকশ্রেণী অভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাদের সুবিধাজনক অবস্থাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে। আর এভাবেই রাষ্ট্র ও একটি আইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওপেনহেইমার বলেন যে, প্লেটো হাতে রুশো ও কার্ল মার্ক্স পর্যন্ত এ যাব রাষ্ট্রের উপত্তি সম্বন্ধে গতানুগতিক তত্ত্বগুলো রাষ্ট্রের উপত্তি, অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনরূপ অন্তর্দৃষ্টি দেয়নি। ওপেনহেইমার এর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে রাজনৈতিক উপায়ের সংঘঠন' ' Organisation of the political means '। তিনি আরও বলেন, " every state, in history, was or is state of classes, a polity of superior and inferior social groups, based upon distinctions either of rank or of property. (The State পৃ. ৫) ৫শ্রেণীসমূহের অভ্যন্তরীণ বিভেদের পথ ধরে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, মার্ক্সীয় তত্ত্বের এ ধারণাকে ওপেনহেইমার একটি রূপকথা (a fairy tale)বলে অভিহিত করেন। একটি শ্রণী রাষ্ট্র হিসেবে ওপেনহেইমার বরেন, যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে জয় ও অধীনকরণের মাধ্যমে (through conquest and subjugation)। উৎপত্তিতে এবং অস্তিত্বে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অপরাজিত সামাজিক গোষ্ঠীর উপর বিজিত গোষ্ঠীর আরোপিত এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। কতিপয় লোক নিজস্ব সুযোগ সুবিধা বা স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক উপায়ের প্রয়োগ করে রাষ্ট্র নামক এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে। এভাবে প্রাথমিক অবস্থায়,. ওপেনহেইমারের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে" (an apparatus of domination) । রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে ওপেনহেইমার বলেন যে, গোষ্ঠীসমূহের দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকেই এর সৃষ্টি। তিনি বলেন যে, ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র একটি নিপীড়নমূলক তত্ত্বই (a coercive theory)" রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। তিনি তাঁর ' State ' নামক গ্রন্থে বলেন, "Force, and not enlightened self interest, is the mechanism by which political evolution has led, step by step, from autonomous village to the state." রাষ্ট্রবিহীন পরিবেশ বা বাস্তব নৈরাজ্য হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি। সাধারণভাবে রাষ্ট্রবিহীন সমাজে মূলত সাবই সমান ছিল এবং সেখানে কর্তৃত্ব (authority) এবং সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্য কদাচিং ছিল। ভাগ্য ও শঠতা দ্বারা কতটা অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে গোষ্ঠীসমূহের

*Dhaka University Institutional Repository*

অর্থনৈতিক বৈষম্য মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের আকারে রাজনৈতিদক উপায়ে প্রয়োগ করে। উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য স্থায়ী করা। কাজেই যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমেই যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ওপেকনহেইমার রাষ্ট্রের ক্রম-উৎপত্তির ৬টি (ছয়টি) পর্বকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম পর্ব বা 'স্তর:- রাষ্ট্র উপত্তির প্রথম পর্ব বা স্তরে ছিল গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অব্যাহত লুণ্ঠন, খুন রাহাজানি, ডাকাতি, ছেলেমেয়ে অপহরণ, নারী ধর্ষণ, বাসস্থান পোড়ানো ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্ব বা স্তর :- দ্বিতীয় পর্ব বা স্তরটিকে প্রথম পর্ব বা স্তরেরই সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে। কৃষকুল বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম বন্ধ করে দেয় এবং ভাগ্যকে মেনে নেয়। অর্থাৎ পরাজিত গোষ্ঠী বিজিত যূথের নেতার আনুগত্য স্বীকার করে। বর্বর যূথপতিরা বুঝতে পারেন যে, অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রতি যে সকল কৃষক বৈরী বা বিদ্রোহী ভাবাপন্ন, শুধু তাদেরকেই হত্যা করা হয় এবং অন্য কৃষকদের প্রতিপালন করা হয় এরনা উৎপাদনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন যথপরিগণ নিয়ে আসতেন। যূথপতিদের এরূপ চেতনাকে ওপেনহেইমার প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে একটি বিরাট অগ্রগতি বলে অভিহিত করেন। ওপেনহেইমারের ভাষায়, 'এটি একটি জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়'। ( lty gave birth to nation and state) (The state পৃ. ২৭)। দাস এবং প্রভুদের সাধারণ স্বার্থ সাধারণ মানবতায় স্বীকার করা হয় আর এভাবে সংহতির কাজটি শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, শ্রেণীস্বাথের্থর পথ ধরেই এ বিকাশ সাধিত হয়। তৃতীয় পর্ব বা স্তর : এ স্তরে কৃষক সমাজ উদ্বৃত্ত ফসল যুথপতিদেরকে নিয়মিতভাবে Tribute হিসেবে দিতে থাকে। কলান্তরে এ নিয়ম হতেই কর প্রদানের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ পর্ব বা স্তর : এ পর্বে শাসকশ্রেণী এবং শাসিত গোষ্ঠীসমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয় শাসকগোষ্ঠী প্রজাদেরকে রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহন করে। নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সকল সম্ভাবনাকে নির্মুল করা হয় পঞ্চম পর্ব বা স্তর : রাষ্ট্র উৎপত্তির ক্রমোন্নতির এ পঞ্চম পর্বে শাসকশ্রেণী বিচারের অধকার গ্রহণ করে। স্থানয়ি এবং সাধারণ আইনের প্রেক্ষিতে বিচারমূলক কার্যাবলি দায়িত্বভার গ্রহণ করে। নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য এবং শোষণকে স্থায় করার অভিপ্রায়ে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম করে। এভাবে আদিম রাষ্ট্র বিকাশের চরম পর্বের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এ পর্বে একটি নতুন অভ্যন্তরীণ ঐক্য গড়ে উঠতে দেখা যায়। ষষ্ঠ পর্ব বা স্তর : এ পর্বে একটি জাতীয়তার ( Nationality) সৃষ্টি হয় অভ্যাসে, আচার ব্যবহারে, রীতি নীতি, প্রথা, পদ্ধতিতে, চলনে বলনে, অনুষ্ঠান ও উপাসনায় গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সংমিশ্রণের ফলে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মাসকশ্রেণী তাদের প্রজাবৃন্দের রূপসী কুমারী কনাদেরকে উপপত্নী করতে নিয়ে আসতে থাকে। এর ফলে একটি নতুন জারজ জাতির সৃষ্টি হয় জারজদের মধ্য থেকে অনেককেই শাসকশ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ধমনীতে প্রভুর রক্ত নিয়ে তারা প্রজা জাতির জন্মগত শাসকে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র উৎপত্তির উল্লিখিত স্তরগুলো বিশ্লেষণাত্মকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই বলে উল্লিকিত স্তরগুলো অতিক্রম করে সকল রাষ্ট্রেরই উৎপত্তি হয়েছে, এমনটি বলা চলে না। অনেক রাষ্ট্রেরই ক্ষেত্রেই যে এর ব্যতিক্রম হতে পারে, এ সত্যটুকু ওপেনহেইমার স্বয়ং স্বীকার করেছেন।

করাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওপেনহেইমারের উল্লিখিত তত্ত্বটি সমালোচনা মুক্ত নয়। সংঘাত তত্ত্বের যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সে সকল সীমাবদ্ধতা কম বেশি ওপেনহেইমারের তত্ত্বেও বিদ্যমান। লয়েন্স ক্র্যাডার বলেন যে, রাষ্ট্র গঠনে যুদ্ধ জয় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সত্য; কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের সকল প্রক্রিয়াতেকই এটা একক ভূমিকা পালন করে নি।

ওপেনহেইমার রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে শ্রেণীর উপর অত্যাধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মাসক ও মাসিতের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এ দিকটি লক্ষ্য করে আর. এইচ. লুই (R. H. Lowie) বরেন যে, ওপেনহেইমারের তত্ত্বকে রাষ্ট্রের তত্ত্ব বলা চলে না, বরং একে 'একটি জাতি বর্ণ তত্ত্ব ("a theory of caste") বলা চলে। রাষ্ট্র গঠনের মূলে শক্তিই একমাত্র উপাদান ছিল, তা সর্বাংশে সত্য নয়। জনগণের সম্মতি এবং মান্ডি ও নিরাপত্তার আকাঙক্ষা রাষ্ট্র গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো, ওপেনহেইমারের তত্ত্বেও তা স্থান পায় নি।

সব শেষে বলা চলে যে, বলপূর্বক বিরাট জনতাকে দীর্ঘদিন অধিকার বঞ্চিত করে পদানত করে রাখা হযায় না। এমন কি , শোষণের উপরই একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। শাসকশ্রেণী প্রজাদেরকে শোষণের মাধ্যমে দীর্ঘদিন শাসন করতে পারে না রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য মাসক শাসিতের মধ্যে সু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রজাবৃন্দের কল্যাণ নিশ্চিত করা যে আবশ্যক, ওপেনহেইমার এ সতটি বিবেচনা করেন নি। সংঘাত যে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়, তা অস্বীকার করা চলে না। ওপেনহেইমার যে সংঘাতের কথা উলে-খ করেছেন, আধুনিক সমাজে এ সংঘাত আমরা দেখতে পাই পুজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। ডন মার্টিনডেল (Don Martindale) বলেন যে, 'ওপেনহেইমাহেগরর মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শহুরে ও গ্রাম্য এ উভয় পুঁজিপতিই সাধারণত শোষক।

## ৪.২ জাতি-রাষ্ট্র উদ্ভবের তত্ত্বসমূহ ঃ

জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভবের বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপক বটোমোর (Tom Bottomore) তাঁর Political Sociology শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিককালের রাজনীতিক আলোচনায় জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনীতিক একক হিসাবে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা খুব বেশী দিনের নয়। সাম্প্রতিককালেই এই ধারণাটির বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। অধ্যাপক বটোমোর বলেছেন ঃ "The rise of the nation state to this position of eminence is indeed very recent; ..... " আগেকার দিনে রাজনীতিক একক হিসাবে নগর-রাষ্ট্র, প্রাচীন সাম্রাজ্য, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির ভিত্তিতে ভিন্ন ধরনের রাজনীতিক ধারণা বর্তমান ছিল। এ প্রসঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কথা বলা যেতে পারে। এগুলি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন রাজবংশের উত্তরাধিকার নীতির অনুগামী কতকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চল। এই সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র কতকাংশে সংবদ্ধ ছিল, এ কথা অনস্বীকার্য। খ্রীষ্টান জগতের ঐক্যবদ্ধ ধারণা এবং ক্যাথলিক ধর্মীয় সংগঠনের সর্বজনীন প্রভাব এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । জাতীয় রাষ্ট্র হল বর্তমান বিশ্বের গুরত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক বিষয়। অনেক রাষ্ট্রেই একাধিক জাতির (race) অস্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু এই সমস্ত জাতি অভিন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করেছে। এবং অভিন্ন জাতীয়তার অংশীদার হিসাবে তারা গঠন করেছে রাষ্ট্র।

প্রাথমিকভাবে পশ্চিম ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। অধ্যাপক বটোমোরের অভিমত অনুসারে জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে দুটি বিষয়ের অনুকূল অবদান অনস্বীকার্য। এই দুটি বিষয় হল ঃ (১) আধুনিক কেন্দ্রীভূত সরকারের বিকাশ এবং (২) জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত সরকারী ব্যবস্থার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। চরম রাজতন্ত্রের অধীনেই এ ধরনের সরকারী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। তবে জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে সর্বাধিক শক্তিশালী উপাদান হিসাবে জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। একটি সামাজিক গোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন একটি রাজবংশের বংশানুক্রমিক শাসন বা কোন বিদেশী শক্তির শাসনকে অপসারিত করে রাজনীতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনে আত্মনিয়োগ করে। জাতিগত ও জীবনধারাগত বিচারে সংহতি ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী জনসম্প্রদায় বংশানুক্রমিক বা বিদেশী শাসনের অবসান ও গণ-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হলে জাতীয়তাবাদী চেতনা আশীর্বাদ হিসাব প্রতিপন্ন হয়।

### ৪.২.১ হ্যানস কোহনঃ

হ্যানস কোহন (Hans Kohn) তাঁর The Idea of Nationalism শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে জনগণের সার্বভৌমিকতা এবং শাসক ও শাসিতের অবস্থানগত পরিবর্তনের ধারণা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া একটি নতুন শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের পিছনেও জাতীয়তাবাদের সদর্থক অবদান অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে, আমেরিকা ও ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই সময় এই সমস্ত দেশে জাতীয়তাবাদের প্রাধান্যমূলক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। তবে এই প্রকাশ কেবলমাত্র রাজনীতিক ও আর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন নয়। আবার উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও জার্মানি, ইতালী প্রভৃতি দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল উত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং তখনও দুর্বল। এই অবস্থায় এই সমস্ত দেশে প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি ঘটে। ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠে। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সচেতনতার সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ জাতি-রাষ্ট্র গঠনের উদ্ভব আগ্রহে পরিণত হয়। জাতি-রাষ্ট্র গঠনের আগ্রহ-উদ্যোগ উন্মোচিত করার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের সক্রিয় সাহায্য অনস্বীকার্য।

জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া সর্বত্র সমান নয়। কতকগুলি দেশে গোড়ার দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শক্তিহীন ছিল। কালক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই সময় এই জনসম্প্রদায় সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমকালীন বুর্জোয়া বিপ্লবের অধিকতর রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী চেতনার সামিল হয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিতে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এক অর্থে গোড়ার দিকে আধুনিক জাতীয়তাবাদ শ্রেণীগত আন্দোলনের একটি বিষয় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। এ ধরনের জাতীয়তাবাদের রাজনীতিক অভিব্যক্তি ঘটে গণতন্ত্রের জন্য সাধারণ সংগ্রামের মধ্যে এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের কথা বলা যায়। এই দুটি বিপ্লবের মাধ্যমে নাগরিকতা ও গণ-সার্বভৌমত্বের ধারণা সম্বলিত নতুন রাজনীতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

### ৪.২.২ রুশোর মতবাদ :

জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা বিকশিত করার ক্ষেত্রে ফরাসী দার্শনিক রুশোর অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুত ফরাসী বিপ্লবের আগে জাতীয়তাবাদের আধুনিক ইউরোপীয় রাজনীতিক ধারণা ও বিভিন্ন আন্দোলন পরিপূর্ণতা পায়নি। সামগ্রিকভাবে জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অধিকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন রুশো এবং জ্যাকোবিনগণ। এঁদের অভিমত অনুসারে একটি জাতির আবাস অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতে পারে। এইভাবে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্রে'র ধারণা বিকশিত হতে থাকে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে রাজনীতিক জাতীয়তাবাদের আধুনিক ধারণাটির উত্থান পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে সমকালীন ঐতিহাসিক আন্দোলন ও প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক জাতীয়তাবাদের আধুনিক ধারণার উদ্ভব হয়। কালক্রমে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করে। এই সময় এক ঐতিহাসিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতাটি হল রাজা ও রাজকীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য ও দায়িত্ব সম্পাদনকে প্রশাসকও জনসাধারণের স্বার্থের দ্যোতক হিসাবে প্রতিপন্ন করা। ভাষাগত ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সংহতি এই প্রবণতার পিছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন, আন্তদেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বিস্তার এবং সমকালীন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন। শিল্প বাণিজ্যের ব্যাপক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনির্ভর ধরতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। মূলধনের মালিক শ্রেণী ধীরে ধীরে রাষ্ট্রশক্তির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। এই ধনিক-বণিক শ্রেণী 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' ধারণাকে তুলে ধরে। এবং এক একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সকল অধিবাসী এই শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৪.৩ জাতীয়তাবাদ তত্ত্ব ঃ

জাতীয়তাবাদ একটি রাজনীতিক আদর্শ। শুধু তাই নয় জাতীয়তাবাদ হল একটি অতিবিতর্কিত রাজনীতিক আদর্শ। এই রাজনীতিক আদর্শ একদিকে যেমন ধ্বংসের সমস্যা সৃষ্টি করে, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকৃত উন্মাদনা সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে। আবার সুস্থ জাতীয়তাবাদের আত্মিক আবেদন পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের এই উভয়বিধ প্রকাশই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মানবসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাজ নীতিক আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের আলোচনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনীতিক সমাজতন্ত্রের আলোচনায় জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লয়েড (C. Lloyd) মন্তব্য করেছেন ঃ "Nationality is the religion of the modern world."

জাতীয়তাবাদ একটি ভাবগত বা মানসিক ধারণাবিশেষ। জাতীয়তাবাদ হল একটি প্রবল মানসিক অবস্থা বা অনুভূতি-একটি আত্মিক ধারণা। জাতীয়তাবাদ হল জনসমাজের মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ বা স্বাতন্ত্র্যবোধ। কোন জনসমাজ যখন ভাবগত ঐক্যবোধের ভিত্তিতে একাত্ম হয় এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদ হল একটি ঐক্য বা সংহতি সাধনকারী ধারণা বা চেতনা। এই চেতনাই একটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলে। এইভাবে সংশি- ষ্ট মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাজাত্যবোধের সৃষ্টি হয়। এই স্বাজাত্যবোধ আবার জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ধারণার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ স্বকীয়তা স্বাজাত্যবোধে অণুপ্রাণিত কোন জাতি অন্য জাতির থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে মনে করে। এই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য সংশি- ষ্ট জাতির মধ্যে এক বিশেষ ধরনের আবেগ-অনুভূতি বা আত্মিক চেতনার সৃষ্টি করে। এই মানসিক অনুভূতি বা চেতনাই হল জাতীয়তাবাদ।

সুতরাং জাতীয়তাবোধের দুটি মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান ঃ (১) নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ এবং (২) দুনিয়ার অন্যান্য জনসমাজ থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ। কোন জনসমষ্টি যখন ভাষা, সাহিত্য, বংশ, ধর্ম প্রভৃতি নানা কারণে নিজেদের সমস্বার্থ, সমঐতিহ্য, সমগৌরব ও গ্লানির অংশীদার বলে মনে করে; যাদের বর্তমানের কার্যপ্রেরণা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এক; জীবনদর্শন যাদের অভিন্ন তারা পরস্পর গভীর ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই একাত্মবোধের ভিত্তিতেই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। রাসেল (Bertrand Russell)-এর মতানুসারে জাতীয়তাবাদ হল একটি সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভূতি। (a sentiment of similarity and solidarity) যা পরস্পরকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। তাই লয়েড (Christopher Lloyd) তাঁর Democracy and Its Rivals শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'জাতীয়তাবাদকে একটি ধর্ম হিসাবে অভিহিত করা যায়, কারণ এর উৎস মানুষের গূঢ়তম

Dhaka University Institutional Repository

প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত আছে'। তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "Nationality may be called a religion because it is rooted in the deepest instincts of man."

জাতীয়তাবাদের মধ্যে শুধু যে স্বজনপ্রীতিই থাকে, তা নয়-স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগও থাকে। হায়েস (Hayes)-এর মতানুসারে জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থলে জন্মভূমির প্রতি গভীর অনুরাগ বর্তমান থাকে। হায়েস তাঁর Nationality and patriotism শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "Nationalism consists of a modern fusion of emotional and exaggeration of two very odl phenomena." জনসমাজের মধ্যে এই স্বজনপ্রীতি বা একাত্মবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম যুক্ত হলে জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এই জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠে। অর্থাৎ জাতীয় জনসমাজ নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারলেই জাতীয়তাবাদ মূর্ত হয়ে উঠে। রাজনীতিক আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদ জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের চরম পরিণতি। অধ্যাপক ল্যাস্কি (Harold Laski)-র মতানুসারে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হল মানুষের সঙ্গ পাওয়ার প্রবৃত্তি (gregarious instinct) এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। জাতিকে যে সকল উপাদান দৃঢ়ভাবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে তার মধ্যে রাজনীতিক বন্ধন হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার বাসনা একটি জাতির সকলকে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে। স্বাজাত্যবোধ বৃদ্ধি পেলে প্রত্যেক জাতিনিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। এই প্রচেস্টা সফল হলে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হয়।

জাতীয়তাবাদ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এই শক্তির ভিত্তিতে একটি জনগোষ্ঠী একই রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে অনুপ্রাণিত হয়। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু (Jawaharlal Nehru) তাঁর The Discovery of India শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "(Nationalism) is still one of the most powerful urges that move a people, and round it cluster sentiments and traditions and a sense of common living and common purpose." জাতীয়তাবাদ হল একটি দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষের এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। আর্থ-রাজনীতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থাকে এই আন্দোলনের মাধ্যমে তা অপসারণের চেষ্টা করা হয়। এ. আর. দেশাই (A. R. Desai) তাঁর Recent Trends in Indian Nationalism শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "Nationalism is a movement of various classes and groups comprising a nation, attemption to remove all economic, pohtical, social and cultural obstacles which impede the realisation of their aspiration." জাতীয়তাবাদের মূল উৎস হল জাতীয় জনসমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির মধ্যে গভীর ঐক্যানুভূতি। জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

জনসমাজের মধ্যে রাজনীতিক সচেতনতার ভিত্তিতে স্বাদেশিকতার সৃষ্টি হয়। তখন সেই জনগোষ্ঠী তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বকীয় পন্থা- পদ্ধতির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। পরাধীন জাতি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি ও নিজের রাজনীতিক ভাগ্য নির্ধারণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (right to self-determination) দাবি করে। এ হল প্রত্যেক জাতির নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার।

জাতীয়তাবাদের ধারণা পর্যালোচনার প্রাক্কালে কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদের অভিমত উল্লেখ করা দরকার। লিপ্‌সন (Leslie Lipson) তাঁর The Great Issues of Politics শীর্ষক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে বিশেষ এক ধরনের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতির মত ইতিবাচক মানসিকতা থাকে; আবার ঘৃণার মত নেতিবাচক মনোভাবও থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি দেশপ্রেমের কথা বলেছেন। অস্তিত্বকে অটুট রাখার জন্য রাষ্ট্রকে মানসিকতা বা মনোগত দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। নাগরিকদের কাছ থেকে রাষ্ট্র আনুগত্যবোধ দাবি করতে সক্ষম হয়, যদি রাষ্ট্র সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। লিপসনের মতানুসারে সকল নাগরিকের মধ্যে এই আনুগত্যবোধ বিকশিত হলে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ব্যক্ত হলে জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি ঘটে। তাঁর মতে নাগরিকদের মধ্যে নির্দিষ্ট এক ধরনের অনুভূতি বা মনোভাবকে সঞ্চারিত করার জন্য সরকার মাত্রেই এক সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বার্নস (C. D. Burns) তাঁর Political Ideals শীর্ষক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বার্নস-এর অভিমত অনুসারে জাতীয়তাবাদ প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর বিভিন্নতা ও স্বকীয়তা সংরক্ষণে এবং সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতাকে জাতীয়তাবাদ বলে না। আত্মবিকাশ বা আত্মপ্রতিষ্ঠা বিচ্ছিন্নভাবে কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদ নিকট সম্পর্ক সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদের মূল কথা হল প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর সৃজনশীল বিকাশকে সম্ভব করে তোলা; তাদের স্বকীয়তা বা বিভিন্নতার বিলোপ সাধন হয়।

ফরাসী অধ্যাপক রেনাঁ (Ernest Renan)-র অভিমত অনুসারে জাতয়িতাবাদ হল মুলত একটি ভাবগত বিষয়। এই বিষয়টির দু'টি দিক আছে। একটি দিক হল ঐতিহ্য এবং আর একটি দিক হল ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার দৃঢ় মানসিকতা। প্রত্যেক জাতি তাঁর অতীত ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে চায়। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে তারা নিজেদের অভিন্ন অংশীদার বলে মনে করে। এভাবেই গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠে জাতীয়তাবাদের ভাবগত ভিত্তি। সুতরাং জাতীয়তাবাদ হল সম্পূর্ণভাবে একটি ভাবগত বা আত্মিক বিষয়। এই জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত জাতি।

ব্যাপক অর্থে জাতয়িতাবাদের মধ্যে বিশ্বজনীনতার আদর্শ বিধৃত আছে। এর মধ্যে সংকীর্ণতার কোন স্থান নেই। জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়। জাতীয়তাবাদ স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য উভয়কেই স্বীকার করে। জাতীয়তাবাদ প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীব সমৃদ্ধশালী ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে চায়। জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব কিছু সম্পাদন। এইভাবে জাতয়িতাবাদ সমগ্র মানবসভ্যতা বা বিশ্বভ্যতারই অংশ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মতাদর্শগত রাজনীতির আলোচনায় জাতীয়তাবাদ হল একটি সক্রিয় শক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়।

(১) জাতির জীবনে জাতীয়তাবাদ একটি মহান আদর্শ। এ হল একটি গভীর অনুপ্রেরণা। জাতীয়তাবাদ জাতিকে ঐক্যবোধে একাত্ম করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এই আদর্শ দেশের ও দশের স্বার্থে আত্মত্যাগে ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

(২) মুক্তিকামী দেশের পক্ষে জাতীয়তাবাদ আশীর্বাদস্বরূপ। জাতীয়তাবাদের দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরাধীন ও দুর্বল জাতি মরণপণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সামিল হয় এবং স্বাধীন ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। অনেক বিচ্ছিন্ন জাতীয় জনসমাজ জাতীয়তাবাদের মহান আদর্শের প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং স্বৈরাচারী বিদেশী শাসনের শৃংখল মুক্তির সংগ্রামের সামিল হয়েছে। এক্ষেত্রে বারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ইতালী ও জার্মানীর ঐক্য সাধনের ইতিহাস জাতীয়তাবাদের জয়গানে সমৃদ্ধ। আবার ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার মুক্তিসংগ্রাম এবং আফ্রিকার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশের নজির। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত বর্তমান। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ পরাধীন মানবগোষ্ঠীর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা অর্জনের উজ্জ্বল কাহিনী আছে।

(৩) জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবে ইতালীর দার্শনিক ম্যাৎসিনি (Mazzini)-র কথা বলা হয়। তাঁর মতানুসারে বিভিন্ন গুণ ও প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে। বিশ্বের প্রত্যেক জাতির একেবারে নিজস্ব কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে। জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে এইসব গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর জাতয়ি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের যথাযথ বিকাশের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের অধিকারের স্বীকৃতি অপরিহার্য। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির স্বকীয়তার স্বাধীন বিকাশ সুনিশ্চিত হলে মানবসভ্যতা সমৃদ্ধশালী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় উঠবে। এবং জাতীয়বাদের

*Dhaka University Institutional Repository*

মাধ্যমেই তা সম্ভব। এইভাবে প্রত্যেকটি জাতির গুণরাজির বিকাশের মাধ্যমে মানবসমাজ ও সভ্যতা সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়। ম্যাৎসিনি সম্পর্কে লয়েড (Lloyd) বলেছেন ঃ "He thought each nation possessed certain talents, which taken together formed the wealth of the human race."

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

## ৫.০ বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশ: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা:

### ৫.১ নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে যে নেগ্রিটো জনের বসবাস ছিল এ তথ্য বহু পুরাতন। বাঙলার পশ্চিম প্রান্তে রাজহল পাহাড়ের বাগদীদের মধ্যে সুন্দরবনের মৎসশিকারী নিম্ন বর্ণের লোকদের মধ্যে, মৈমনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে কদাচিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশ ফোঁড়দের, মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায় উর্ণাবৎ কেশ, পুরু উল্টানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক দেখতে পাওয়া যায়, তাহা তো নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়। নিগ্রোবটুদের এই বিস্তৃতি হইতে অনুমান করা চলে যে, এখন তাহাদের অবশেষ প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও এক সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাঙলার স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিচিত্র জনসংঘর্ষের আবর্তে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ভিত যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নৃতত্ত্ববিদেরা তাহাদের নামকরন করেছেন আদি-অস্ট্রেলীয় (proto-Austroloid)। ভারতবর্ষের জনবহুল সমতল স্থানগুলিতে যে জনের বাস তাহাদের মধ্য হইতে পূর্বোক্ত আদিম আধিবাসীদের দেহলক্ষণগুলি বাদ দিলে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই জনের লোকেরা দেহদৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, এদের মুন্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত কপাল সংকীর্ণ, মূখ খর্ব এবং গন্ডাস্থি উন্নতনম, নাসিকা লম্বা ও উন্নত কিন্তু নাসামুখ প্রশস্ত, ঠোট পুরু এবং মূখগহবর বড়, চোখ কালো গায়ের চামড়া সাধারণত পাতলা বাদামী। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোক এবং উত্তর ভারতের নিম্নতর শ্রেণীর প্রায় সকলেই উপরোক্ত বৈশিষ্টসম্পন্ন দীর্ঘমুন্ড জনের বংশধর, এবং এই দীর্ঘমুন্ড জনেরাই ভারতীয় জনপ্রবাহে যে দীর্ঘমস্তুধারা বহমান তাহার উৎস। বাঙলাদেশেও উত্তম ও মধ্যম সংকর পর্যায়ে দীর্ঘমুন্ডের ধারাচিহ্ন দেখা যায়, তাহাও মূলত এই নরগোষ্ঠীরই দান। এই গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় এবং বিস্তৃতি কোথায় ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে বিরজাশংকর গুহ মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেছেস যে, এক সময় এই দীর্ঘমুন্ডগোষ্ঠী উত্তর-আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে নব্য প্রস্তর যুগে ইহারা ক্রমশ মধ্য দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইসব দেশে আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ইহাদের কিছু রক্তসংমিশ্রণ ঘটে। যাহাই হউক, হইদেরই আর্যভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে এই আদি-নর্ডিক জনের রক্ত ও দেহগঠন বৈশিষ্ট্যর দান অত্যন্ত অল্প; সে ধারা শীর্ণ ও ক্ষীণ, এত শীর্ণ ও ক্ষীণ যে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তাহা খুব সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সহসা

Dhaka University Institutional Repository

ধরা পড়ে না। এই সুদীর্ঘ জাতিপ্রবাহের ইতিহাস আলোচনায় একটি তথ্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। সেটি এই: নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমন্ড, আদি-অস্ট্রেলীয় বা 'কোলিড্', দীর্ঘমন্ডু, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস মিশর-এশীয় বা 'মেলানিড', এবং বিশেষভাবে গোলমন্ডু, উন্নত না অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্রাকিড্', এই তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত। রিজ্লোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সংকীর্ণ স্থানগন্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গোলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্বদিকে সংকীর্ণ স্থান গন্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি-নর্ডিক বা খাঁটি 'ইন্ডিড্'. রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ। মোটামুটি ভাবে ইহাই বাঙলাভাষাভাষী জন-সৌধের চেহারা, এবং এই জন-সৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।

## ৫.২ বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়:

বাংলা' বলতে কোন ভূখন্ডকে বোঝাতে তা স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন। 'বাঙলা বলতে বিস্তৃত এক ভূখন্ডকে বোঝাতো। প্রাথমিক পর্যায়ে একই ভূখন্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের অবস্থিতি ছিল। মোটামুটিভাবে ১৯৪৭-এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের ভূখন্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়; বর্তমানে যা বাংলাদেশ এবং ভারতের 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই ভূখন্ডের একটি আঞ্চলিক সত্যতা ছিল এবং ভৌগোলিকগণও এই উপমহাদেশের মধ্যে বাংলা কে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করেন। প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুররা গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং লালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসগার। এই বিস্তৃত সমভূমির দক্ষিণ দিক সাগরাভিমুখে ঢালু এবং গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী বঙ্গো ব্রহ্মপুত্র মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে। এই বিস্তৃত সমতলভূমির মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চল (৩০০০ বর্গমাইল) নিকটবর্তী প্লাবনভূমির তুলনায় গড়ে ৬ ফুট উচু এবং এর মাঝামাঝিই রয়েছে ময়নামতী পাহাড়। সিলেট অঞ্চলও গড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং এরই দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত প্লাইসটোসিন যুগে সুগঠিত মধুপুর উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমির উত্তর পশ্চিম বিস্তৃতিই হচ্ছে বরেন্দ্র বা বারিন্দ এলাকা। ব্রহ্মপত্র নদ (যমনা প্রবাহ) বরেন্দ্রের পূর্ব সীমা এবং প্রবাহই এই উচ্চভূমিকে মধুপুরের উচ্চভূমি থেকে ভাগ করেছে। পশ্চিমে রাজমহল ও ছোটনাগপুর পাহাড় সংলগ্ন উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত প্লাইসটোসিন ভূভাগ রয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিককালের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম কর্ম নবভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য ইহাই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য।'

Dhaka University Institutional Repository

## ৫.৩ সাংস্কৃতিক পরিচয় ঃ

গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার ভূবৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সে অত্র অঞ্চলের লোকজনের সমাজ জীবন ও অর্থনীতিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। সুদূর অতীত থেকে এভানে বিভিন্ন এথনিক উপাদারেন সংমিশ্রণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে লোকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তার একটি একই রূপবিশিষ্ট বা সমপ্রকৃতির চারিত্র আছে। ভূগোলের প্রভাবে ও রক্ত মিশ্রণের ফলে এইে চারিত্র প্রাকৃতিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। উক্ত লোকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের কাছোকাছি আসতে সাহায্য করেছিল সুলতানী আমলের রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইলিয়াসশাহী শাসনের সূচনাকালে রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতট বা সপ্তগ্রাম-লখনৌতি-সোনারগাঁও একই শাসন-ব্যবস্থার অধীন একত্রিত হয়েছিল। এই একত্রিত অঞ্চল প্রথম বারের মত তখন থেকেই বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়েছিল। এ কথার প্রমাণ আছে ফারসী ইতিহাস গ্রন্থে, চীনা লেখকদের বিবরণে এবং ইয়োরোপীয় লেখকদের তৈরি বিবরণে ও মানচিত্রে। Middle Bengali'র রূপরেখাকে নির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বোধ হয় সুলতানী প্রশাসনের পরোক্ষ ভূমিকার এবং পূর্বোক্ত আঞ্চলিক একত্রীকরনের ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে হবে নতুবা স্বাধীন সুলতানী আমলেরর প্রথম পর্যায় থেকেই সর্ববঙ্গীয় সাহিত্যের ব্যবহারের উপযোগী একটি সমমানসম্পন্ন ভাষার গঠন ও বিকাশকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ত্রিপুরা আসমের নিকটবর্তী বাংলার প্রান্তিক অঞ্চল। সেখানেও বাংলা ভাষার ব্যবহার পনের-ষোল শতকেই শুরু হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এভানে ছিল বিভিন্ন এথনিক গ্রুপ থেকে উপদান নিয়ে গঠিত অথচ সমরূপসম্পন্ন (homogenous)একটি লোকগোষ্ঠী, তাদের বসবাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের একটি রাষ্ট্র, তাদের সাহিত্যে ব্যবহারের জন্য একটি পরিণত ভাষা এভং সেই সাহিত্যে প্রকাশিত তাদের ধ্যান-ধারণায় সীমিত ধরণের ঐক্য। গঠনের সূচনা হয়েছিল, খৃষ্টীয় চৌদ্দ পনের শতকে এসে এমনি করে তার একটি পরিণত রূপে সাক্ষাৎ মিলছে।

প্রাক-মোগল যুগেই যে বর্তমান কালের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে একটি লোকগোষ্ঠীর ও একটি ভাষ্য ভূগোল ভিত্তিক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বাঙালিকরণ লোকগোষ্ঠী একটি people বা সংঘঠিত লোকগোষ্ঠীই 'নেশন' বা জাতি নয়। উক্ত আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে এবং লোকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ও বৈচিত্র ছিল; কিন্তু বহুদিন কোনো প্রবল রকমের বিরোধি ছিলন না। বাঙালী লোকগোষ্ঠী গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যহত করেছিল মোগল শাসনের বর্হিমূখী চরিত্র এবং বৈষ্ণব আন্দোলন। বহু দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান বাংলা ভাষাকে তাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক রূপে চিহ্নিত করছিলেন। মোগল আমলে তারা ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাবে বহিমূখী হলেন এবং অমুসলমানদের কাছে থেকে মানসিকভাবে দূরে সরে গেলেন। অন্য দিকে আবার বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালী হিন্দু সমাজকে ইসলামের ক্রমপ্রসারমান প্রভাবের বিরুদ্ধে অনেকটা সংহত করল বটে, কিন্তু দেশী মুসলামদের সঙ্গে হিন্দুদের বিভেদ ও বিরোধ প্রবল হল। এ-

Dhaka University Institutional Repository

কথার প্রমাণ আছে ষোল ও সতের শতকের রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে। বাঙালীর ইতিহাস দীর্ঘ হলেও তার জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাম্প্রতিক কালের। সে চেতনারও আবার একটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে খন্ডিত, আরেকটি সম্প্রদায়ের জীবনে বিশৃঙ্খলা বাঙালী জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ববহ ঘটনা উনিশ শতকের নবজাগরণেরও আছে সেই খন্ডিত চেতনার এবং উল্লেখ্য পরিমাণে সাম্প্রদায়িক উপাদানের অনুপস্থিতি। মধ্যযুগের কয়েকজন মুসলমান কবির বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ও প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের মাঝখানে পুরোপুরি তরিয়ে গেছে। ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক জাতীয়তা ও ধর্মশ্রয়ী বহির্মূখী প্রবণতার টানাপোড়নেরর মাঝে বাঙালী মুসলানন একদ্বিধাগ্রস্ত সত্তা। ১৯৪৮ সালে একটি সাম্প্রদায়িকতা- আশ্রয়ী, ধর্মীয় ইউনিটারী রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং ১৯৭১-এ সেই রাষ্ট্রের ধ্বংসস্তুপের উপর একটি ভাষাভিত্তিক, জাতীয়বাদী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন, আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠন এ কথার প্রমাণ দিচ্ছে।

## ৫.৪ বাংলা নামের উৎপত্তিঃ

ইংরেজ শাসনকালের 'বেঙ্গল' (Bengal) যা ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রযুক্ত ছিল, উপরে আলোচিত ভূখন্ডকেই বোঝাতো। ইংরেজদের 'বেঙগল' অন্যান্য ইউরোপীয়দের বিশেষ করে পর্তুগীজদের) ' বেঙ্গালা' থেকেই গননা হয়েছে। এই নামটিই তারা আধিপত্য বিস্তারের সময় পেয়েছিল বা এই ভূভাগ ইউরোপীয়দের কাছে এই নামেই পরিচিত ছিল ষোল ও সতেরো শতকে ইউরোপীয়দের লেখনীতে 'বেঙ্গালা' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় সীজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩–১৫৮১) 'বেঙ্গালা' রাজ্যের অন্তভূক্ত চাটিগানের ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত 'সোন্দির' দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। ডুজারিক (১৫৯৯) প্রায় ২০০ লীগ উপকূল বিশিষ্ট 'বেঙ্গালা' দেশের উল্লেখ করেছেন। স্যামুয়েল পচার্স (১৬২৬)-এর বর্ণনায়ও 'বেঙগালা; রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। র‍্যালফ ফিচ (১৫৮৬) 'বেঙ্গালা' দেশে চাটিগান, ' সতগাম' (সপ্তগ্রাম), 'হুগেলি" (হুগলি) এবং 'তান্ডা' (রাজমহলের নিকটবর্তী) শহরের উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা বেঙগালা/ বেঙ্গেলা/ বাঙ্গালা রাজ্য ও ঐ নামের একটি শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মার্কোপোলো (১৩ শতক) ওভিংটন, ব্রুভ (১৬৫০) এবং সসেন (১৬৫২) 'বেঙ্গালা শহরের উল্লেখ করেন। রেনেল এই নামের শহরের উল্লেখ করেছেন কিন্তু এর অবস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। গ্যাস্টলদি (১৫৬১) তাঁর মানচিত্রে চাটিগামের পশ্চিচমে বেঙ্গালার অবস্থিতি দেখিয়েছেন। পর্তুগীজ ভার্থেমা, বারবোসা (১৫১৪) বা জোয়াও দ্য ব্যারোসের (১৫৫০) বর্ণনায় 'বেঙ্গালা' রাজ্য ও 'বেঙ্গালা' শহরের উল্লেখ রয়ছে। 'বেঙ্গালা" শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে পন্ডিতবের্গর মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও 'বেঙ্গগালা' রাজ্য যে 'বাংলাদেশ অঞ্চলকে বোঝাতো সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই।

মোগল আমলে এই ভূ ভাগই 'সুবা বঙ্গালা' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। আবুল ফজল এই প্রদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালা পূর্ব পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর দগক্ষিণে, অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলি জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই 'সুয়া' পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা

Dhaka University Institutional Repository

বিহার। কামরূপ ও আসম সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। আবুল ফজল 'বাঙ্গালাহ' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'বাঙ্গালাহ'র আদি নাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীনকালে এখনাকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত 'আল' নির্মাণ করতেন; এ থেকেই 'বাঙ্গাল বা 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি। অবশ্য আবুল ফজলের এই ব্যাখ্যা সবাই স্বীকার করে নেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, প্রাচীন কাল হতে 'বঙ্গ' এবং 'বঙ্গাল' দুটি পৃথক দেশ ছিল। 'বঙ্গাল' দেশের নাম হতেই কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা নামকরণ হয়েছে। বর্তমানকালে বাংলাদেশের অধিবাসীদেরকে যে বাঙ্গাল নামে অভিহিত করা হয়, তা সেই প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃতিই বহন করছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুমানও যে নিঃসন্দেহ নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের মধ্যে ' বঙ্গাল' এর তুলনায় 'বঙ্গ' অধিক খ্যাতিমান ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং 'বঙ্গ' জনপদের মধ্যেই দক্ষিণ পূর্ব বাংলার অনেক ভৌগোলিক অন্তর্ভূক্ত ছিল (এর মধ্যে ছিল বঙ্গাল, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ এমনকি সম্ভবত হরিকেল)। তাই 'বঙ্গ থেকে না 'বঙ্গাল; থেকে সারা দেশের নাম 'বাঙ্গালা' হয়েছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। নীহাররঞ্জন রায় অবশ্য আবুর ফজলের ব্যাখ্যাকে একেবারে অযৌক্তিক মনে করেননি। নদীমাতৃক বারীবহুল দেশে বন্যা ও জোয়ারের স্রোত রোধের জন্য ছোট বড় বাঁধ (আল) নির্মাণ কৃষি ও বাস্তুভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। সুতরাং 'বঙ্গ' এর সঙ্গে 'আল; যুক্ত হয়ে 'বঙ্গাল' বা বাঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালা' নামকরণ খানিকটা যুক্তিসঙ্গত।

মোগলপূর্ব যুগে 'বাঙ্গালা' সমস্ত ভূখন্ডের নাম সূচনা করতো কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের সময় 'বাঙ্গালা' নামে একক কোন দেশ ছিল না। ঐতিহাসিক মিনহাজ ই সিরাজ মুসলমানদের বাংলা বিজযের ইতিহাস রচনার সময় বাঙ্গালা নামের উল্লেখ করেননি; বরং বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্গ নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন। মিনহাজের বর্ণনায় বাংলা সম্বন্ধে তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের সুপষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লখনৌতি ও বঙ্গকে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলাকে বুঝিয়েছেন। বঙ্গের সাথে সমতট (সকনত) এর উল্লেখও তিনি করেছেন।

মিনহাজের পর্বত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমগ্র দেশ নয়, এর অংশ বিশেষের উল্লেখ প্রসঙ্গে। পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস ই সিরাজ আফীফ সুলতান শামস উদ্দ দীন ইলিয়াস শাহকে শাহ ই বাঙ্গালা, শাহ ই বাঙ্গালিয়ান' বা সুলতান ই বাঙ্গালা' রূপে আখ্যা দিয়েছেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর পূর্বে অন্য কোন মুসলমান শাসক দীর্ঘকাল বাংলার সমগ্র ভূখন্ড শাসন করেছেন একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসনকেন্দ্রেই (লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও) নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন। এই স্বাধীনতা প্রায় দুশো বছর ধরে অক্ষুন্ন ছিল। তাই ইলিয়াস শাহ মুসলমান সুলতানদের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই প্রথম শাহ ই বাঙ্গালা' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা'।

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আফীফ 'বাঙ্গালা' বলতে সারা বাংলাকে আর্থাৎ আবুল ফজলের 'বাঙ্গালা' বা ইউরোপীয়দের 'বেঙ্গালা', 'বেঙ্গল'- কে বুঝিয়েছেন। তাই ইলয়াস শাহের সময় থেকেই প্রথম বাঙ্গালা তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আগে, এমনকি মুসলমান পূর্ব যুগে, এই ব্যাপক অর্থে বাংলা বা বাঙ্গালার ব্যবহার পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে বঙ্গ বা 'বঙ্গাল; দ্বারা বাংলার অংশবিশেষকে নির্দেশ করা হতো। তাই 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহ এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুকুমার সেন 'বঙ্গ' থেকে বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালাহ'র উৎপত্তি হয়েছে, 'বাগ্ডালা' নামটি মুসলমান অধিকারকালে সৃষ্ট এবং ফারসি 'বাঙ্গালাহ' থেকে পর্তুগীজ 'বেঙ্গালা' ও ইংরেজি 'বেঙ্গল' এসেছে বলে মত প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

## ৫.৫ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস

প্রাচীন ভারতের ন্যায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠন ও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ উৎসের অঅপ্রতুলতা। প্রাচীন যুগে লিখিত গ্রন্থাদি নেই বললেই চলে। যাও আছে তার মধ্যে ইতিহাসের বিষয়বস্তু খুব বেশি নেই, আছে ধর্ম কর্ম আর দেবদেবীর কথা। মানুষের কর্মকান্ড তার মধ্যে তেমন প্রাধান্য পায়নি। এই কারণে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে ঐতিহাসিকদের নির্ভরশীল হতে হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর ভর করেই গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে প্রাচীন যুগের বাংলার ইতিহাসের অবকাঠামো। তাই এ কথা বললে খুব একটা ভুল হবে না যে যদি আমরা কেবল গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদানের উপর নির্ভরশীল হতাম তাহলে আমরা প্রাচীন বাংলার ইতিহাস খুব কমই জানতে পারতাম।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসসমূহ দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারেঃ

(১) গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদান; (২) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। বিভিন্ন প্রকারের উৎস সম্বন্ধে আমরা একে একে আলোচনা করবো।

## ৫.৬ গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদান

প্রাচীন যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার ভূখন্ডে লিখিত গ্রন্থ তেমন একটা নেই বললেই চলে। বাংলার বাইরে লিখিত কিছু গ্রন্থে বাংলা সম্পর্কে যৎসামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায় বৈদিক বা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বাংলার প্রাচীন জনপদ সমূহের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তেমন কোন বিস্তারিত তথ্য নেই। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধে বিধৃত তথ্যই এতদঞ্চল সম্পর্কে প্রাচীনতম তথ্য। এই গ্রন্থে বাংলার সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্রের উল্লেখ এ কথাই প্রমাণ করে যা বাংলার বয়নশিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ছোড়া অর্থমাত্রে তেমন কোন তথ্য নেই।

ভারত বর্ষের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত হয়। এ যুগের অন্যতম কৃতিত্ব সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটলেও ইতিকহাস সম্পর্কিত লেখনীর তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ করা যায় নি। মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ কাব্যে রঘুর চরিত রচিত হয়েছিল গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবনী অবলম্বনে। নৌযুদ্ধে পারদর্শী বংগীয়দের বিরুদ্ধে রঘুর বা সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, যার প্রমাণ অন্যান্য সূত্র থেকেও পাওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তর ভারতীয় সম্রাট তর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের সাথে বাংলার সম্রাট শশাঙ্কের সংঘর্ষের কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তবে বাণভট্টের বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

একপেশে ভাব লক্ষনীয়। তার বিবরণে হর্ষবর্ধনকে অতি উজ্জ্বল করে চিত্রিত করা হয়েছে; আর শশাঙ্ককে শত্রু হিসেবে হীন চরিত্রের অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছ। অন্য উৎসের অভাবে শশাঙ্কের ইতিহাস শত্রুপক্ষের লেখনীর উন্নত নির্ভরশীল।

নবম দশম শতাব্দীতে রচিত (রচয়িতার নাম জানা যায় নি) 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থের বাংলার ইতিহাসের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই গ্রন্থে সমগ্র উত্তর ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাও আবার এক বিশেষ ঢং-এ। গ্রন্থেকার সব নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করেছেন, কখনও পুরো নাম ব্যবহার করেননি। ফলে হয়তো জানা বিষয়ে কিছুটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই গ্রন্থ থেকে, কিন্তু অন্য সূত্র থেকে না পাওয়া তথ্য বোঝাই কঠিন। তবে এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী সময়ের বাংলা ইতিহাসের বেশ কিছু তথ্য এই গ্রন্থ সরবরাহ করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর সন্ধ্যাকর নদী রচিত রামচরিতম কাব্যে বংলার পাল যুগের বিশেষ কিছু ঘটনা বিধৃত রয়েছে। শেষ পাল সম্রাট মদনপালের রাজত্বকাল রচিত এই গ্রন্থে দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে সংঘটিত রবেন্দ্র বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তবে কাব্যটি প্রায় দুর্বোধ্য। দ্ব্যর্থবোধক কাব্যটির প্রতিটি শ্লোকের দু রকম অর্থ হয়; এক অর্থে বহুল পরিচিত রামায়ণের কাহিনী; যা বুঝতে তেমন অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় অর্থে রয়েছে সম সাময়িক ঘটনা। এই অর্থ বুঝতে কষ্টই হতো। তবে কাব্যটির একটি পান্ডুলিপিতে প্রথমই দুই ভাগের গদ্য ব্যাখ্যা আছে। তাই সমসমায়িক ঘটনা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। দ্বিতীয় মহীপালর রাজত্বকালে রবেন্দ্রে (উত্তর বঙ্গ) পাল শাসনের অবসান ঘটে, কৈবর্ত প্রধান দিব্যের বা দিব্যোকের শাসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে পাল সম্রাট রামপাল দিব্যের ভ্রাতুস্পত্র ভীমকে পরাজিত করে রবেন্দ্র পুনরুদ্ধার করে পাল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। এসব ঘটনার জন্য 'রামচরিত' কাব্যই একমাত্র উৎস। তাছাড়া সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যে বরেন্দ্রের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

সেন যুগে বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। তবে অধিকাংশ রচনারই বিষয়বস্তু ছিল কর্ম, পূজা পার্বণ আর দান দক্ষিনা। পার্থিব বিষয় খুব একটা স্থান পায়নি। তবে সেনযুগের কিছু কাব্যসংকলনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, গ্রামীণ জীবনের কিছু ছবি বা অর্থনৈতিক অবস্থার যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। অল্প হলেও এসব তথ্য সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উৎস। কাব্য সংকলনের মধ্যে শ্রী ধর দাসের ' সদুক্তিকর্ণা মৃত; বিদ্যাকারের 'সুভাষিতরত্নকোষ' এবং গোবর্ধনের আর্যসপ্তশতী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের 'ভারতে বৌদ্ধ ইতিহাস' (তিব্বতী ভাষায় রচিত) গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের কিছু উপকরণ পাওয়া যায়; বিশেষ করে; নবম দশম শতাব্দীর বঙ্গ সমতট সম্পর্কে বা পাল বংশের উত্থান সম্পর্কে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে তারনাথ তাঁর গ্রন্থ রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর গ্রন্থের মুখ্য বিষয় ছিল বৌদ্ধধর্ম। সুতরাং এতে অন্যান্য পার্থিব বিষয়াদি তেমন গুরুত্ব পায়নি। তাছাড়া তারনাথ তাঁর সময়ের অনেক পূর্বের বিষয়ে যে সব তথ্য দিয়েছেন তা যথাযথ যাচাই না করে গ্রহণ করা যায় না।

বিদেশীদের বর্ণনা সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মধ্যে রচিত কিছু গ্রিক ও লাতিন লেখনীতে বাংলা সম্বন্ধে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অজানা লেখকের পেরিপ্লাস অব দি ইরথ্রিয়ান সী'[ গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রিক ও লাতিন লেখনীতে বাংলার ভূভাগে গঙ্গারিডাই' নামক শক্তিশালী রাষ্ট্রের এবং 'গাঙ্গে' বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্রের খ্যাতি সেই সময়েই গ্রিক রোমান জগৎ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বেশ কয়েকজন চৈনিক বৌদ্ধ পন্ডিত বাংলায় এসেছিলেন; তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। তবে এরা সবাই ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম এবং রীতিনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে। দেশে ফিরে এরা সবাই স্বদেশবাসীকে জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। তাঁদের বিবরণ স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয় তাঁদের লেখনীতে স্থান পেয়েছে। চৈনিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন ফাহিয়েন, গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। বাংলা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য তাঁর বৃত্তান্তে নেই। তাম্রলিপ্তি বন্দরের এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যের কিছু তথ্য তাঁর লেখা বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে এসেছিলেন হিউয়েন সাং, উত্তর ভারতীয় পুষ্যভূতি বংশের সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে। তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে দীর্ঘকাল ভারতে কাটিয়েছেন। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার সম্রাট ছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষের কথা হিউয়েন সাং এর বিবরণে পাওয়া যায়। তবে স্বাভাবিক কারণেই তিনি হর্ষবর্ধনের পক্ষ অবলম্বন করেই বক্তব্য রেখেছেন। শশাঙ্কে তিনি চিত্রিত করেছেন হীন চরিত্রের বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা হিসেবে। তাই শশাঙ্ক সম্পর্কে তাঁর দেওয়া সব তথ্যই বিশ্বাসযোগ্য নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হিউয়েন সাং বাংলায় এসেছিলেন; কর্ণসুবর্ণ হয়ে পুন্ড্রনগর, সেখান থেকে কামরূপ হয়ে সমতট, তারপর তাম্রলিপ্তি থেকে উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে। প্রায় সমগ্র বাংলাই তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। বাংলার এসব অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে তাঁর বিবরণে। তিনি পুন্ড্রনগর ও আশেপাশের এলাকায়, সমতটে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শনাদির উল্লেখ করেছেন তাঁর দেওয়া তথ্য সমূহ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সম্পর্কে ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তৃতীয় চৈনিক পর্যটক ইৎসিং, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় এসেছিলেন। সমতট এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও বৌদ্ধরাজবংশ খড়্গদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর বিবরণে।

*Dhaka University Institutional Repository*

নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত আরব নাবিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণে বাংলা সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়কালে ইওরোপ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে আরবদের একাধিপত্য ছিল। বাংলার উপকূল দিয়েই আরবদের বাণিজ্যতরী যাতায়াত করতো। তাই আরবদের বর্ণনায় বাংলার সমৃদ্ধ বাণিজ্যের চিত্র পাওয়া যায়। ক্ষাল ইদ্রিসি, সোলায়মান, মাসুদি, ইবন খুর্দাদবে প্রমুখের বিবরণে চট্টগ্রাম এলাকায় আরবদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার দক্ষিণ পূর্বাংশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির চিত্র আরবদের বিবরণের ওপরই নির্ভরশীল।

বিদেশীদের বিবরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে বিদেশীরা এদেশীয় রাজনীতি নিয়ে কিছু ষা লিখলেও তাঁদের লেখায় সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতির এমন অনেক দিক ধরা পড়েছে যা দেশীয় সূত্রে অনুপস্থিত। ফলে বিদেশী বিবরণে তথ্য কম থাকলেও তার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, গ্রন্থাকারে লিখিত প্রাচীন বাংলার ইতিহাস খুব কমই পাওয়া যায়। যাও পাওয়া যায় তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত। সেই কারণেই ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর অধিক নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ৬.০ বাংলাদেশ: জাতি রাষ্ট্র উত্থানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিমর্ম শিকার বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভিন্ন ধারায় বিকাশের পেছনে বৃটিশ পুঁজির এক গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। এ পুঁজির আগ্রাসনে যেমন নিশ্চল পরিবর্তন বিমুখ গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, তেমন মোঘল আসলের অর্থনীতির মূল কাঠামো অর্থাৎ এশীয় রৎপাদন পদ্ধতির শেকড় উৎপাটন করে এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে নতুন প্রানের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রান প্রাচুর্য বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিকাশের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে প্রথমে বৃটিশ বানিজ্যিকগত পুঁজির প্রয়োজনে, পরবর্তীতে বৃটিশ শিল্পগত পুঁজর স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে এই পরিবর্তনের কারনেই এ অঞ্চলে না ঘটল মধ্য যুগীয় সামন্ত ব্যবস্থার অবসানা; না হেল দেশীয় পুঁজির যথার্থ বিকাশ। বরং দুই এর সমন্বয়ে সৃষ্টি হলো দূর্বল আর্থ-সামাজিক কাঠামো। অথচ প্রাচীনকালে থেকে মোঘলদের আগমনের আগ পর্যন্ত বাংলার আর্থ সামাজিক কাঠামো বিকাশ ঘটেছে মোটামুটি ভাবে নিজস্ব নিয়মে।

অধ্যাপক রংগলাল-সেন বাংলার সামাজিক স্তর বিন্যাস করতে যেয়ে যে অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন কালানুক্রমিকভাবে তা হচ্ছে আদিম সাম্যবাদ, প্রাচ্য ধরনের দাস ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্র (সেন, রংগলাল; বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস, পৃষ্ঠা-২৫)। বাংলার আদিম যুগ সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট ধারনা অসম্ভব। নৃ-বিজ্ঞান মর্গনের বন্যদশা, যুগটিকে বাংলার নিষাদ সমাজের যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (সেন, পৃষ্টা-২৮)। এর পরে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা; এই ব্যবস্থা বাঙালীর আদি পুরুষ অষ্ট্রিয়দের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। কৃষি ভিত্তিক গ্রামীন সমাজ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আর্থ সামাজিক স্তর ব্যাস দেখা দেয়। লৌহ যুগে পারিবারিক সম্পত্তিরন অধিকার স্বাকৃত হয়। ধীরে ধীরে সামাজে সম্পদভিত্তিক শ্রেণী সৃষ্টি হতে থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বাংলার কৃষি অর্থনীতি দৃঢ় হয়। সামাজিক স্তর বিন্যাস মূলত: শুর হয় গুপ্ত শাসন শুরুর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় পঞ্চম শতকে (সেন, পৃষ্ঠায়) এরপর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় দাস সামন্ততন্ত্রের প্রথম পর্যায় শুর হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিল গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজারা। এই সময়ে সমাজ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিন্যাস্ত ছিল। যদিও এর বিন্যাস ছিল প্রাম্মন্দ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি স্তরে। তবু সামন্তান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে চার বর্ণ দ্বিমাত্রিক শ্রেণী ব্যবস্থায় পরিনত হয়।

*মৌল যুগে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। যে ধরনের সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে তা পাশ্চাত্যের সামন্ততন্ত্র* থেকে ভিন্ন ধরনের। এতে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ব্যহত হয়। তবে সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠার শুর থেকে প্রাচীন বাংলার গ্রাম সমাজ এবং শহুরে সামজ এ দুভাগে বিভক্ত হয়ে

*Dhaka University Institutional Repository*

পড়ে। গ্রাম সমাজ ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল আর শহুরে সমাজ ছিল ব্যবসা বানিজ্যের উপর নির্ভরশীল। গ্রাম সংলগ্ন এই ক্ষুদ্র ক্ষদ্র শহরগুলির সাথে গ্রামগুলির খুব একটা পার্থক্য ছিল না ।

ঐতিহাসিক কোশাম্বীর মতে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্য তথা বাজারের বিকাশের একটি সম্পর্ক ছিল। এয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলামন জনগোষ্ঠীর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে মুক্তিলাভের আশায় আগে যেমন সাধারন জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তেমন আবার ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। এতে বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা ইসলামের ধর্মীয় গনততেন্ত্রর সঙ্গে অর্থনৈতিক গনতন্ত্রের কোন যোগসূত্র ছিল না। এ সময়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মধ্যস্তরের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের লগ্নি পুঁজির প্রচলন হওয়াতে 'মহাজন' শ্রেনীর আবিভাব হয়। গ্রামের ধনী মহাজন পরিনত হয় জমিদার। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্রাম্মনদের স্থানে দখল করে নেয় মুসলামান উলেমারা। মুসলিম শাসন আমলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না ( সেন, পৃ-৫০)

যদিও মোঘল আমলই বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্যে একটি সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়ই মুসলিম সমাজে আশরাফ আতরাফ, নামে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। অবশ্য মুসলিম সমাজের এ স্তর বিন্যাসের সুনির্দ্দিষ্ট কোন ধমীয় বা হিন্দু বর্নশ্রম ব্যবস্থার মতো পেশাভিত্তিক কোন স্তর বিন্যাস ছিল না, বিষয়টি ছিল সম্পূর্ন স্থানীয়।

বাংলায় সুলতানী আমলের স্ব-শাসনকালে এই অঞ্চলে একটি ইসলামীভাব আদর্শ গড়ে ওঠে। বাংলার সুলতানরা দিল্লীর অধীনের থাকার চেয়ে বাংলায় বাঙালী হয়ে দেশ শাসনকে বেশী শ্রেয় মনে করতেন। এ সময়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে বলতে যেয়ে ওয়াহিদুল হক সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ন এক প্রবন্ধে বলেছেন "মোঘল দখলের আগে বাংলা ছিল স্বশাসিত। বাইরের দখলাদাররা বাংলায় এসে শাসনভার হাতে নিলেও, অচিরেই তারা স্বাধেবিত স্বাধীনতা ঘোষনা করতেন এবং নিজেদের বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতেন। পাঠানদের শাসনের ফলে পূর্ব বাংলায় এক ধরনের সামাজিক বিকাশ ঘটে একে ইসলামী ভাবাদর্শই বলা চলে। তবে এ সময়ে এ ভাবাদশেই সকল জাতের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল (হক, পৃষ্ঠা: ১-৬) ।

পরবর্তীতে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘলরা এ অঞ্চল দখল করে নিল বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবসান ঘটে। পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়। কার্ল মার্কসের মতে এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির আওতায় নিশ্চল গ্রামীন সামাজই ছিল এই কাঠমোর মুল বৈশিষ্ট্য।

মোঘলপূর্ব যুগে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ছিল নিজস্ব নিয়মে সৃষ্ট এবং পরিচালিত। তবে মোঘল আসলে এই স্বশাসন ব্যহত হয় যা অল্পকালের ব্যতিক্রমসহ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৬.১ বৃটিশ শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ভারতীয় সমাজে ধীর গতিতে এই শ্রেণী নিজ গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলেই তারা সামজে ক্রমশ একটি শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আত্মপ্রাকশ করে। এরাই হচ্ছে ভারতীয় নিশ্চল সমাজকে সচলকারী প্রবল শক্তিধর মধ্য শ্রেণী। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আশীর্বাদ পুষ্ট এই শ্রেণী বিদেশী বণিকদের সাথে যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় এক ভয়াবহ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়। এর আগেও এদেশের উপর দিয়ে বহু রাজনৈতি ঝড় ঝঞা বয়ে গেছে; অথচ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর এমন ব্যাপক পরিবর্তন ইতিপূর্বে আর কখনই লক্ষ্য করা যায়নি। যা দেখা গেছে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগ্রাসনের ফলে। এ সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম বলেছেন: "প্রাগ-বৃটিশ যুগের রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ফলে ক্ষমতাশীন বিশেষ বংশ বা শ্রেণীই পরিবততি হত এবং বাকী সমাজদেহ থকাত অনড়। এরন ব্যত্যয় ঘটলো বৃটিশ শাসনের বেলায়। কোম্পানী বাহাদুর শুধু মুর্শিদাবাদের শাসকচক্রকে উৎখাত করেনি, দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিটি স্তর, উপরন্ত উপলব্ধি করে কোম্পানীর আধিপত্যের উপদ্রব। নবাব হারায় ক্ষমতা, অভিজাত শাসক শ্রেণী হারায় এর শাসনক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তি। জমিদার হারায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সহায়সম্পত্তি। শোষিত রায়তশ্রেণী শুষ্কশীর্ণ অবস্থায় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। ব্যবসায়ী তার পুঁজি হারডায়, হারায় তার অস্তিত্ব, তাঁতী; মালঙ্গী রূপান্তারিত হয় প্রায় ক্রীতদাসে এমনকি সংসার ত্যাগী ফকির সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত ইংরেজ শাসনে শংকিত। তারা এখন আরেগর মত অবাধে ভিখ ও মুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে না। নিরাপদে তীর্থস্থান ভ্রমণ করতে পারে না। নাবাবের সিংহাসন থেকে গরীবের পর্ণকুটির পর্যন্ত এমন আকাশপাতাল প্রলয়ংকরী ওলটপালট ইতপূর্বে কখনও ঘটেনি।"

এই প্রলয়ংকরী ওলটপালটের ফলে শুরু হয় কোম্পানী কর্তৃক তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়নের করুন অধ্যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং কোম্পানীর এদেশীয় কর্মচারী অর্থাৎ গোমস্তা, বেনিয়া, জমিদার প্রভৃতিকে তাদের লণ্ঠনের ভাগীদার করে সারা বাংলার বুকে শোষণ মাসনের তান্ডব নৃত্য শুরু করে। এই শোষণের তীব্রতা এতো বেশী ছিল যে, খোদ ইংল্যান্ডের মাটিতে ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

তবে এটা ঠিক যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শোষণের বুনিয়াদ ও শাসনের সুবিশাল যন্ত্র একদিনে গড়ে উঠেনি। পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং এর স্বার্থে এ অঞ্চলের শিল্প বৃষি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করা, গড়ে ওঠা বিনিয়োগযোগ্য পূঁজি, সম্পদ ধ্বংস করার ইতিহাসও একদিনের নয়। প্রায় দেড়শত বছর ধরে ধীরে ধীরে বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে কোম্পানী যেমন আঠারো শতকের মধ্যে এ অঞ্চলের প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে সুসংহত করেছিল, তেমন ঔ সময় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের মহড়া শুরু করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

### ৬.১.১ শিল্প ধ্বংস

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ কোম্পানী ধিরে ধিরে এ অঞ্চল গ্রাস করার পায়তারা করছে তখনও বাংলা ছিল বস্ত্র শিল্প সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি যোগ্য অঞ্চল। বৃটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যবসাই ছিল এদেশ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করে প্রচুর লাভের বিনিময়ে এ সমস্ত পণ্য বৃটেন অথবা ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা। ঐ সময় বিশেষ করে বাংলা বিহারে চরকা এবং হাতে চালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মত বস্ত্রশিল্প ইংল্যান্ড কেন সমগ্র ইউরোপে কোথাও প্রস্তুত হতো না। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত এই সমস্ত বস্ত্র বৃটেন ও ইউরোপের বাজার প্লাবিত করে ফেললো, ইউরোপে প্রস্তুত নিম্নমানের বস্ত্র ভারতীয় উন্নতমানের বস্ত্রের কাছে মার খেয়ে যেতে থাকে। ফলে বৃটিশ বস্ত্র শিল্প মালিক সম্প্রদায় তাদের বস্ত্র শিল্প রক্ষার তাগিদে ভারতীয় বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। (এভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের আগেই ইংল্যান্ডে বাংলার রেশমী বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হতে থাকে। এতে যে প্রতিক্রিয়া হয় এর ফল দাঁড়ায় দুই ধরনের যেমন এক, বৃটেনের বাজরে এ অঞ্চলের বস্ত্র প্রবেশ ক্রমশঃবন্ধ হয়ে যায়। দুই, ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়ের লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃটিশ পণ্য এ অঞ্চলে রপ্তানির প্রয়োজন দেখা দেয়। বস্ত্র শিল্প রক্ষা, বাণিজ্যিক ভারসাম্য ব্যবস্থা এবং ভারত থেকে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদের সমন্বয়ে গ্রেট বৃটেনে শুরু হয় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। ইতিহাসে যা শিল্প বিপ্লব নামে খ্যাত।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের অর্থ যোগান দিতে বাধ্য হয়েছিল বাংলার জনগণ তেমন বৃটিশ পুঁজিপতিদের মুনাফা লাভের আকাংখা চরিতার্থের নিমর্মতার শিকার ও হতে হয়েছিল এ অঞ্চলের জনগণকেই। কেননা ইউরোপে তাদের পণ্যের বাজার গড়ে তোলার স্বপ্ন প্রথমেই ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। অথচ শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন পণ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল বাজারের। বৃটিশ পুঁজিপতিরা এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউরোপে অবাধ বাণিজ্যর ধূয়া তুলে ইউরোপের বাজার তাদের পণ্যে ছেয়ে দিতে চেয়েছিল। ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো অবাধ বাণিজ্য নীতির উদ্দেশ্যমূলক আক্রমণ থেকে স্ব স্ব পণ্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। বৃটিশ পুঁজির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃটিশ পণ্যের উচ্চহারে রক্ষা শুল্ক বসিয়ে এই অসম শিল্প নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তোলে। ফলে ইউরোপে বৃটিশ পণ্যের বাজারের সম্ভাবনা শুরুতেই ভেস্তে যায়। সুতরাং প্রয়োজন পড়ে বিশাল এবং নিশ্চিত এক বিকল্প বাজারের সে বাজারে এমন হবে যা হারাবার শংকা কম। অধিকৃত বাংলা তথা ভারতবর্ষ বন্ধ হয়ে গেল এর উজ্জলতম সম্ভাবনার দুয়ার। প্রথমে এই নষ্ট হয়েছিল ইংল্যান্ডের বাজারে এ অঞ্চলের বস্ত্র পণ্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণে। পরে এই শিল্প মার খেয়ে গেল উন্নতমানের যন্ত্রচালিত তাঁতে বোনা বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের কাছে ফলে যে বাংলা

*Dhaka University Institutional Repository*

বা ভারতবর্ষ এক সময়ে ছিল শিল্পের রপ্তানিকারক, বিদেশী পুঁজির আক্রমণের অসহায় শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো আমদানিকারক দেশে। এই পুঁজি আক্রমণ এবং তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সর্ম্পকে মার্কস বলেছেন; "বাণিজ্যের সমস্ত চরিত্রই বদলাইয়া গিয়াছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানিকারী দেশ, আর এখন ভারতবর্ষ আমদানীকারী দেশে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তন এত দ্রুত দেখা দিয়াছে যে, এমনকি ১৮২৩ খ্রীষ্টব্দেই টাকার বিনিময়মূল্য দুই শিলিং ছয় পেন্স হইতে হ্রাস পাইয়া দুই শিলিংয়ে পরিণত হইয়াছে। যে ভঅরতবর্ষ স্মরণাতীতকাল হইতে সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষ এখন ইংল্যান্ডে উৎপন্ন সুতা ও তুলাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত হইল। ইহার অনিবার্য পরিনতি হইল বিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংশ।

১৭৭০ সাল থেকে বৃটেনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যগত পুঁজিতন্ত্র যখন শিল্পজাত পুঁজিতন্ত্রের যে লড়াই ছিল তার জয় ক্রমশ শিল্পজাত পুঁজিতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা সরকাররে উপর কর্তৃত্ব অর্জনের যে প্রচেষ্টা চালায় তাতে তারা সাফল্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বার্থে ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। কোম্পানীর রাজনৈতিক অধিকার খর্বকারী ১৭৭৩ সালের লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও ১৭৭৪ সালে টিটোর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এই ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তব পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাস্তব পদক্ষেপ এবং এর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায় বাংলার প্রতিষ্ঠিত; বস্ত্র শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প। শুরু হয়ে যায় শিল্প সমৃদ্ধ সুজলা সুফলা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ধ্বংশের ধ্বংসাত্মক তান্ডবলীলা।

এ ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের পরিণতি হয় এই যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখলকৃত ভারতীয় অঞ্চল সমুহের কুঠীর শিল্প ধ্বংসের সাথে সাথে প্রাচীন গ্রামীণ সমাজের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ এ ধ্বংসের উপর এমন কোন আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি যা এই অঞ্চলের জন্য শুভ বলে বিবেচিত হয়েছে। এ কারনে মার্কস এই অঞ্চলের পরিবর্তন বিমূখ নিশ্চল গ্রামীণ ধ্বসের জন্য যেমন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তেমন এই ধ্বসের উপর নূতন কোন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে হয়ে উঠেছেন তীব্র সমালোচনারমূখর। তাঁর ভাষায় এই পরিবর্তনের দুঃখজনক পরিণতি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো: "বিভিন্ন সময়ের গৃহযুদ্ধ, বিভিন্ন আক্রমণ, বিভিন্ন রাজ্য দখল, সকল দুর্ভিক্ষ-এইগুলি হিন্দুস্থানের বুকের উপর যতই অদ্ভূত রকমের জটিল, যতই দ্রুত যতই ধ্বংসকারী রূপে একটার পর একটা ঘটুক না কেন, এইগুলি কখনই ভারতীয় সমাজের উপরের স্তর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের ভিত্তিমূল ও কাঠামোটা ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পূনর্গঠনের কোন লক্ষণ এ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। পুরাতন সমাজ হারাবার ও তাহার পরিবর্তে কোন নূতন সমাজ সৃষ্টি না হইবার ফলে....অসহনীয় দুঃখের জীবনে বিশেষ ধরনের একটা বিষন্নতার ভাব ফুটিয়ে উঠে এবং বৃটেন দ্বার শাসিত হিন্দুস্থান তাহার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমগ্র প্রাচীন ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।"

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলার শোষিত নিপীড়িত জনগণের মৃত্যু ধ্বংস আর সম্পদের বিনিময়ে ইংল্যান্ডে গড়ে উঠা শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের প্রয়োজনীয় বাজার লাভের জন্য এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আত্মসাৎকৃত অর্থ সম্পদ বৃটিশদের মনে ভারতীয় সম্পদের প্রতি যে লোভের জন্ম দিয়েছিল, সেই সম্পদ লিপ্সা এবং বাজার সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা দুইই সমগ্র উপমহাদেশ দখলে ইংরেজদের উৎসাহিত করতে থাকে। এদিকে ১৮১৩ সালের চার্টারে শিল্প পুঁজিতন্ত্রের জয় সুচিত হলে, ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। ১৮১৩- এর চার্টার আইন অনুসারে কোম্পানীর এই অধিকার অবসানের তাৎপর্য হলো যে, এখন থেকে ভারতবর্ষ সরাসরি বৃটিশ শিল্পগত পুঁজির অবাধ শোষণের উপনিবেশে পরিণত হলো।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালু হবার পর বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের আরেকটি সম্ভাবনা দেখা দেয়। কেননা উক্ত অনুযায়ী এ অঞ্চলে ইংল্যন্ড থেকে পুঁজি আগমনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হলে দেশীয় বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের হাতে সঞ্চিত থাকে বিপুল পরিমাণের অর্থ। এই দেশীয় পুঁজর সাথে ইংল্যান্ড থেকে আগত পুঁজির সমন্বয়ে অথবা স্বাধীনভাবে বাংলাদেশে শিল্প গড়ে তোলা এবং বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশী পুজি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পথ একেবারেই বন্ধ করে দেয়া হয়। বাংলার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভিন্ন ধারার বিকাশের সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল তা বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে।

এ কারণেই ১৮৫৭ সালের ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ পুঁজি বাংলায় লগ্নি হলেও এর সুফল বাংলার জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন বা এতে বাংলার অর্থনীতির বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধিত হয়নি। এই লগ্নিকৃত পুঁজি ছিল মূলতঃ বাণিজ্য পুঁজি, ফলে এ পুঁজির জন্য সহায়ক শিল্প ব্যতীত অন্য কোনকিছু এ অঞ্চলে গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। এর আরেকটি দিক হচ্ছে লগ্নিকৃত পুঁজির সমস্ত মুনাফাই চলে গেছে সমুদ্র পার হয়ে বৃটিশ শিল্পপতিদের হাতে। ফলে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বার বাংলায় উন্মোচিত হওয়ার কথা তা হয়ে যায় রুদ্ধ। নিম্নের সারণীতে ১৮৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত আমদানি পুঁজি ও রপ্তানি পুঁজির যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে তা বুঝা যায় যে, এ অঞ্চলে নিয়োগকৃত পুঁজির অতিরিক্ত মুনাফার পাচার হয়ে গেছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.১

১৮৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯১৩-১৯১৪ সাল পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানি পুঁজির পরিমাণ (কোটি রুপী হিসাবে)

| সময় | আমদানি পুঁজির পরিমাণ | রপ্তানির পুঁজির পরিমাণ | অতিরিক্ত রপ্তনি |
|---|---|---|---|
| ১৮৫৮-৫৯ | ২৪,৩০,০০০০০ | ২৮,৯০,০০০০০ | ৪,৬০,০০০০০ |
| ১৮৭৯-৮০ | ৪১,২০,০০০০ | ৬৯,২০,০০০০০ | ২৮,০০০০০০০ |
| ১৮৯৫-৯৬ | ৭৩,০০০০০০০ | ১১৮,৬০,০০০০০ | ৪৫,৬০,০০০০০ |
| ১৯১৩-১৪ | ১৯১,০০০০০০০ | ২৪৯,০০০০০০০ | ৫৮,০০০০০০০ |

সুত্র ঃ রহমান, আতিউর, ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি

উপরোক্ত সারণি অনুসারে অর্জিত মুনাফা সমেত পুঁজির রপ্তানির ফলে এ অঞ্চলে পুঁজি গড়ে উঠতে না পারার কারণে স্থানীয় পুজির গতিমুখ হয়ে পড়ে স্তব্ধ। এ কারণে উনিশ শতকের প্রথমার্ধকাল পর্যন্ত দেশী বণিক শ্রেণী শিল্প বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে জমিদারী ক্রয় করে, অথবা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে অন্য কোন পেশায় আত্মনিয়োগ করে।

### ৬.১.২ কৃষি ধ্বংস

অপরদিকে বাংলার শিল্প অর্থাৎ বস্ত্রশিল্প থেকে শিল্প পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বাংলার জনগণের কৃষি ছাড়া আর কোন জীবিকার উপর নির্ভর করার উপায় ছিল না। অথচ আকস্মিকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষক শ্রেণী একদিকে সর্বগ্রাসী জমিদার শ্রেণী এবং অপরদিকে বৃটিশ পণ্যের নির্মম শোষণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

দেশীয় বণিক শ্রেণীর ধ্বংস লগ্নিপুঁজির ব্যাপক প্রভাব এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে ও এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। চিরস্থয়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং লগ্নি পুঁজির বাজারের জন্য কৃষিপণ্য সরবরাহ করার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মূলতঃ বাজারমূখী হয়ে পড়ে। এ কারণে গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণা সমবায় জীবন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। এর পরিবর্তে প্রতিযোগীমূলক

*Dhaka University Institutional Repository*

এবং ব্যক্তি স্বার্থ নির্ভর মানসিকতার বিকাশ ঘটে। কেননা ধনতান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ। সুতরাং বৃটিশ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের আদর্শ বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সঞ্চারিত করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এই আদর্শের ভিত্তিতে এ অঞ্চলের শাসন শোষণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং এই পুনর্বিন্যাস প্রচেষ্টার প্রথম ধ্বংসাত্মক আঘাত এসে লাগে বাংলা বিহারের গ্রাম সমাজ ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থায়। জমির উপর কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভূসম্পত্তির উপর গ্রাম সমাজের যৌথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এছাড়া প্রাগ বৃটিশ যুগে রাজস্ব হিসেবে গ্রামের সমগ্র জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের একাংশ গ্রাম সমাজের যৌথ অধিকার ভোগী কৃষকরা সমবেতভাবে প্রদান করত। রাষ্ট্র রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করত মোট ফসলের একটা অংশ। মুদ্রায় কর প্রদান ছিল সম্পূর্ণরূপে গ্রাম সমাজের ইচ্ছা নির্ভর। কিন্তু নূতন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ম্যল্যোর ভিত্তিতে নগদ অর্থের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের নিয়ম চালু হয়। যে কোন অবস্থায় বা যে কোন পরিস্থিতিতে কৃষক বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে এই নির্দিষ্ট কর বা খাজনা দিতে বাধ্য হতো। কোন অবস্থাতেই এই খাজনা থেকে কৃসকের মুক্তি পাওয়ার উপায় ছিল না। এই নূতন ভুমি ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বলতে যেয়ে স্যালভেনাকার বলেছেন: "নুতন শাসকগোষ্ঠীর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং বৃটিশ পূর্ব যুগের শস্যের পরিবর্তে মুদ্রা দ্বারা ভূমি রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে আরও দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। যাহা এতদিন চিরাচরিত প্রথা হিসেবেই অপরিবর্তনীয় ছিল, তাহা মুদ্রার প্রচলনের ফলে ধ্বংস হইয়া যায়. ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের দ্বারা কৃষি ভুমির ইজারা দান বিক্রয় বন্ধক প্রভৃতি যাহা বৃটিশ পূর্ব যুগে আত্মসম্পূর্ন গ্রাম সমাজের যৌথ বিচার বিবেচনার দাক্ষার তদারক ও নিয়ন্ত্রন করা হইত, তাহা এখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কৃষকই বৃটিশ আইনের বলে এবং নুতন বিচারালয়ে যাইয়া অর্থ গৃধ আইনজীবীদের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারে।"

এভাবে ভুমি ব্যবস্থায় চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তনের ফলে শুধু গ্রামে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠমোতে ভাঙ্গন ধরেনি যৌথ পরিবারগুলোর মধ্যেও ভাঙ্গন দেখা দেয়। " লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থণৈতিক চাপের ফলে জমিজামার পারিবারিক হোল্ডিং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে এবং কৃষকরা মহাজনেদের খপ্পরে নিপতিত হয়।"

মহাজনের খপ্পরে পড়েই কৃষকরা ক্রমশঃ সমাজের এক নিঃস্বশ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। বৃটিশ শাসকদের মূল উদ্দেশ্য যেমন ছিল অবাধ শোষণ তেমন এদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তায় সৃষ্টি হতে থাকে সামজের স্তরে স্তরে শোষক শ্রেণীর। প্রাগ বৃটিশ যুগে যে ভারতের গ্রামীণ সামজে মহাজন ছিল সমাজসেবক কৃষকের ত্রাণকর্তা সেই মহাজন শ্রেণীই বৃটিশ ভারতে পরিণত হলো ঋনগ্রস্থ অসহায় কৃষকের জমি আত্মসাৎকারী হিসেবে। এ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় বলেছেন: " বৃটিশ শাসনের

*Dhaka University Institutional Repository*

যুগে পূর্বের সকল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই বৈদেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় নিরীহ সমাজসেবক মহাজন প্রাণঘাতী শোষকে পরিনত হইল।"

এইভাবে ঋণগ্রস্থ কৃষকের জমি আত্মসাৎ করে মহাজন পরিণত হয় জমি মালিকে এবং জমির সত্ত্বাধিকারী কৃষক রূপান্তরিত হয় ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক হিসেবে অথবা ভাগ চাষীতে। এই রূপান্তর সম্পর্কে বলতে যেয়ে ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত বলেছেন: "মহাজন কৃষকগণকেই শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করিয়া ক্রমশঃ গ্রামের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র মূলধনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ ও প্রত্যক্ষ উৎপীড়ক হিসেবে হয়ত প্রথমে মহাজনের উপরই কৃষকের ক্রোধানল বর্ষিত হইতে পারে কিন্তু তাহারা শীঘ্রই দেখিতে পায় যে, মহাজনের পশ্চাতেই দন্ডায়মান রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র শক্তি। মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনও মহাজনী মূলধনের (Finance Capital-এর) সমগ্র শোষণচক্রের একটি অপরিহার্য মূলদন্ড স্বরূপ।"

এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক শ্রেণীর উপর নেমে আসে চরম শোষণ নির্যাতনের যাতাকল। বৃটিশ ভারতের কৃষকদের তিন ধরনের শোষকের মুখোমুখি হতে হয় যেমন পথাম বৃটি শাসক শ্রেণী; যারা আদায় করত ভুমি রাকস্ব দ্বিতীয় জমিদার শ্রেণী; যারা আদারয় করত খাজনা এভং তৃতীয় শোষক মহাজন শ্রেণী ; যাদের দিতে হতো ঋণের সুদ হিসেবে বৃষকের অবশিষ্ট ফসলের সবটাই। ভারতের বৃটিশ ধনতান্ত্রিক প্রশানন ব্যসস্থার মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শোষণ; এই শোষণ নির্বিঘ্নে করার লক্ষ্যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় আনা হয় এই জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই: "বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে ভারতীয় কৃষক কেবল বৃটিশ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করবে এবং বৃটিশ কল কারখানায় যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন পণ্য সম্ভার ক্রয় করবে। বৃটিশ শিল্পের প্রয়োজনেই ভুমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নুতন কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করা হয়। সেই পয়োজনেই গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন করে প্রাচীন গ্রামে সামজের ধ্বংসাবশেষ এবং বস্ত্র লবণ প্রভৃতি কৃষকদের শিল্পগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রার প্রচলন অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, জমিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাজার মূখী কৃষি উৎপাদন, সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে কৃষি ব্যবস্থার এই অযাচিত পরিবর্তনের বাংলার কৃষকের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে। বৃটিশ রাজত্বকালে কৃষক শ্রেণীর মেরুদন্ড খাড়া করে দাঁবার আর কোন উপায় থাকে না। তার উপর চিরস্থয়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী জগদ্দল পাথরের মতো বাংলার কৃষকের বুকে চেপে বসে। ভুমির রাজস্ব উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জমির উৎপাদন উত্তর উত্তর কমতে থাকে। এ সময়ে সম্পদ উন্নয়নের বা জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি বিন্দুমাত্র পচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই। চিরস্থয়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিকভাবে এই উন্নয়নের দায়দায়িত্ব বর্তেছিল কৃষক এবং জমিদার শ্রেণীর উপর। কিন্তু নানা

*Dhaka University Institutional Repository*

সমস্যায় জর্জরিত এবং রাজস্বের ভারে নত কৃষকগণের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে হলেও কৃষির ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের কারণে জমিদার শ্রেণীর পায়ের নীচে মাটিও স্থায়ী হতে পারেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুসরে জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় রাজস্বা সরকারকে দিতে অক্ষম হলে সরকার তাদের জমিদারী থেকে প্রয়োজনমত জমির অংশ বিক্রি করে বাকী রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা লাভ করে। যার ফলে জমিদার শ্রেণীর উপর ধার্য বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সঠিক সময়ে দিতে না পারার কারণে অনেককেই জমিদারীর অংশ অথবা পুরো জমিদারীই হারাতে হতো। এ কারণেই এরা এদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতো রাজস্ব আদায়ে, জমির উন্নয়নে নয়। এভাবেই পুরাতন অভিজাত জমিরদার শ্রেণী রাজস্ব দিতে অপরাগতার কারণে জমিদারী অংশ বা পুরো জমিদারী হারায়। আর এই বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি কিনে নিতে থাকে তৎকালীন সমাজের ধনী মহাজন, কোম্পানীর বেয়িা ও মুৎসুদ্ধিগণ। যারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে জমিজমার সঙ্গে বহু বছরের সম্পর্ক যুক্ত বনেদী জমিদার শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর স্থান দখল করে নেয় শহরবাসী জমিজমা সংক্রান্ড় বিষয়ে অনভিজ্ঞ উপরোক্ত ধনী ব্যক্তিবর্গ। এই নব্য জমিদার শ্রেণীর রাজস্ব আদায়ের প্রতি পুরোমাত্রায় আগ্রহ থাকলেও জমির প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না। এরা অনুপস্থিতি জমিদার (Absentee landlord) হিসেবে জমি থেকে প্রাপ্ত অর্থে শহরে নিশ্চিন্ড়ে বিলাস ব্যাসনে দিনযাপন করত। এই অবস্থায় অর্থের প্রয়োজন হলেই এরা জমির উপর রাজস্ব বৃদ্ধি করত। কর ভারে জর্জরিত কৃষক অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে অক্ষম হয়ে দৈহিক নিপীড়নের ভয়ে জমি ছেড়ে পালিয় বাচঁত। একদিকে অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণীর নায়ব গোমস্তা কর্মচারীদের সীমাহীন অত্যাচার এবং নব সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর তীব্র শোষণ, ক্রমবর্ধমান রাজস্বের হার অপরদিকে জমির উৎপাদন শক্তি হ্রাস, ফলে বাংলার কৃষকের সাথে কৃষি ব্যবস্থা ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ভুমির উপর চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন ক্রমশঃ কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংসের ইতিহাসে রূপ নেয়।

শুধু কৃষি নয় পরিবতির্ত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সারা অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র শুরু হয় এক অস্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং প্রবল সামাজিক অস্থিরতা। চরম শোষণ শাসনের শিকার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার বাংলার কৃষক সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমাগত স্থানে স্থানে জ্বলতে থাকে বিদ্রোহের আগুন। পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে শুরু হয় এই বিদ্রোহ। এ ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনিবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ক্রমাগত বিদ্রোহ চলতে থাকে।

সর্বোপরি ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আগুন দাবনলের মতো সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে কোম্পানীর শাসনের ভিত্তিতে ধ্বস নামে। কোম্পানীর শাসন অবসানের পারও সুন্দরবন

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে ১৮৬১, সিরাজগঞ্জে ১৮৭২ সালে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সমস্ত বিদ্রোহগুলোতে কোম্পানী আমলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী দৃঢ়ভাবে শাসকদের পক্ষ অবলম্বন করে।

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে শুধু একটি তাবেদার শ্রেণী গড়ে তুললেও এর ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ধীরে ধীরে যে স্তর বিন্যাস দেখা দেয়। তার মধ্য থেকে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। যারা সামাজিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য বৃটিশ শোষণ শাসনকে দৃঢ়ভাবে দায়ী করতে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি করতে থাকে। যদিও প্রথম এই নব্য সৃষ্ট শিক্ষিত শ্রেণী অনুগত জমিদার শ্রেণীর মতই বৃটিশ প্রভুর ভক্ত ছিল। পরবর্তীতে এরাই বৃটিশ শাসন শোষণের শেকড় উপড়ে ফেলার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। এই শ্রেণীই হচ্ছে বাংলা তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রায় সমস্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ শ্রেণীর মধ্যেই প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

## ৬.২ পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ঃ

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ও অর্থনীতিকে বুঝতে হলে পাকিস্তান সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনাকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে সে সামগ্রিক আলোচনার আগে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ও অর্থনীতি স্বতন্ত্রভাবে কেমন ছিল তা প্রথমে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। আর তা দেখেতে গিয়ে আলোচনা করা হবে অর্থনীতির প্রধান দু'টি দিক, তথা কৃষি ও শিল্পকে এবং এ দু'টি খাতের সাথে সম্পর্কিত শ্রেণীসমূহের বিকাশের স্তর ও তার সম্ভাববনাকে সেই সাথে সমাজের অপরাপর অংশ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবীসহ অপরাপর শিক্ষিত পেশাজীবীর সামাজিক অবস্থানকে। অবশ্য এ সকল শ্রেণীর বিকাশের সম্ভাবনা এবং সমস্যাকে স্পষ্ট করতে হলে পাকিস্তানের পুরো অর্থনতি ও রাজনীতিকে আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ওপরও বিশেষভাবে আলোকপাত করা আবশ্যক।

### ৬.২.১ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি কাঠামো:

যে কোন কৃষিপ্রধান সমাজের মতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে গ্রামের প্রধান উৎপাদনের উপায় ছিল ভূমি। এই ভূমি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে যে উৎপাদন কৌশল ব্যবহৃত হয় এবং তার ফলে যে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে, তার সামাজিক রূপই হচ্ছে কৃষি কাঠামো। অবশ্য ভূমির মালিকানা, বিভিন্ন ধরনের স্বত্বাধিকার চুক্তির ধরন কিংবা মজুরীর প্রকৃতি, ঋণ এবং তার ব্যবহার ইত্যাদিও গ্রামীণ কাঠামোর অধীন। তবে কৃষি কাঠামো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে হলে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকেও (Social organization) তার অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

*Dhaka University Institutional Repository*

কেননা যদিও অর্থনৈতিক কাঠামোই কোন সমাজকাঠামোর মূল ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন দিক, যেমন, ক্ষমতা, গোষ্ঠী ও শ্রেণী সংগ্রামের ধরন ও তার ফলাফল ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির গতিকে প্রভাবিত করে। এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে উপরিকাঠামোই প্রধান হয়ে ওঠে। এদিক থেকে আন্দ্রে বেঁতে কৃষি কাঠামোর সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য অত্যন্ত সংগত পরামর্শ দিয়েছেন। বেঁতের মতে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর অর্থপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য জমির মালিকানা, জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং তা ব্যবহারের প্রকৃতির পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনকেও বিশ্লেষণের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। কেননা যে সমাজে জমিই হচ্ছে সামাজিক অসমতার মূল ভিত্তি সে সমাজের সামাজিক সংগঠনগুলিকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সমাজের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। তাই কৃষিকাঠামো বলতে এখানে গ্রামীণ ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও সংগঠনের সমন্বিত রূপকে বোঝানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটি এসে পড়ে। কামাল সিদ্দিকী এ ভূমি সংস্কার আইনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছে।

১. স্বল্প সংখ্যক জমিদারের অধীন জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ফলে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত জমিকে জমিদার ও জোতদারগণ বেনামীতে জাল দলিল করে এবং ঘুষ দিয়ে স্বত্ব গোপন করতে সক্ষম হয়।

২. জমি ভাড়া দেওয়া বেআইনী করা হলেও কার্যতঃ দেখা গেল ফসলের অর্ধেক অংশ হিসাবে বর্গাচাষকে ভাড়া হিসাবে গণ্য করা হয়নি। আসলে, যা বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ইজারা ব্যবস্থা অপেক্ষাও বর্গাচাষ অনেক বেশি ক্ষতিকর। কার্যতঃ জমি ভাড়া প্রদানও বন্ধ হয়নি, বরং মৌখিক ও প্রচ্ছন্নভাবে জারা প্রদান বেড়ে যায়। ফলে রায়তী স্বত্ব অধিক নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে এবং এটা একটা নির্বিচার খাজনা ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে।

৩. ভাগচাষকে মজুরী শ্রমের সঙ্গে এক করে দেখার ফলে জমি ইজারা প্রদান এবং খাজনা গ্রহনের মধ্যবর্তী স্বার্থগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা অর্থহীন হয়ে পড়ে। উপরন্তু এটি একটি উৎপাদন বিরোধী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কেননা উৎপাদনের ব্যয় ভাগাভাগির ব্যাপারে এই আইনে কিছুই উল্লেখ না থাকায় বর্গাচাষীকে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে উন্নত বীজ, যন্ত্রপাতি ও সার ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে তোলে। এর ফলে অধিক ফসল ফললেও জমির মালিককে ফসলের (কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি) দিতে গিয়ে বর্গাদারের উৎপাদন খরচ পোষায় না।

উপারোক্ত ত্রিবিধ কারণে উক্ত ভূমি সংস্কারের সুফল পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিহীন ও ছোট কৃষকদের জন্য প্রায় কোন কাজেই আসেনি।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.২

১৯৫১-৬১ কালপর্বে আবাদী জমির সাথে কৃষকদের সম্পর্কের প্রকৃতি

| বছর | আবাদী জমি (%) | | মালিক পরিবার | ভাগচাষী পরিবার (%) | বর্গা জমির ওপর নির্ভরশীল ভাগচাষী (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | মালিকানাধীন | বর্গাচাষাধীন | | | |
| ১৯৫১ | ৬৮ | ৩২ | ৬১.৩০ | ৩৮.৭ | ১১.৫ |
| ১৯৬১ | ৭১ | ২৯ | ৬০.০০ | ৪০.০ | ১২.০ |

সূত্র ঃ সিদ্দিকী, ১৯৮১

সারণি ৬.২ থেকে দেখা যায়, উক্ত ভূমি সংস্কার কার্যকরী হওয়ার আগে এবং তার পরে অন্ততঃ বর্গাচাষীদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫১ সালে মোট আবাদী জমির শতকরা ৬৮ ভাগ জমি মালিকের নিজ চাষের অধীন ছিল, আর শতকরা ৩২ ভাগ জমি ছিল বর্গাচাষের আওতাভুক্ত। অন্যদিকে, ১৯৬১ সালে মালিকের চাষের অধীন জমির পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ বেড়ে ৭১ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বর্গাচাষের অধীনস্থ জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও ভাগচাষী পরিবারের সংখ্যা একটুও হ্রাস পায়নি, বরং শতকরা ১.৩ ভাগ বেড়ে গেছে। ১৯৫১ সালে যেখানে বর্গাচাষীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৮.৭ ভাগ, সেখানে ১৯৬১ সালে এসে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪০.০ভাগে। পরিপূর্ণভাবে বর্গাচাষের ওপর নির্ভরশীল ভাগচাষীর সংখ্যাও এ সময়ে শতকরা ১১.৫ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ১২.০ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

১৯৫০ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অন্য একটি দিক হচ্ছে এই যে, এখানে জমিদার বা কৃষক সবার জন্যই ১০০ বিঘার উপর জমির মালিকানাকে বেআইনী করা হয়েছে। কিন্তু কৃষক প্রজা (Cultivating Tenant) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এমন সকল প্রজাকে যারা তার পুরো জমি নিজে চাষ করে, বর্গাদারকে দিয়ে চাষ করায় কিংবা ক্ষেতমজুরকে দিয়ে চাষ করায়। কৃষক প্রজা সম্পর্কে এ ধরনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়ায় এমন সংখ্যা পরিবার কৃষক প্রজা হিসাবে স্বীকৃতি পায় যারা কৃষির সাথে কোনভাবেই যুক্ত নয়। এরা যে শুধু কোন দৈনিক পরিশ্রমই করে না তা নয়, তারা চাষাবাদকে দেখাশোনা পর্যন্ত করেনা। এমনকি, তাদের অনেকের বাসস্থানও তার মালিকানাধীন জমির কাছাকাছি নয়। ফলে অনুপস্থিতি ভূস্বামীদের পক্ষে অন্য পেশায় যুক্ত থেকেও জমি বর্গা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের গুরুত্বপূর্ণ অংম বোঘ করার সুবিধা থেকে যায়। কার্যতঃ এ সত্যকে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করে। যেমন, পাকিস্তান পরিকল্পনা

*Dhaka University Institutional Repository*

কমিশনের মতে, "In Fact, there is tendency to absentee landlordism and the reappearing of tenancy")

১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন হওয়ার পর তা কার্যকরী হতে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ আইনের ফলে বেশ কিছু ভূমিহীন বা ছোট কৃষক কিছু কিছু করে জমিও পেয়েছিল, কিন্তু এ আইন প্রতিষ্ঠার ফলে যে লক্ষ্যে পরিষদে বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি। কেননা পরবর্তীকালে ভূমিহীনতার হার মোটেও হ্রাস পায়নি, বরং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তা বেড়ে গেছে। বর্গাচাষের শর্তসমূহও এমন হয়ে আসে যে, শুধু মাত্র বর্গা চাষের ওপর নির্ভর করে অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা বর্গা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করার ফলে ভাগচাষীর ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। ভাগচাষী জমির মালিকের দাবি মেটাতে গিয়ে নিজের যে জমিখন্ডটুকু ছিল তারপর হাত দিয়ে বাধ্য হয়। নিজের সবটুকু সম্পত্তি হারিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভাগচাষীতে পরিণত হবার পরও যখন অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন তাকে বাধ্য হয়ে ভাগ চাষের পাশাপাশি ক্ষেতমজুরী পেশাকে গ্রহণ করতে হয়। এই চিত্রটিই ফুটে উঠেছে সারণি ৬.৩-এ।

সারণি ৬.৩.

**১৯৫১-৬১ সালপর্বে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির বিন্যাস (লক্ষ লোকের হিসাব)**

| প্রকারভেদ | সংখ্যা | | শতকরা হার | | পরিবর্তনের হর |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৫১ | ১৯৬১ | ১৯৫১ | ১৯৬১ | |
| আবাদী জমির সবটুকুর মালিক কৃষক নিজে | ৩৭.৪০ | ৫০.১০ | ৩৪.৮৯ | ৩৪.৮৪ | ৩৩.৯৬ |
| কিছুটা নিজের এবং কিছুটা বর্গা নো কিংবা পুরোটাই বর্গা নেয়া | ৪৯.৬০ | ৫৬.০০ | ৪৬.২৭ | ৩৮.১৪ | ১২.৯০ |
| বর্গাচাষ করে, একই সাথে কৃষিমজুর | ৪.১০ | ১০.১০ | ৩.৮২ | ৭.০২ | ১৪৬.৩৪ |
| ভূমিহীন কৃষিমজুর | ১৬.১০ | ২৭.৬০ | ১৫.০২ | ১৯.১৯ | ৬৩.৬০ |
| মোট কৃষি শ্রমশক্তি | ১০৭.২০ | ১৪৩.৮০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ৩৩.৮০ |

সূত্রঃ সিদ্দিকী, ১৯৮১।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.৩ থেকে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিতে মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ ২৩০ হাজার জন শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল। পরবর্তী ১০ বছরে তা শতকরা ৩৩.৮০ ভাগ বেড়ে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮০ হাজার জনে গিয়ে উপনীত হয়। এ সময়ে মোট কৃষি শ্রমশক্তির সংখ্যা শতকরা ৩৩.৮০ ভাগ বাড়লেও কৃষিশ্রমের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি শ্রেণীর পরিবর্তন একই হারে ঘটেনি। যে স কল পরিবার তাদের সমস্ত শ্রমশক্তি টুকুই নিজ মালিকানাধীন আবাদী জমিতে নিয়োগ করে, তাদের সংখ্যা ১০ বছরে শতকরা ৩৩.৯৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এদের বৃদ্ধির হার গোটা শ্রমশক্তির বৃদ্ধির হার অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশি। অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও প্রজস্বত্ব আইনের সুফল পেয়ে কিছু কৃষক পরিবার নিজ মালিকানাধীন জমিতে পুরো শ্রমশক্তি টুকু নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে, যে সকল পরিবার আংশিক বা পরিপূর্ণ অর্থে বর্গাচাষী ছিল তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটে। এ সকল কৃষক ১৯৫১ সালে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৬.২৭ ভাগ সরবরাহ করতো, কিন্তু ১৯৬১ সালে এদের সরবরাহ করা শ্রমশক্তির সংখ্যা এসে দাঁড়ায় শতকরা ৬৮.৯৪ ভাগে। শ্রমশক্তির মোট বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩.৮০ ভাগ হলেও, এদের বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র শতকরা ১২.৯০ ভাগে দাঁড়ায়। আর এদের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১৪৬.৩৪ ভাগ। অর্থাৎ ১৯৫১ সালে এদের যে সংখ্যঅ ছিল তা ১৯৬১ সালে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু যে ভাগচাষী কৃষি মজুরের সংখ্যাই এভাবে বেড়ে গেছে তাই নয়, ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালে এই শ্রেণীটি মোট কৃষি শ্রমশক্তির শতকরা ১৫.০২ ভাগ সরবরাহ করতো, যা ১৯৬১ সালে ১৯.১৯ ভাগে পৌঁছায়। অর্থাৎ ১০ বছরে এদের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৬৩.৫০ ভাগে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫০ এর উক্ত আইন মোতাবেক জমি পুনর্বন্টনের কাজটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। উপরন্তু যে জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান। এর কারণ, জমির মালিকদের নিজেদের ইচ্ছামত বেছে জমি রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই আইন বলে কিছু জমি সরকারের খাস জমিরূপে রেকর্ড হবার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলি ব্যক্তি বিশেষের নামে দলিলভূক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে, যদিও কাগজে কলমে অনেক বাড়তি জমি সরকারের হাতে এসে গিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কর্মচারীরা দীর্ঘকাল সেগুলির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি। ববলাবাহুল্য, জোতদারদের শর্তেই ছোটখামার মালিকদের কাছে এ ঋণ লেন দেন হত। সারণি ৬.৪ থেকে সে সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.৪

## ১৯৬০ সালে ভূমি মালিকানা ও মহাজনী ঋণের ধরন

| খামারের আয়তন (একর) | কামারে বন্টন ((%) | ঋণগ্রস্ত খামার মালিকের বন্টন (%) | ২৫০ টাকার নিচে যাদের ঋণ (%) | ২৫০-১০০০ টাকা পর্যন্ত যাদের ঋণ (%) | ১০০০ টাকার উপরে যাদের ঋণ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২.৫০ একরের নিচে | ৫১.৬৪ | ৪৫.৮৪ | ৭৪.৫৪ | ২৩.৪০ | ২.০৪ |
| ২.৫০-৫.০০ | ২৬.৩১ | ৫৩.৮৭ | ৬৫.৯৮ | ৩১.৬১ | ২.৪১ |
| ৫.০০-৭.৫০ | ১১.৩৭ | ৩৮.৫৪ | ৭৯.৫৫ | ১৩.০১ | ৭.৪৪ |
| ৭.৫০-২৫.০০ | ১০.৬০ | ৪৯.৫২ | ৪৪.৮৭ | ৪২.৩১ | ১২.৮২ |
| ২৫.০০ একরের উপরে | ০.০৮ | ৪৫.৭৭ | ২৭.৭৩ | ৩১.০৯ | ৪১.১৮ |
| ৮মোট | ১০০.০০ | ৪৯.১৩ | ৪৪.৮১ | ২৬.০৬ | ৩.৮১ |

উৎস ঃ Agriculatural crnsus, 1960,

সারণি ৬.৪ থেকে দেখা যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মোট খামারের শতকরা ৪৯.১৩ ভাগ খামারই ছিল ঋণগ্রস্থ। যে সকল খামার ঋণগ্রস্থ ছিল তাদের শতকরা ৬৬.৮১ ভাগ কামারের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকার নিচে; শতকরা ২৬.০৬টি খামারের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত এবং অবশিষ্ট ৩.৮১ ভাগ খামারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০০ টাকার উপরে। উপরোক্ত সারণিতে খামারগুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ২.৫০ একরের নিচে যাদের জমি, এরাই ছিল সে সময় মোট খামারের শতকরা ৫১.৬৪ ভাগ এবং সে সময়ে জমির উৎপাদনশীলতার মাত্রা যা' ছিল তাতে এ পরিমাণ জমি নিয়ে পায় কারো পক্ষেই সংসার পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ফলে এদেরকে বর্গাচাষ ও কৃষিমজুরীকে পার্শ্বপেশা হিসাবে গ্রহণ করতে হত। তবে এদরে অনেকে এত কম জমির মালিক ছিল যে, তাদের জন্য ঋণ সংগ্রহও কঠিন ছিল। এ সকল খামার মালিকদের শতকরা ৪৫.৮৪ ভাগই সেদিন ঋণগ্রস্ত ছিল; এদের শতকরা ৭৪.৪৫ ভাগ ২৫০ টাকার কম ঋণ গ্রহণ করেছিল, শতকরা ২১৩.৪০ ভাগের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০-১০০০ টাকার মধ্যে এবং বাকি শতকরা ২.০৬ জন ১০০০ টাকার বেশি ঋণ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ সে সময় এদের অনেকে তাদের গোটা জমির বিক্রয় মূল্যের সমান কিংবা তার চেয়েও বেশি পরিমাণ ঋণী ছিল। কেননা সে সময় ১ ভরি সোনার মূল্য ছিল মাত্র ১৫৬ টাকা।

*Dhaka University Institutional Repository*

২.৫০ থেকে ৫.০০ একর আয়তনের খামারগুলির অবস্থা ছিল আরো খারাপ। এদের মধ্যে ৫৩.৮৭ ভাগ ছিল ঋণ গ্রস্থ। এবং এদের শতকরা ৬৫.৯৮ জনের ঋনের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকার নিচে, শতকরা ৩১.৬১ জনের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে এবং বাকি শতকরা ২.৪১ জনের ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০০০ টাকার উপরে। ওপরোক্ত দুইটি শ্রেণীর মাথায় এই বিপুল পরিমাণ ঋণ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই বিপুল সংখ্যক কৃষকের পক্ষে জোতের জমি রক্ষা করা কত কঠিন ছিল। এরা ছোট খামারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ২৫০ টাকার ওপরে এদের এত বিপুল সংখ্যক খামার ঋণগ্রস্থ থাকার পিছনে একটিই সঙ্গত কারণ থাকা সম্ভব, আর তা হচ্ছে জমি বন্ধক রেখে কিংবা আরো অধিক শোষণমূলক শর্তে তারা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। কেননা ৫.০০-৭.৫০ একর আয়তনের মাঝারি কৃষকগণের মধ্যে যেমন ঋণগ্রস্থ ছিল শতকরা ৩৮.৫৪ জন, তেমনই এসব ঋণগ্রস্থ খামারের শতকরা ৭৯.৫৫ ভাগেরই ঋণের পরিমাণ ছিল ২১৫০ টাকর নিচে। অর্থাৎ এদের জমির পরিমাণ এমন ছিল যে, আয়-ব্যয় মোটামুটি সমান ছিল। সে কারণেই এদের ঋনের পরিমাণ যেমন একদিকে ছিল কম, তেমনই এদের ভিতর যারা ঋণী ছিল তাদের অধিকাংশেরই ঋণের পরিমাণ অতি সামান্য। ৭.৫০-২৫.০০ একর গ্রুপের খামারগুলিকে ধনী কৃষকের খামার হিসাবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু তাদেরও শতকরা ৪৯.৫২ ভাগ খামার ঋণগস্থ ছিল। এ গ্রুপের ঋণগ্রস্থ পরিবারগুলির শতকরা ৪৪.৮৭ ভাগের ঋণ ২৫০ টাকার নিচে ছিল। এছাড়া, শতকরা ৪২.৩১ ভাগের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে এবং কেবলমাত্র শতকরা ১২.৮২ ভাগের ঋণ ছিল ১০০০ টাকার অপেক্ষা বেশি। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় এদের মধ্যেও এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ঋণগ্রস্থ পরিবার বেশ ভাল রকমের সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। তবে এদের মালিকানায় যে বিপুল পরিমাণ জমি ছিল তা থেকে মনে হয় এদের অনেকেই আবার ঋণ প্রদানেও সমর্থ ছিল। ফলে ঋণের কারণে এ শ্রেণীর খামারগুলির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেওয়ার কথা নয়। তাছাড়া, এদের অনেকেই হয়ত তাদের ঋণের অর্থ দরিদ্রতর কৃষকদের জমি খন্ডটি নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার কাজে ব্যবহার করেছিল। ২৫.০০ একরের উর্ধে যাদের জমি তাদেরও শতকরা ৪৫.৭৭ ভাগ ঋণী ছিল, তবে তাদের সম্পর্কেও উপরোক্ত একই কথা প্রযোজ্য। কেননা এরাই ছিল সেদিন গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যসের শীর্ষে।

এই বিকাশমান জোতদার শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজে সে সময় কি ভূমিকা পালন করেছিল, তা ভিন্ন একটি উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে, তবে উক্ত জোতদারদের শোষণমূলক ভূমিকা এবং অন্যান্য কারণে ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি বিন্যাসে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় তা এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠবে, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঠিক পূর্ব মূহূর্তে, অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে গ্রামীণ সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের রূপটি।

*Dhaka University Institutional Repository*

## সারণি ৬.৫

**১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের খামার সংখ্যা ও খামার আয়তনের তুলনামূলক চিত্র।**

| খামারের আয়তন | খামার সংখ্যার বন্টন % | | খামার সংখ্যার বন্টন % | | চাষাধীন জমির আয়তনের বন্টন % | | চাষাধীন জমির আয়তনের বন্টন % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০.৫ একরের নিচে | ১৩.১০ | ১২.২৬ | | | ০.৯৫ | ১.১৫ | ১৬.২৬ | ২১.৩২ |
| ০.৫-১.০ | ১১.২৪ | ১২.৭০ | ৫১.৬৪ | ৫৬.৬৩ | ২.৩০ | ২.৯৯ | | |
| ১.০-২.৫০ | ২৭.৩০ | ৩১.৬৭ | | | ১৩.০১ | ১৭.১৮ | | |
| ২.৫০-৫.০০ | ২৬.৩০ | ২৬.৩২ | ৩৭.৬৯ | ৩৫.৫২ | ২৬.৩৮ | ২৯.৯৭ | ৪৫.৬৮ | ৩৯.৭৪ |
| ৫.০০-৭.৫০ | ১১.৩৯ | ৯.২০ | | | ১৯.৩০ | ৯.৭৭ | | |
| ৭.৫০-১২.৫০ | ৭৩.২০ | ৫.১৫ | | | ১৯.১৪ | ২৩.৫২ | | |
| ১২.৫০-২৫.০০ | ২.০৬ | ২.১৬ | ১০.৬৭ | ৭.৮৫ | ১০.১২ | ১০.৯৫ | ৩৮.০৬ | ৩৮.০৬ |
| ২৫.০০-৪০.০০ | ০.৬১ | ০.৩৬ | | | ২.৯১ | ৩.০০ | | |
| ৪০.০০-এর উপরে | ০.৮০ | ০.০৮ | | | ৫.৮৯ | ১.০০ | | |
| মোট | ৬১,৩৯,৪৮০ | ৬৮,৭০,০০০ | | | ১,৯১,৩৮১০৯ | ১,৯৬,৯৬০০০ | | |
| হার | ১০০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |

উৎস ঃ Paskistan Census of Agriculture, 1960

সারণি ৬.৫ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬০ সালে মোট ৬১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৮০টি খামার ছিল এবং ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজরে গিয়ে দাড়ায়। ১৯৬০ সালে শতকরা ৫১.৬৪ ভাগ ছিল ছোট খামার (২.৫০ একরের নিচে) শতকরা ৩৭.৬৯ ভাগ মাঝারি খামার (২.৫০-৭.৫০ একর) এবং শতকরা ১০.৬৭ ভাগ ছিল বড় খামার (৭.৫০ একরের উপরে)। ১৯৬৮ সালে ছোট খামারের হার শতকরা ৫৬.৬৩ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়, মাঝারি খামারের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে

*Dhaka University Institutional Repository*

শতকরা ৩৫.৫২ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বড় খামারের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৭.৮৫ ভাগে পর্যবসিত হয়। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ছোট খামারগুলির সংখ্যা যেমন এক দিকে বেড়ে গেছে, ঠিক তেমনই বড় খামারের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। শতকরা হারের দিক থেকে বিপুল সংখ্যায় হ্রাস পাওয়ার পেছনে সম্ভাব্য দুইটি কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার মালিকের পক্ষে পারিবারিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এরা কৃষিমজুরী বা অন্য কোন কিছুকে প্রদান বা পার্শ্বপেশা হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হয়। ১.০০-২.৫০ একর আয়তনের খামারগুলির মালিকদের অবস্থাও অনুরূপ। এদের হাতে মালিক কর্তৃক আবাদী খামারের শতকরা ৩১.৪১ ভাগ অর্থাৎ মালিক কর্তৃক আবাদী খামারের শতকরা ৬৪ ভাগ খামার মালিক আবাদ বহির্ভূত অন্য কোন পেশার সথে সম্পর্ক হতে বাধ্য হয়। ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে কৃষিবহির্ভূত অন্যান্য পেশার আয়তন যেমন ছিল ক্ষুদ্র, তেমনই উপার্জনের দিক থেকেও সেগুলি ছিল খুবই অনিশ্চিত। ফলে যে কোন সংকট মুহূর্তে তাদের পক্ষে গ্রামীণ ধনী ও জোতদার পরিবারের কাছে ধর্না দেওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকতো না। আর স্বাভাবিকভাবেই, এ সকল ক্ষুদ্র জোতের মালিকরা নিজের প্রয়োজনে ঋণ বা সাহায্যের জন্য যখন ধনী পরিবারগুলির কাছে যায়, তখন তাদের শর্ত অনুযায়ীই যে কোন ঋণ বা সাহায্য নিতে হয়। অন্যদিকে, যে সকল আবাদী খামারের আংশিক নিজ মালিকানাধীন এবং আংশিক বর্গা নেওয়া, সে সকল খামারের প্রধান অংশের (শতকরা ৪৯.৭৩ ভাগ) আয়তন ২.৫০-৭.৫০ একরের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প সংখ্যক (শতকরা ৭.২৮ ভাগ) খামারের আয়তন ১.০০ একরের নিচে। আসলে আবাদ করার সামর্থ্য যাদের কম তারা ইচ্ছা করলেও বর্গাজমি পায় না এবং তুলনামূলকভাবে সঙ্গতি সম্পন্নদের বর্গাজমি পেতে অসুবিধা হয় না। আর তাই বর্গাজমি যাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, তারাই বর্গাজমি পায় না। আসল কথা হচ্ছে, বর্গাজমি পাওয়া চাষীর প্রয়োজনের মাত্রার ওপর নির্ভর করে না, বর্গাদাতার লাভের মাত্রার ওপর বর্গাজমি পায় না। যার পক্ষে ভাল পলন দেওয়া সম্ভব হবে তার পক্ষেই জমি বর্গা পাওয়া সহজতর হবে। (অবশ্য গোষ্ঠী, দল, ক্ষমতা ইত্যাদি সামাজিক উপাদানও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।) ফলে ক্ষুদ্রতর খামার মালিকগণ দ্রুত শেষ সম্বলটুকু হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়।

কৃষি উৎপাদনের জন্য লাঙ্গল হচ্ছে একটি অন্যতম হাতিয়ার। ১৯৬০ সালের কৃষিশুমারি থেকে জানা যায়, সে সময় মোট খামারের এক-তৃতীয়াংশের মালিকানায় কোন লাঙ্গল ছিল না। ১.০০ একর কিংবা তার কম পরিমাণ জমির মালিক খামারগুলি মোট খামারের এক-চতুর্থাংশ, অথচ এদের মাত্র শতকরা ১৬.৭ ভাগের কাছে লাঙ্গল ছিল। অ্যদিকে যে সকল খামারের আয়তন ৫.০০ একর কিংবা তার উপরে তাদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগের কাছেই লাঙ্গল ছিল। উক্ত সারণি থেকে জানা যায়, ৪০.০০ একরের চেয়ে বেশি আয়তনের খামারগুলিল মালিকানায় খামার প্রতি গড় লাঙ্গল সংখ্যঅ ছিল ৫.৫টি; ২৫ থেকে ৪০ একর আয়তনের খামারগুলির মালিকানায় খামার-প্রতি গড় লাঙ্গলের সংখ্যা

*Dhaka University Institutional Repository*

ছিল ৩.৫টি। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, সে সময় কি নিদারুণভাবে বড় খামারগুলিল কাছে কৃষি উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ লাঙ্গল কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিপুল সংখ্যক লাঙ্গলহীন খামার মালিক লাঙ্গলের ব্যাপারে বড় খামারগুলির ওপর নির্ভরশীল ছিল। লাঙ্গলের ব্যাপারে ছোট খামার মালিকদের বড় খামারগুলির ওপর এ নির্ভরতা পরবর্তী চার বছরে একটুও কমেনি।

উপরে জমির বন্টন, ঋণ, বর্গাচাষ, গবাদিপশু ও লাঙ্গলের বন্টন সম্পর্কে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা থেকে দেখা যায় যে, ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে শুধু মাত্র ছোট খামারগুলির মাঝেই দারিদ্র্য বিদ্যমান ছিল না। সেখানে দারিদ্র্য ছিল বলা চলে সর্বব্যাপী। প্রান্তিক ও ছোট খামারগুলিতো বটেই, এমনকি মাঝারি খামার মালিকগণও নির্মম দারিদ্র্যের তাড়নায় জোতদারদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। সে সময় মোট খামারের এক তৃতীয়াংশ এবং ছোট ও প্রান্তিক খামারগুলির প্রধান অংশই বড় খামারগুলির ওপর অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এদের বিনিয়োগ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রতিবছরই এসব পরিবারে ঘাটতি পড়তো। আর সে ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে তাদের মালিকানাধীন জমির একাংশ হাতছাড়া করতে হত। ছোট ও নিম্ন মাঝারি খামারগুলির এই জমি হারানোর প্রক্রিয়া ভূমিহীন হয়ে পড়বার আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। সে সময় গ্রামীণ দারিদ্র্য যে কোন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল তা আয়ের বন্টনের দিকে লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সারণি ৬.৬

পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ এলাকায় আয়ে বন্টনের স্বরূপ

| মাসিক আয়ের শ্রেণী বিভাগ | পরিবারের শতকা হার | আয়ের শতকরা হার | গড় মাসিক আয় |
|---|---|---|---|
| ১০০ টাকার নিচে | ৪১.৩ | ১৭.২ | ৮৩.৭০ টাকা |
| ১০০-২৫০ টাকা | ৪৪.৪ | ৪২.৬ | ১৪৮.৭৬ টাকা |
| ২৫০-৫০০ টকা | ১১.৫ | ২৪.৮ | ২৭৪.৮৫ টাকা |
| ৫০০ টাকার উপরে | ২.৮ | ১৪.৭ | ৭৮১.০০ টাকা |
| মোট | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১৫২.৯০ |

উৎস ঃ Economic Affaris Division Government of Paksitan, 1961

*Dhaka University Institutional Repository*

উপরোক্ত সারণি থেকে বোঝার কোন উপায় নেই যে, ভূমি বিন্যাসের ভিত্তিতে কোন শ্রেণীর আয় কত, তবে আগের আলোচনা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, যে সকল খামার বেশি পরিমাণ জমি নিয়ন্ত্রণ করে, অধিকসংখ্যক গবাদিপশু ও লাঙ্গলসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের মালিক এবং যারা বিনিয়োগে ভাগ চাষের সুবাদে ফসল ভোগ করার সুযোগ পায় তারাই বেশী আয়- গ্রুপে পড়বে। অবশ্য মহাজনী ব্যবসাসহ পার্শ্ব আয়ের কারণও আয় বন্টনের চিত্রের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু ষাট দশকের গ্রামে বাড়তি অর্থের প্রধান উৎস ছিল যেহেতু জমি সেহেতু যে কোন আয়ই অখামারের আয়তন বৃদ্ধিতেই সে সময় কাজে লাগতো।

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৪১.৩ ভাগের মাসিক আয়ই ১০০ টাকার নিচে এবং তাদের গড় মাসিক আয় মাত্র ৮৩.৭০ টাকা। এসব পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা যদি ৫ ধরা হয়, তাহলে এ সব পরিবারের মাথাপিছু মাসিক আয় দাঁড়ায় মাত্র ১৬.৭৪ টাকা। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় ১০০-২৫০ টাকা আয় স্তরের পরিবার মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৪৪.৪ ভাগ এবং এদের গড় মাসিক আয় ১৪৮.৭৬ টাকা। অর্থাৎ এ স্তরে কারো কারো মাসিক আয় ২৫০ টাকার কাছাকাছি হলেও অধিকাংশ পরিবারের আয় ১০০ টাকার বেশি নয়। এ আয় স্তরের পারিবারিক আয়তন ৫.৫ ধরলে এদের মাসিক মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় মাত্র ২৭.০৫ টাকা অর্থাৎ এদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় মাত্র ৩২৫ টাকা। সে সময় গ্রামীণ সমাজে পরিবার পিছু গড় মাসিক আয় ছিল ১৫৩ টাকা: এবং মাসিক মাথাপিছু আয় ছিল ২৮ টাকা; যারা তখন দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে অবস্থান করছিল। তাহলে উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা খুবই স্পষ্ট যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজের শতকরা ৮৫.৭ ভাগ পরিবার এমন দরিদ্রতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল যে, তাদের পক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। যদিও শতকরা এই ৮৫.৭ ভাগ পরিবারই যে কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিল এমন নয়; এদের অনেকেই কৃষিমজুর বা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ছিল। তা সত্ত্বেও এ থেকে খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবার (প্রায় ৮৬%) তখন অর্থনৈতিকভাবে জন শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সারণি ৬.৬ থেকে আবার এক একটি বিপরীত চিত্রও ফুটে ওঠে। গ্রামের সবাই যে সে সময় দরিদ্র জীবনযাপন করতো তা নয়। গ্রামে সে সময় শতকরা ২.৮ ভাগ পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৫০০ টাকার উপরে এবং এ সকল পরিবারে মাসিক গড় আয় ছিল ৭৮১ টাকা। এরা গ্রামের মাত্র শতকরা ২.৮ ভাগ পরিবার হওয়া সত্ত্বেও এরা ছিল মোট আয়ের শতকরা ১৪.৭ ভাগের মালিক অর্থাৎ সংখ্যার তুলনায় তাদের আয়ের পরিমাণ ছিল সোয়া পাঁচ গুণ। এরাই ছিল সে সয় গ্রামের সবচেয়ে বড় উদ্বৃত্ত শ্রেণী, এদের পক্ষে সহজেই প্রান্তিক ও ছোট খামার মালিকদের ক্ষুদ্রায়তন ভূমি খন্ড নিজের মালিকানায় নিয়ে আসার সম্ভব ছিল। অবশ্য ২৫০-৫০০ টাকা আয় গ্রুপের অনেকের পক্ষেও সে সময় উক্ত নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সম্ভব ছিল, কেননা তদের মাসিক গড় আয় মোট গড় আয় অপেক্ষা শতকরা পায় ৮০ ভাগ বেশি ছিল। এরাই ছিল মোট গ্রামীণ পরিবারের

*Dhaka University Institutional Repository*

শতকরা ১১.৫ ভাগ, যারা মোট আয়ের শতকরা ২৪.৮ ভাগের মালিক ছিল। অর্থাৎ সংখ্যার তুলনায় এদের আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। উপরোক্ত এ দুইটি শ্রেণীই সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ পরিবারের ঘাটতির সুযোগ নিয়ে তাদের সম্পত্তির পরিমান বাড়িয়ে চলেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় Bureau of Economic Research গ্রুপের পক্ষ থেকে অধ্যাপক রেহমান সোবহান (১৯৬৮) দেখতে পান, ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবার ছিল ঘাটতি পরিবার। ঘাটতির মাত্রা সম্পর্কে সারণি ৬.৭ থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৬.৭

**খামারে উৎপাদিত ফসলের সথে সংসারের প্রয়োজনের সম্পর্কের মাত্রা**

| বছরের অবস্থা | উৎপাদিত ফসলে যাদের সংসারের প্রয়োজন মেটে (%) | উৎপাদিত ফসলের প্রয়োজন মেটে না (%) | মোট (%) |
|---|---|---|---|
| খারাপ বছর | ১৫.৬ | ৮৪.৪ | ১০০ |
| ভাল বছর | ৩৯.৭ | ৬০.৩ | ১০০ |
| গড় | ২৭.৬৫ | ৭২.৩৫ | ১০০০ |

সূত্র ঃ Rehman Sobhan, 1968

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, জমি থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে গড়ে শতকরা মাত্র ২৭.৬৫ ভাগ খামার মালিক তাদের সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। আর বাকি শতকরা ৭২.৩৫ ভাগ পরিবারেরই প্রতিবছর ঘাটতি পড়ে। ভাল বছর হলে অর্থাৎ ফসল ফললে শতকরা ৩৯.৭ ভাগ খামার মালিক কোন ক্রমে তাদের প্রয়োজন মেটায় তথা ঘাটতির হাত থেকে নিজদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এই বাল বছরেও বাকি শতকরা ৬০.৩ ভাগ খামার মালিক ঘাটকিতর হাত থেকে নিস্তার পায় না। আর যে বছর ফসল মার যায়, সেবার শতকরা মাত্র ১৫.৬ ভাগ খামার মালিক তাদের পরিবারকে ঘাটতির হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা করতে পারে, বাকি শতকরা ৮৪.৪ ভাগ পরিবারেরই ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ খারাপ বছর হোক আর ভাল বছর হোক, মোটামুটি শতকরা ১৫ ভাগ পরিবার কখনই ঘাটতির সম্মুখীন হয় না, বাকি ৮৫ ভাগের কেউ কেউ ভাল ফসল ফললে পারিবারিক ঘাটতিকে এড়াতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাদের সব সময়ই ঘাটতির চিন্তায় উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়। আর এদের এ অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে উক্ত ১৫ ভাগ ধনী পরিবার। এই ছিল যখন

*Dhaka University Institutional Repository*

গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা, তখন সরকারের পক্ষ থেকে তো এ সকল সমস্যার সমাধান করার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করাই হয়নি, বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক, প্রশাসিনক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী বৈষম্যকে তীব্রতের করে তোলা হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে, সরকারের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একশ্রেণীর বিত্তবান ব্যক্তির কর্মক্ষমতাকে কেন্দীভূত করা হয়েছে। যে সময় প্রয়োজন ছিল সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা, খোদ কৃষকের কাছে জমি প্রদান করা অথবা অন্ততঃ খোদ কৃষকদের কাছ থেকে জমি হাতছাড়া যাতে না হতে পারে তা ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদনের উপকরণ যাতে খোদ কৃষকজদের হাতে পৌছাতে পারে তা ব্যবস্থা করা। কিন্তু এসব কিছু না করে সরকার মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে খুশি রাখার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই মৌলিক গণতন্ত্রী ও তোদের সহযোগীদের মিলে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ক্ষমতার এমন একটি শক্ত ভিত্তি যাকে ভেদ করে কৃষক সমাজের নিজের দাবির কথা বলা এবং সে জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল।

### ৬.২.২ শিল্প ও বাণিজ্য ঃ

এবারে পাকিস্তান আমলে তার পূর্বাঞ্চলে শিল্প-উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে তার পূর্বাংশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক কোন শিল্পই গড়ে ওঠেনি। শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, সমগ্র পাকিস্তানেই তখন শিল্প বিকাশের মাত্রা ছিল খুবই নিম্ন পর্যায়ে। বৃটিশ ভারতের যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয় সে অংশ মোট বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৪ ভাগের (৯২১টির মধ্যে ৩৪টি); মোট শিল্প শ্রমিকের শতকরা ২ ভাগের (১১,৩৭,১৫০ জনের মধ্যে ২৬,৪০০ জন) এবং মোট বৈদ্যুতিক শক্তির শবতকরা মাত্র ৫.৩ ভাগের অংশীদারিত্ব লাভ করে। এছাড়া, অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীভূত ছিল দেশের পশ্চিমাংশে। মোট ১৭টি কাপড়ের কলের মধ্যে মাত্র ৬টি পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়ে। ৫টি সিমেন্ট কারখানার মধ্যে মাত্র ১টি পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে এবং একমাত্র তেল শোধনাগার ছিল পাকিস্তানে, তাও পশ্চিমাংশের ভাগে পড়ে। সে সময় আধুনিক শিল্প বলতে যাকে বোঝাতো এই ছিল তার ক্ষতিয়ান। পূর্ব পাকিস্তান পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ পাট উৎপাদনকারী জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন পাটকল ১৯৫১ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশ বিভাগের সময় যে শিল্প-কারখানাগুলি পূর্ব পাকিস্তানে ছিল তার প্রধান অংশটি ছিল সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন কারখানা। এ সকল কারখানাতে ১৯৪৭-৪৮ অর্ধ বছরে মোট ৪৯ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৭ পাউন্ড সুতা উৎপাদিত হয় এবং ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৭২ গজ লংক্লথ, মার্কিন ও শার্টিং জাতীয় কাপড় উৎপাদিত হয়। শাড়ি ও ধুতি মিলে প্রায় ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৩৬ গজ কাপড় ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে উৎপাদিত হয় বটে, কিন্তু এর মধ্যে কি পরিমাণ মিলে তৈরি তার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে এর অধিকাংশটুকুই যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে উৎপাদিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য, কেননা ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজারটি হস্তচালিত তাঁত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য পরবর্তী বছরে তা হ্রাস পেয়ে ১ লক্ষ ৮৩ হাজারে এসে উপনীত হয়। দেশ বিভাগের সময় চিনি শিল্পও অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ১৪৯ মন। উল্লিখিত অর্থবছরে একমাত্র সিমেন্ট কারখানায় সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২ হাজার ৮০৭ টন। ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে ম্যাচ উৎপাদনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৬ হাজার ৭৫০ গ্রোস।

সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তা এ অঞ্চলের ভৌগোলিক ও অভ্যন্তরীণ বাজার বিকাশের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়নি। এর সৃষ্টি হয়েছিল কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর মারফত সহজে কাঁচামাল রপ্তানির একমাত্র লক্ষ্যে। উপরন্তু, ১৪১৮ মাইল দীর্ঘ যে রেললাইন ছিল তার অধিকাংশ কারিগরি বিবেচনায় ছিল অকেজো। ১০২৮ মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তার মধ্যে মাত্র ২৪০ মাইল রাস্তা ছিল সারা বছর চলাচলের জন্য উপযোগী। সে সময় ২০ হাজার ১৭২ মাইল দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা ছিল। এসব সত্ত্বেও দেশ বিভাগের ফলে যে বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে, তাহল উক্ত স্বল্প আয়তনের রাস্তার অধিকাংকেই দ্রুত মালামাল সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কেননা এসকল রাস্তার গতিমুখ ছিল কলিকাতাকেন্দ্রিক। এ প্রচন্ড প্রভাব পড়ে পাটের বাজারে। কেননা পাট বাজারজাতকরণের চ্যানেল পরিবর্তিত হওয়ায় কারণে পাট বাজারের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে পড়ে। ফলে খুব দ্রুত পাটের দাম হ্রাস পেতে থাকে। এর সবচেয়ে বড় শিকার হয় উৎপাদক কৃষকগণ, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরাও এতে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্যদিকে ঠিক এই একই সময়ে পাটের রপ্তানি মূল্য বাড়তে থাকে। পঞ্চাশের কোরিয়ান যুদ্ধের সময় তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এর পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে পাট রপ্তানিকারকগণ।

দেশ বিভাগের পরবর্তী কয়েক বছর ধরে শিল্প পণ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে এ সকল পণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ফলে আমদানি বাণিজ্য ও অধিকমূনাফার অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়। আমদানি এবং রপ্তানির উভয় ক্ষেত্রেই এখানকার বৈদেশিক বাণিজ্য এমন লাভজনক ক্ষেত্র হিসাবে দেখা দেয় যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ সকল ব্যবসায়ী বিপুল অর্থের মালিকের পরিণত হয়। আর এ বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম যোগসূত্রকারী হিসাবে আবির্ভূত হয় প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাত কাঁচা পাট। ব্যবসায়িক স্বার্থেই এ সকল রপ্তানিকারকগণ এক বা একাধিক 'জুট প্রেস' ইন্ডাস্ট্রি গঠনে মনিবেশ করে। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিমালিকানায় বৃহৎ পাটকলসমূহের গোড়াপত্তন ঘটে। আদমজী, বাওয়ানী, ইস্পাহানীসহ বিভিন্ন যে সকল পাটকল গড়ে ওঠে তদের মালিকগণ ছিল প্রথম পর্যায়ের উক্তবৈদেশিক বাণিজ্যের অংশগ্রহণকারী। এসব সত্ত্বেও ১৯৫১ সালে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি পাটকল ছাড়া আর তেমন কোন শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। ১৯৫১ সালের এক হিসাব থেকে দেখা যায়, সে সময় ছোট বড় মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য কারখানার সংখ্যা ছিল মোট ১৫২টি এবং এগুলির অধিকাংশই ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরকে ঘিরে স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়াও আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩২৭টি

*Dhaka University Institutional Repository*

ফ্যাক্টরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই ছিল কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প। এগুলির মধ্যে মাত্র ৬২টি ফ্যাক্টরী ছিল শিল্পোদ্যোগ। ১৯৫১ সালের অর্থনৈতিক জরিপ থেকেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত জরিপ থেকে দেখা যায়, শতকরা মাত্র ২২ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৯টি। জরিপে উল্লেখ করার মত মোট ৩৩৩টি কারখানার কথা বলা হয় এবং তাতে নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৬৬,৬৪৮ জন। রেলওয়ের কয়েকটি ওয়ার্কশপ আর সদ্য প্রতিষ্ঠিত তিনটি পাটকল ভিন্ন অবশিষ্ট অধিকাংশ কারখানাই ছিল খুব ক্ষুদ্র। হাতে গোনা কয়েকটি কারখানাতেই একশ বা ততধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল।

সারণি ঃ ৬.৮

**সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্পকারখনার সংখ্যা**

| শিল্প কারখানার ধরণ | ১৯৫৯-৬০ | ১৯৬০-৬১ | ১৯৬১-৬২ | ১৯৬২-৬৩ | ১৯৬৩-৬৪ | ১৯৬৪-৬৫ | ১৯৬৫-৬৬ | ১৯৬৬-৬৭ | ১৯৬৭-৬৮ | ১৯৬৮-৬৯ | ১৯৬৯-৭০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প | - | - | - | ৩৯৬ | ৩৮৫ | ৪২৩ | ৪০৮ | ৪১৬ | ৪৩০ | ৪০৬ | ৪০৮ |
| পাট ও বস্ত্র শিল্প | - | - | - | ১০০৯ | ১০৯৩ | ১২০১ | ১১৭০ | ১২০৩ | ১২৩২ | ৯৯৮ | ৯৯৮ |
| প্রকাশনা শিল্প | - | - | - | ১০৮ | ১১৪ | ১৩৯ | ১৪০ | ১৪৮ | ১৪৭ | ১৪৩ | ১৪১ |
| চামড়া শিল্প | - | - | - | ৯৯ | ১১৬ | ১৬৭ | ১৪৮ | ১৫১ | ১৪৯ | ১৪৯ | ১৪৯ |
| রসায়নজাত শিল্প | - | - | - | ৩৪৫ | ৩৮১ | ৬০৭ | ৫৭২ | ৬১৮ | ১৪২ | ৫৭৬ | ৫৭২ |
| মৌল ধাতু নির্ভর শিল্প | - | - | - | ৩২৯ | ২৯১ | ৩১০ | ২৮৭ | ২৯৮ | ২৯৭ | ২৯৩ | ২৯২ |
| অন্যান্য শিল্প | - | - | - | ৩৯৮ | ৪৬৩ | ৬৯১ | ৬৩৭ | ৬৫৫ | ৬৮৫ | ৫৬৫ | ৫৬৪ |
| মোট | ১৫২৪ | ১৫৯৬ | ২৪৪৫ | ২৬৪৮ | ২৮৪৩ | ৩৫৩৮ | ৩৩৩২ | ৩৪৮৯ | ৩৫৮২ | ৩১৩০ | ৩১২৪ |

উৎস ঃ Statistical Digest of Bangladesh, 1972

* অন্যান্য শিল্প বলতে পানীয়, তামাক, আসবাবপত্র, রাবার, কয়লা, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

সারণি ৬.৮ থেকে দেখা যায়, পাকিস্তান আমলে অন্ততঃ সংখ্যা দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প বিকাশের যৌবনকাল ছিল ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৭-৬৮ এর চার বছর। ১৯৬৭-৬৮ সলে মোট

*Dhaka University Institutional Repository*

৩৫৮২টি শিল্পের মধ্যে শতকরা ১২টি শিল্প ছিল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, শতকরা ৩৪ ভাগ শিল্প ছিল পাট ও বস্ত্র শিল্প, প্রকাশনা শিল্পের সংখ্যা ছিল মোট শিল্প সংখ্যার শতকরা ৪ ভাগ, রসায়নজাত শিল্প ছিল মোট শিল্প সংখ্যা শতকরা ১৮ ভাগ, মৌল ধাতুনির্ভর শিল্প ছিল মোট শিল্প সংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ এবং পানীয়, তামাক, আসবাবপত্র, রাবার, কয়লা, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য শিল্প ছিল মোট শিল্প সংখ্যার শতকরা ১৯ ভাগ। ৬.৯ নং সারণির এর চিত্র থেকে এটা খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাট ও বস্ত্র শিল্পই সেদিন শিল্প সম্পদের প্রধান অংশ ছিল। মাত্র ৬টি সূতি ও বস্ত্র নিয়ে যে পূর্ব পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে, ২০ বছরে তার সংখ্যা ২০০ গুণ ছাড়িয়ে যায়। অথচ ১৯৬৮ সালের জুন মাসে নতুন ৪৪৪টি প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও শিল্প বিকাশের সেই ধারা অব্যাহত থাকতে পারেনি।

**সারণি ঃ ৬.৯**

**পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত ভারি শিল্প সমূহে বাট দশকে উৎপাদনের পরিমাণ**

| পণ্যের নাম | মাপের একক | ১৯৬০-৬১ | ১৯৬১-৬২ | ১৯৬২-৬৩ | ১৯৬৩-৬৪ | ১৯৬৪-৬৫ | ১৯৪৫-৬৬ | ১৯৬৬-৬৭ | ১৯৬৭-৬৮ | ১৯৬৮-৬৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১. পাট জাত পণ্য | (হাজার টন) | ২৫৭ | ২৬৮ | ২৯৮ | ৩৩১ | ২৬৯ | ৪০৯ | ৪০৪ | ৫১৩ | ৫১৮ |
| ২. তুলা I) সূতা | (বিলিয়ন পাউন্ড) | ৪৮ | ৫৪ | ৫৪ | ৬৪ | ৬৪ | ৭৩ | ৭৪ | ৭৭ | ৯৬ |
| II) বস্ত্র | (বিলিয়ন পাউন্ড) | ৬৯ | ৪৭ | ৫৫ | ৪৮ | ৪৯ | ৪০ | ৫৫ | ৫২ | ৬১ |
| ৩. চিনি | (হাজার টন) | ৫৬ | ৬৮ | ৭৫ | ৮৮ | ৭৭ | ৮৫ | ১১৩ | ১১০ | ৫৭ |
| ৪. কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট | (হাজার টন) | ৬০ | ৬৭ | ৬৪ | ৬২ | ৭৯ | ৭৬ | ৭১ | ৭৮ | ৮৩ |
| ৫. ম্যাচ | (হাজার গ্রোস) | ৯,১৭১ | ৯,৬২২ | ১০,০১৩ | ১১,৫৪৮ | ১০,৯৬৯ | ১২,১৮১ | ১০,৩৭২ | ১১,০৬৪ | ১৩,১৯১ |
| ৬. সিমেন্ট | (হাজার টন) | ৬৮ | ৭০ | ৯৪ | ৬৫ | ৫৬ | ৪৩ | ৭৫ | ৮২ | ৬৩ |
| ৭. সিগারেট | (মিলিয়ন) | ১,৪৫০ | ২,৭৬০ | ৩,৭২৯ | ৪,৮৮৫ | ৫,৫৩৭ | ৯,৫৭৬ | ১৩,১৩৪ | ১৪,৯০৫ | ১৭,৮১১ |
| ৮. সার (ইউরিয়া) | (হাজার টন) | - | ১৭ | ৭২ | ১০৬ | ৭২ | ৯১ | ৯৩ | ১১২ | ৮৭ |

উৎস: Planning Department Government of Pakistan, 1970

*Dhaka University Institutional Repository*

শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকেই শিল্পকারখানার সংখ্যা বেড়েছে তা নয়, উৎপাদনের পরিমাণও এ সময়কালে বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। সারণি ৬.৯ থেকে দেখা যায়, যে পাটজাত শিল্প পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে একবারে শূণ্য থেকে তার বিকাশ শুরু করে ছিল, মাত্র ১০ বছরের মাথায় শুধুমাত্র ভারী শিল্পসমূহেই তার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টনে। এখানেই এর অগ্রগতি থেমে থাকেনি, পরবর্তী বছরগুলিতেও পাট শিল্প দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে এবং ১৯৬৮-৬৯ অর্থবছরের এ শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টনে। প্রায় শূন্যের কোটা থেকে শুরু করে ভারী শিল্পসমূহে ১৯৬০-৬১ অর্থবছরে সূতা উৎপাদন হয় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড, কাপড় উৎপাদিত হয় ৬ কোটি ৯০ লক্ষ গজ, চিনি উৎপাদন হয় ৫৬ হাজার টন, কাগজ (নিউজপ্রিন্টসহ) উৎপাদন হয় ৬০ হাজার টন, ম্যাচ উৎপাদন হয় ৯১ লক্ষ ৭১ হাজার গ্রোস, সিমেন্ট উৎপাদন হয় ৮৬ হাজার টন এবং সিগারেট উৎপাদন হয় ১৪৫ কোটিটি। পাটজাত পণ্যের মতই সিগারেট উৎপাদনও ১৯৬০-৬১ অর্থবছরের পর দ্রুত হারে বাড়তে থাকে, ১৯৬৮-৬৯ অর্থবছরে সিগারেট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮১ কোটি ১০ লক্ষটিতে।

**সারণি ঃ ৬.১০**

**১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব বাংলার শিল্পপণ্য উৎপাদনের খতিয়ান**

(১৯৫৯ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসাবে ধরে)

| পণ্যের নাম | ১৯৪৯/৫০-১৯৫৩/৫৪ | ১৯৫৪/৫৫-১৯৫৮/৫৯ | ১৯৫৯/৬০-১৯৬৩/৬৪ | ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৮/৬৯ | ১৯৪৯/৫০-১৯৮৮/৬৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| ভারী শিল্প (কোটি টাকা) | ৫৪.৩ | ১৪১.২৯ | ৩০৬.১০ | ৩৯০.৮০ | ৮৯৩.২৪ |
| শতকরা হার | ২৬.৬৭ | ৪১.৫১ | ৫৪.২৯ | ৫১.৮৯ | ৪৮.১৪ |
| বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার | ২৬.৯৬ | ৩২.০৪ | ২৩.৪৪ | ৫.৪৭ | ৩০.৯৯ |
| ক্ষুদ্র শিল্প (কোটি টাকা) | ১৪৯.৩০ | ১৯১.০১ | ২৫৮.৪০ | ৩৬৩.০০ | ৯৬২.২৬ |
| শতকরা হার | ৭৩.৩৩ | ৫৭.৪৮ | ৪৫.৭১ | ৪৮.১৯ | ৫১.৮৬ |
| বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার | ৪.৩৭ | ৫.৫৯ | ৭.০৬ | ৮.১৩ | ৭.১৭ |
| শিল্প পণ্যের মোট মূল্য (কোটি টাকা) | ১০৩.৬০ | ৩৩২.৩০ | ৫৬৫.৩০ | ৭৫৪.৩৩ | ১৮৫৫.৫০ |
| শতকরা হার | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ |
| বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার | ৮.৯৭ | ১২.৬৪ | ১৪.০২ | ৬.০০ | ১৩.৫২ |

উৎস ঃ Alamgri & Berlage, 1974

*Dhaka University Institutional Repository*

১৯৬০-৬১ অর্থবছরের পরবর্তী কয়েক বছরে শিল্প উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বেড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব শিল্পের বৃদ্ধির হার সমান নয়। এমন কি, কোন কোন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ পরবর্তীকালে হ্রাস পেয়েছ যেন, মিলে তৈরি সূতার উৎপাদন ১৯৬০-৬১ অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ডে গিয়ে উপনীত হয়েছে কিন্তু মিলে তৈরি কাপড়ের উৎপাদন ঐ সময়ে মোটেই বাড়েনি, বরং দ্রুত হ্রাস পেয়ে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে ৪ কোটি গজে গিয়ে দাড়িয়েছে, পরবর্তী ৩ বছরে আবার কিছুটা পেয়ে ৬ কোটি ১০ লক্ষ গজে গিয়ে উপনীত হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অস্থিরতা শুধু বস্ত্র শিল্পেই হয়নি; চিনি, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার এমনকি কাগজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারী শিল্পসমূহে উৎপাদন ক্ষেত্রে এই অস্থিরতার বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। তবে এখানে আলোচনার জন্য প্রাথমিক কারণটি হচ্ছেঃ হালকা ও ভারী শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সারণি ৬.১০ থেকে দেখা যায় ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৮-৬৯ এই ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তান সামগ্রিকভাবে শিল্পের বার্ষিক অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ১৩.৫২ ভাগ। কিন্তু এ হার কখনও বেড়েছে আবার কখনও কমেছে।

পূর্বেকার আলোচনাতে দেখা গেছে, ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ৪৪টি বৃহৎ শিল্পে বিপুল পরিমাণ মূলধন লগ্নি করে। সে সময় সরকারী প্রত্যক্ষ সহায়তায় বড় শিল্পসমূহের বিকাশ ধারাবাহিকতাভাবে উচ্চতর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সেরকম পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য না করে বৃহৎ শিল্পখাতকে বিপুল পরিমাণে সহায়তা করে। কিন্তু তাতেও দেখা যায়, ততদিনে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এতটা পরিমাণে শক্তি অর্জন করেছে যে, সরকারের সহায়তা ছাড়াই সে সর্বাধিক হারে মুনাফা অর্জন করে চলেছে। ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে শিল্প-কারখানার ওপর পরিচালিত শুমার থেকে দেখা যায় যে, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারী নিবন্ধনকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৩০৪০টি, এর মধ্যে যে কারখানাগুলিতে কর্মরত ন্যূনতম সংখ্যক শ্রমিক ছিল একম ১৫৮০টি কারখানার উৎপাদন, বিক্রয়, স্থায়ী সম্পদ, শিল্প ব্যয় (Industrial cost) মজুরী, মুনাফা ইত্যাদির ওপর গৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র কারখানাগুলির মুনাফার হারই সর্বাধিক। এ সমস্ত তথ্যকে বিন্যাস করে সারণি ৫.১২ তৈরি করা হয়েছে। এ সারণিতে বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

*Dhaka University Institutional Repository*

## সারণি ঃ ৬.১১

## ১৯৬৯-৭০ সালে প্রধান প্রধান শিল্পে স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও মুনাফার হার

(মূল্য হাজার টাকায়)

| শিল্পের ধরণ | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (%) | মোট স্থায়ী (%) | বছর শেষে মজুদের পরিমাণ (%) | মোট মূলধন (৩+৪) (%) | মোট শিল্প ব্যয় (Industrial Cost) (%) | মোট কর্মচারী বেতন (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ক্ষুদ্র শিল্প * | ৯৭৩ (৬১.৫৮) | ৩২৯৬৮৮ (১৪.৮৩) | ২১৩৬২৮ (২১.৬৭) | ৫৪৩৩১৬ (১৬.৯৩) | ৩৩০২৩৮ (১৭.১৩) | ২২০৭২ (১৯.৩৭) |
| মাঝারি শিল্প ** | ৪৯০ (৩১.০১) | ৬৫২৯৭০ (২৯.৩৬) | ৫২৯০৫৩৮ (২৯.৪৮) | ৯৪৩৫০৮ (২৯.৩০) | ৭১৬৪৬৮ (৩৭.১৭) | ৪৪০১০ (৩৮.৬২) |
| বড় শিল্প*** | ১১৭ (৭.৪১) | ১২৪১০৫১ (৫৫.৮১) | ৪৮১৫৬৯ (৪৮.৮৫) | ১৭২২৬২১ (৫৩.৬৭) | ৮৮০৭৫৫ (৪৫.৭০) | ৪৭৮৬১ (৪২.০১) |
| মোট **** | ১৫৮০ (১০০) | ২২২৩৭১০ (১০০) | ৯৮৫৭৩৫ (১০০) | ৩২০৯৪৪৫ (১০০) | ১৯২৭৪৬১ (১০০) | ১১৩৯৪৩ (১০০) |

(সারণি ১১ ক্রমশ) ঃ-

| শিল্পের ধরণ | মোট মজুরীর পিছনে ব্যয় (%) | মোট মজুরীও বেতন (%) | মোট উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় (%) | মোট মুনাফা (%) (১০-৬-৯) | মুনাফার হার (মোট মূলধনের নিরিখে) ক্ষয় ৫% সহ) | মুনাফার হার (বিক্রয় মূল্যের নিরিখে) (ক্ষয় ৫% সহ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ক্ষুদ্র শিল্প * | ৪৪৪৫৬ (১৩.৫২) | ৬৬৫২৮ (১৫.০৩) | ৭১০১০০ (১৯.৩৬) | ৩১৩৩৩৪ (২৪.১৪) | ৫৭.৬৭ (৫২.৭৯) | ৪৪.১৩ (৪১.৬৮) |
| মাঝারি শিল্প ** | ৪৮৭০৬ (১৪.৮২) | ৯২৭১৬ (২০.৯৪) | ১০৫৯৭১৬ (২৮.৮৬) | ২৫০৫৩২ (১৯.৩০) | ২৬.৫৫ (২২.১১) | ২৩.৬৪ (২০.৪০) |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বড় শিল্প*** | ২৩৫৬০১<br>(৭১.৬৬) | ২৮৩৪৬২<br>(৬৪.০৩) | ১৮৯৮৫২৮<br>(৫১.৭৫) | ৭৩৪৩১১<br>(৫৬.৫৬) | ৪২.৬৩<br>(৩৭.৪২) | ৩৮.৬৮<br>(৩৫.২৪) |
| মোট **** | ৩২৮৭৬৩<br>(১০০) | ৪৪২৭০৬<br>(১০০) | ৩৬৬৭৩৪৪<br>(১০০) | ১২৯৮১৭৭<br>(১০০) | ৪০.৪৫<br>(৩৫.৫১) | ৩৫.৩৯<br>(৩২.৩০) |

* ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে রয়েছে ঃ পানীয়, পাট ও তুলাজাত তাঁত ছাড়া অন্যান্য তাঁত, কাগজ জাত পণ্য, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, চামড়া, রাখার, পেট্রোলিয়াম পদার্শ, অধাতুজ খনিজ পদার্থ, ধাতব পদার্থ, অধাতুজ খনিজ পদার্থ, ধাতব পদার্থ খুচরা যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরিবহন যন্ত্রাংশ ফুটওয়ার পণ্য, কাঠজাত পণ্য ও ফার্ণিচার।

** মাঝারি শিল্পের মধ্যে রয়েছে ঃ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প- রাসায়নিক সামগ্রী ও বিবিধ।

*** বড় শিল্পের মধ্যে রয়েছে ঃ তামাক, পাট ও তুলাজাত তাঁত, কাগজ ও মৌল ধাতু শিল্প।

**** মোট ৩০৪০টি শিল্প কারখানার মধ্যে এখানে শুধু সেই কারখনাগুলিকে নেওয়া হয়েছে যাদের সর্বনিম্ন শ্রমিক সংখ্যা ১০ জন।

উৎস : Government of the People's Republic of Bangladesh, 1974

সারণি ৬.১১ থেকে দেখা যায়, ৩০৪০টি নিবন্ধনকৃত কারখানার মধ্যে ক্ষুদ্রতর (যাদের শ্রমিক সংখ্যা ১০ জনের চেয়েও কম) ১৪৬০টি কারখানাকে বাদ দিলেও যে ১৫৮০টি কারখানা ছিল বৃহৎ। সংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ কারখানাগুলি ক্ষুদ্র হলেও, তাদের অধীনেই ছিল সে সময়ের শিল্প খাতের মোট স্থায়ী সম্পদের শতকরা ৫৫.৮১ ভাগ। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্পের অধীনে স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ১৪.৮৩ ভাগ। বছর শেষে মজুদের পরিমাণকে যদি চলতি মূলধন হিসাবে বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় চলতি মূলধন তুলনামূলকভাবে ভারী শিল্পের চেয়ে হালকা শিল্পের অধীনেই বেশি। ছোট, মাঝারি ও বড় কারখানাগুলির অধীনস্থ চলতি মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ২১.৬৭ ভাগ, ২৯.৪৮ ভাগ এবং ৪৮.৮৫ ভাগ।

উক্ত তিন ধরনের কারখানাসমূহের মধ্যে আকারের দিক থেকে কি বিপুল রকমের পার্থক্য ছিল তা স্থায়ী সম্পদের গড়ের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির গড় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৩৭ টাকা, মাঝারি শিল্পগুলির গড় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৯২ টাকা এবং বৃহৎ শিল্পগুলির গড় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৬০ লক্ষ ৭

*Dhaka University Institutional Repository*

হাজার ২৮২ টাকা। অর্থাৎ ১টি বৃহৎ শিল্প একাই প্রায় ৮টি মাঝারি শিল্পের এবং প্রায় ৩২টি ক্ষুদ্র শিল্পের স্থায়ী সম্পদের সমপরিমাণ মালিক ছিল। চলতি এবং স্থায়ী উভয় মূলধনকে একত্রিত করলেও দেখা যায়, শতকরা ৫৩.৬৭ ভাগ মূলধন বৃহৎ কারখানাগুলোর মালিকানায়, শতকরা ২৯.৩০ ভাগ মূলধন মাঝারি কারখানাগুলোর অধীন এবং ক্ষুদ্র শিল্পসমূহেরন অধীনে রয়েছে মাত্র শতকরা ১৬.৯৩ ভাগ মূলধন। তিন ধরনের শিল্পের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মাঝারি শিল্পের শিল্প ব্যয় (Industrial cost) সবচেয়ে বেশি। স্থায়ী সম্পদের শতকরা ২৯.৩৬ ভাগের মালিক হলেও মাঝারি শিল্পের শিল্প ব্যয় শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ। ক্ষুদ্র ও বড় শিল্পের ব্যয় যথাক্রমে শতকরা ১৭.১৩ ভাগ ও ৪৫.৭০ ভাগ। উল্লেখ্য যে, শিল্প ব্যয়ের মধ্যে কাঁচা মাল, পরিবহন, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদিকে নেওয়া হলেও স্থায়ী মূলধনের ক্ষয় (depriciation) কে ধরা হয়নি। ধরা হলে স্বাভাবিকভাবেই বড় শিল্পসমূহে ব্যয় অনেক বেড়ে যেত। তবে স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়কে স্থায়ী মূলধন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং নতুন যন্ত্রপাতির মূল্যকে যোগ করা হয়েছে। এভাবে স্থায়ী মূলধন থেকে ক্ষয় (deprecation) কে বাদ দেয়ার ফলে এ মুনাফার প্রকৃত হার অপেক্ষা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ এর উক্ত সেন্সাসকে যারা ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁদের এই স্পষ্ট ত্রুটির কারণে শিল্প ক্ষেত্রে মুনাফার হারে বেশ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং এর ফলে বড় শিল্প অর্থাৎ যেগুলির স্থায়ী মুলধনের পরিমাণ বেশি সেগুলির মুনাফার হারে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া পড়েছে। Depreciation এর অংশটি শিল্প-ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু তা না হয়ে স্থায়ী মূলধন থেকে বাদ দেওয়ার কারণে যেমন একদিকে উৎপাদন-ব্যয় কম দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে বিনিয়োগের পুঁজির পরিমাণ কম দেখা যাচ্ছে ফলে মুনাফার পরিমাণও বেশি দেখা যাচ্ছে। আর তাই যার স্থায়ী পুঁজি যত বেশি তার ক্ষেত্রে তত বেশি হারে প্রকৃত মুনাফা অপেক্ষা বেশি মুনাফা দেখা যাবে। তথ্যের এরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও সারণি ৬.১১ থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে মুনাফার হার সর্বাধিক। মোট পুঁজি বিনিয়োগের বিবেচনায় ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে মুনাফার হার বার্ষিক শতকরা ৫৭.৬৭ ভাগ। মাঝারি শিল্পে শতকরা ২৬.৫৫ ভাগ এবং বৃহৎ শিল্পে শতকরা ৪০.৪৫ ভাগ উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের নিরিখে বিচার করলে মুনাফার হার কিছুটা কমে আসে, তবে এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পে মুনাফার হার সবচেয়ে বেশী হ্রাস পায়। সারণী থেকে দেখা যায় উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের নিরিখে বিবেচনা করলে ক্ষুদ্র শিল্পে মুনাফার হার শতকরা ৪৪.১৩ ভাগ, মাঝারি শিল্পে শতকরা ২৩.৬৪ ভাগ এবং বড় শিল্পে শতকরা ৩৫.৩৯ ভাগ।

*Dhaka University Institutional Repository*

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে বিকশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে সে সমাজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বিভিন্ন খাতের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সারণি ৬.১২ তে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সারণি থেকে দেখা যায়, ১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৮/৬৯ অর্থবছর পর্যন্ত এ ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হয়েছিল স্থায়ী মূল্যে মোট ৩০ হাজার ৩১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে শতকরা ৫৯.২৪ ভাগ হয়েছিল কৃষি থেকে এবং শতকরা মাত্র ৬.১২ ভাগ উৎপাদিত হয়েছিল শিল্প সেক্টর থেকে; বাকি শতকরা ৩৪.৬৪ ভাগই উৎপাদিত হয়েছিল অন্যান্য খাতে। ফলে সমাজের শ্রেণী বিন্যাস করার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পের বাইরের উক্ত সব খাতসমূহকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সারণি ৬.১২ তে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি খাতের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশী, তবে সময়ের সাথে সাথে তার অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৫৩/৫৪ এর চার বছরে কৃষি খাতের অবদান ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৬৫.১৩ ভাগ। উৎপাদনের মোট পরিমাণের কোন অবনতি না ঘটলেও পরবর্তীকালে উৎপাদনের আনুপাতিক হার হ্রাস পেতে পেতে ১৯৬৪/৬৫-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে কৃষির অবদান মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৫৪.৭৭ ভাগে এসে দাঁড়ায়। কৃষির পর প্রত্যক্ষ উৎপাদনের দ্বিতীয় খাতটি হল শিল্প। শিল্প খাতটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছোট খাত হিসাবেই অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ভূমিকা রেখে চলেছিল। কিন্তু মোট উৎপাদন কিংবা আনুপাতিক হার উভয় দিক থেকেই তার অবস্থান ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকে। শুরুতে তথা ১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৫৩/৫৪ কালপর্বে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শিল্পের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ৩.৩১ ভাগ। পরবর্তীকালে তা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত শতকরা ৭.৭৫ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ শুরুর চার বছরের ২০৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা থেকে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৪/৬৫-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে গিয়ে ৭৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকাতে গিয়ে উপনীত হয়। ইতিপূর্বে শিল্প সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে শুধুমাত্র ১০ জনের অতিরিক্ত শ্রমিক যে সকল কারখানায় কাজ করে এবং কোন না কোন ধরনের কৃত্রিম শক্তি (জ্বালানি বা বিদ্যুৎ) ব্যবহার করা হয় সেগুলির মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ঃ ৬.১২

## ১৯৪৯/৫০-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের খাতওয়ারী খতিয়ান

(১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসাবে ধরে কোটি টাকার হিসাব)

| | ১৯৪৯-৫০-১৯৫৩/৫৪ | ১৯৫৪/৫৫-১৯৫৮/৫৯ | ১৯৫৯/৬০-১৯৬৩/৬৪ | ১৯৬৪/৬৫-১৯৬৮/৬৯ | ১৯৪৯/৫০-১৯৬৮/৬৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. কৃষি | ৪০০১.৬ (৬৫.১৩) | ৪০১৫.২ (৬১.৫০) | ৪৬১০.২ (৫৮.৩০) | ৫৩২৯.৬ (৫৪.৭৭) | ১৯৭৫৬.৬ (৫৯.২৪) |
| ২. পরিবহন ও ২যোগাযোগ | ২০৩.৬ (৩.৩১) | ৩৩২.৩ (৫.০৯) | ৫৬৫.৩ (৭.১৫) | ৭৫৪৩. (৭.৭৫) | ১০৫৫.৫ (৬.১২) |
| ৩. পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৩৭.১ (১১.৬৫) | ৪০৪.৯ (১১.২৩) | ৫০৭.২ (১১.২৯) | ৬.৩০ (১১.০০) | ১৮৬২.৫ (১১.২৬) |
| ৪. ব্যবসা | ৭১৫.৭ (৫.৪৯) | ৭৩৩.৪ (৬.১০) | ৮৯২.৫ (৬.৪১) | ১০৭০.৪ (৬.৩০) | ৩৪১২.০ (৬.১৪) |
| ৫. নির্মাণ | ৪৬.১ (০.৭৫) | ৭৭.০০ (১.১৮) | ১৯৭.৭ (২.৫০) | ৫১০.০ (৫.১৪) | ৮৩০.৮ (২.৭৪) |
| ৬. গণপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা | ১৭২.১ (২.৮০) | ১৮১.৩ (২.৭৮) | ২১৮.৪ (২.৭৬) | ৩৩৮.৭ (৩.৪৮) | ৯১০.৫ (৩.০০) |
| ৭. অন্যান্য* | ৬৬৭.৬ (১০.৮৭) | ৭৮৪.৬ (১২.১২) | ৯১৬.৩ (১১.৫৯) | ১১১৪৩.০ (১১.৪৫) | ৩৪৮২.৫ (১১.৪৯) |
| ৮. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন | ৬১৪৩.৮ (১০০) | ৬৫২৮.৭ (১০০) | ৭৯০৭.৬ (১০০) | ৯৭৩০.৩ (১০০) | ৩০৩১০.৪ (১০০) |

উৎস : Mohiuddin Alamgri & Lodewijk JJ B. Berlage, 1974

*Dhaka University Institutional Repository*

শিল্পের উক্ত বৃহৎ খাতটি ছাড়াও সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প কাঠামোতে একটি ক্ষুদ্র ও গতানুগতিক খাত ছিল। পুরো পাকিস্তান আমল ধরেই পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অবদানের দিক থেকে ব্যবসার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ব্যবসা প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু উৎপাদন করে না; তবে এর পুরো প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে ছোট-বড় অসংখ্যা বিনিয়োগকারী এবং বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য কর্মচারী। আয়তনের দিক থেকে ১৯৪৯/৫০ অর্থবছরের পর থেকে ব্যসার ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটলেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরো ২০ বছরেই এর আনুপাতিক অবদান ছিল মোটামুটি সমান। শুরুতে এর অবদান ছিল শতকরা ১১ ভাগের কিছু বেশি এবং শেষে তথা ১৯৬৪/৬৫-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে তা শতকরা ১১.০০ ভাগে নেমে আসে।

উক্ত ২০ বছরে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতটি অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অবদানের ক্ষেত্রে শতকরা ৫.৪৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.৩০ ভাগে গিয়ে উপনীত হয় এবং এ সময়ে আয়তনের দিক থেকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়। এই সেক্টরটির সাথে যেমন সরকার ও কারখানা মালিকদের সম্পর্ক আছে, তেমনই সম্পর্ক আছে একটি বড় মালিক গোষ্ঠীর যারা বাস, ট্রাক, লঞ্চ ইত্যাদি পরিবহন ও যোগাযাগ সামগ্রীক মালিক। এছাড়াও এ খাতে একটি বৃহৎ পরিবহন শ্রমিকশ্রেণী জড়িত থাকে।

নির্মাণ খাত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অবদান গ্রহণকারী খাতগুলির মধ্যে সে সময় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ছিল। উক্ত ২০ বছরে এর অবদান ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা মাত্র ২.৭৪ ভাগ। তবে শুরুতে এটা যত ছোট খাত ছিল, পরবর্তীকালে তা আর অত ছোট থাকে নি। ১৯৪৯/৫০-১৯৫৩/৫৪ এর পাঁচ বছরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ০.৭৫ ভাগ। কিন্তু এ খাতটি খুব দ্রুত বৃদ্ধি বিকাশের মধ্য দিয়ে যেমন একটি ঠিকাদার শ্রেণীর শক্তিশালী অবস্থান নির্দেশিত হয়, ঠিক তেমনই একটি বিকাশমান প্রযুক্তিবিদ, সাধারণ কর্মচারী ও নির্মাণ শ্রমিকের আবির্ভাবের ধারণাও মিলে।

গণপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতটি বরাবর প্রায় একই পরিমাণ অবদান রাখে এবং ১৯৬৪/৬৫-১৯৬৪/৬৯ কালপর্বে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এর আনুপাতিক অবদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩.৪৮ ভাগে উপনীত হয়। এ খাতের সাথে যারা যুক্ত তারা সবাই সাংবিধানিক দিক দিয় রাষ্ট্রের অংশ। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ এবং প্রশাসনের উচ্চ কর্মকর্তাগণ তো পাকিস্তান রাষ্ট্রের অত্যন্ত শক্তিশালী অংশ ছিল। তবে গণপ্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যকার একটি গরিষ্ঠ অংশ ছিল দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। জীবন জীবিকার সংকট এদেরকেও রেহাই দিত না। ফলে আর্থ-সামাজি-রাজনৈতিক পরিবর্তনকামী শক্তি হিসাবে এদেরকেও বিবেচনা করতে হয়।

এছাড়া, খনিজ, উপযোগ, ব্যাংক-বীমা ও বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক খাত ছিল, যেগুলির যুগপৎ অবদান ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ১১.৪৯ ভাগ। প্রায় সব সময়ই এর আনুপাতিক

Dhaka University Institutional Repository

অবদান মোটামুটি সমান ছিল। এ খাতেও যারা জড়িত ছিল তাদের মধ্যেও ছিল একটি স্তরবিন্যাস- যাদের মধ্যেকার অধিকাংশই ছিল স্বল্প সুযোগসুবিধার অধিকারী।

উপরোক্ত বিভিন্ন আর্থিক খাতে নিয়োজিত সকল শ্রমশক্তিকে যদি মোটা দাগে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। এ শ্রেণী বিন্যাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে সারণি ৬.১৩ প্রস্তুত করা হয়েছে। সারণি ৬.১৩ তে ১৯৬১ ও ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট শ্রমশক্তির বিভিন্ন অংশ যে নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত ছিল, সেসবের ধরনের ভিত্তিতেই এদের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ এই আট বছরে শ্রমশক্তির আনুপাতিক অবস্থানে আর যে সকল ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম দু'টি হচ্ছে-পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদ এবং দোকান কর্মচারী। লক্ষণীয় যে, পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদের মধ্যে ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী ইত্যাদি উচ্চ আয়গোষ্ঠীর শ্রমশক্তির পাশাপাশি নিম্ন আয়গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত নিম্নস্তরের শিক্ষক, টেকনিশিয়ান, মুহুরি ইত্যাদি পেশাজীবীরাও পড়ে। তবে এ চিত্র থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উক্ত কালপর্বে শ্রমশক্তির গড় বৃদ্ধির তুলনায় উক্ত জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি হয়েছিল অনেক বেশি দ্রুত। উক্ত ৮ বছরে এদের সংখ্যা শতকরা ৮৯ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ৭৪ হজার লোকের এক বিশাল শহরে জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। দোকান কর্মচারী খাতেও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শ্রমমক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে। এদের সংখ্যা ১৯৬১ সাল থেকে পরবর্তী ৮ বছরে শতকরা ৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯ লক্ষ ৮৬ হাজারের এক বিশাল জনগোষ্ঠীতে দাঁড়িয়েছে। এ উভয় জনগোষ্ঠীই অকৃষি শ্রমের সাথে যুক্ত, তথা এদের প্রায় সবাই মানসিক শ্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদরা তো বটেই; দোকান কর্মচারীগণও সমাজের অপেক্ষাকৃত সচেতন অংশ। দোকান কর্মচারীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ গ্রামে অবস্থান করলেও এর প্রধান অংশই শহরের নাগরিক। প্রাইমারী ও হাইস্কুল শিক্ষকদের বড় একটি অংশ গ্রামে অবস্থান করলেও তাদের কিছু অংশ শহরে বাস করে। আর এ সকল সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করে বলেই শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ দ্রুত বাড়তে থাকে। এছাড়াও, কেরাণী, সেবা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিলে ১৯৬৯ সালে আরো ৬ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমশক্তি শহরে অবস্থান করছিল।

১৯৬৯ সালে শতকরা ৯০.৮৫ ভাগ শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল গ্রামিন এলাকায়। অর্থাৎ গ্রামীণ শ্রমশক্তির মোট সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২৩ লক্ষ ২১ হাজার ৮৪৫ জন। এদের মধ্যে ২ কোটি ১ লক্ষ ১১ হাজার জন কৃষিজীবী। গ্রামীণ তাঁত শিল্পে নিয়োজিত ছিল ৫ লক্ষ ১১ হাজার ২১৩ জন। বাকি ১৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৩২ জন ছিল শিক্ষকতা, ব্যবসা, চা শিল্পসহ নানাবিধ কুটির শিল্প ও অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত। শহরে কর্মরত মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৫৫ জন। এদেরকে বিন্যস্ত করলে নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায় ঃ

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.১৩

## শহুরে শ্রমশক্তির বিন্যাস

| শ্রেণী/পেশা | সংখ্যা | শহকরা হার |
|---|---|---|
| কারখানা শ্রমিক | ৩,১৩,৩৭৭ | ১৩.১৪ |
| পরিবহন ও ক্ষুদ্র করখানা শ্রমিক | ১,৮৯,১৩৮ | ৮.৪১ |
| ১. মোট শ্রমিক | ৫,০২,৫১৫ | ২২.৩৫ |
| দোকান কর্মচারী (নিবন্ধনকৃত দোকান) | ৭০,৯৭৮ | ৩.১৫ |
| ব্যবসায়ী কর্মচারী (নিবন্ধনকৃত দোকান) | ৩৯,৩১৮ | ৬.৩৫ |
| শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী | ৩০,২৬৬ | ১.৩৫ |
| সরকারী, আধাসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কেরাণী | ১,৭৮,২২৯ | ৭.৯৩ |
| ২. মোট কর্মচারী ও কেরাণী | ৩,১৮,৭৮৭ | ১৩.১৮ |
| ৩. আইনজীবী ও ডাক্তার (রেজিষ্টার্ড) | ১৪,২৩০ | ৬.৬৩ |
| ৪. প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য পেশাজীবী (শিক্ষক বাদে) | ১,৯১,৮৬৪ | ৮.৫৩ |
| ৫. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা | ৪১,০০০ | ১.৮৩ |
| ৬. প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা কর্মে নিয়োজিত | ৩,৪৫,১৫১ | ১৫.৩৫ |
| ৭. শিক্ষাক, স্বাধীন বৃত্তিজীবী, ব্যবসায়ী, অনিবন্ধনকৃত দোকান কর্মচারী ও অন্যান্য | ৮,৩৪,৬০৮ | ৩৮.১২ |
| মোট শহরে শ্রমশক্তি (১+২+৩+৪+৫+৬+৭) | ২২,৪৮,১৫৫ | ১০০.০০ |

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬৯ সালে মোট শ্রমিক ছিল শহরে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ২২.৩৫ ভাগ। সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কেরাণী ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪.১৮ ভাগ। এছাড়া, আইনজীবী ও রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা ছিল মোট শহরে

*Dhaka University Institutional Repository*

শ্রমশক্তির মাত্র ০.৬৩ ভাগ। প্রযুক্তিবিদ তথা প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান এবং অনিবন্ধনকৃত ডাক্তার, নার্স, সাংবাদিক, গবেষক, চিত্রশিল্পী, সাংস্কৃতিককর্মী ইত্যাদি মিলে এদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮.৫৩ ভাগ। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল শতকরা ১.৮৩ ভাগ। প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, ব্যাংক, বীমা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সেবা কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল মোট শহরে শ্রমশক্তির ১৫ ভাগ। এছাড়া, শহরের স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট দোকান কর্মচারী ও দোকানদার, হকার, ব্যবসায়ী, স্বাধীন বৃত্তিজীবীসহ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল শহরে শ্রমশক্তির শতকরা ৩৮.১২ ভাগ।

গ্রাম ও শহরে কর্মরত উক্ত শ্রমশক্তির বাইরেও সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে এমন একটি বিশাল জনগোষ্ঠী সেদিন অবস্থান করছিল যারা শ্রমশক্তি হিসাবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু সচেতনতার দিক দিয়ে জনসাধারণের গড় মান অপেক্ষা তারা অনেক অগ্রসর। এরা হচ্ছে ছাত্র সমাজ। সে সময় তথা ১৯৬৯ সালে মোট বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী ছিল পায় ১৩ হাজার, কলেজ ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২ লক্ষ ৩৩ হাজার এবং হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ১৩ লক্ষ ২৮ হাজার। প্রায় ১৬ লক্ষ উক্ত জনসমষ্টি সেদিন সারা পূর্ব পাকিস্তান, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। এদেরকে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর অন্তর্গত না করা গেলেও প্রতিষ্ঠাকেন্দ্রিক ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তি হিসাবে এরা ছিল সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা দেশের মোট শ্রমিক অপেক্ষা সংখ্যায় তিন গুণের অধিক। প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সংগঠিত জনসংখ্যার মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশি।

## ৬.৩ সমাজ কাঠামো

### ৬.৩.১ গ্রামীণ জোতদার

এ শ্রেণীটি ষাট দশকের পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমচেয়ে শক্তিশালি শ্রেণী ছিল এরা আইয়ুবের ভূমি সংস্কার নীতির সুযোগে বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তিকে সংরক্ষণ করে এনং নামে -বেনামে আরো নতুন নতুন ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বর্গা ব্যবস্থার সুযোগে বিনা বিনিয়োগে ও বিনা পরিশ্রমে এরা ভূসম্পত্তি থেকে ফসলের অর্ধেক পায়, অন্যদিকে, সরকারী পর্যায়ে ব্যাংক ঋণের অনুপস্থিতির কারণে এরা গ্রামীণ মহাজনী ব্যবসায়ে প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ পায়। মহাজনী ব্যবসা আইন সিদ্ধ না থাকার কারণে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের জমি দলিল করে এবং সাদা কাগজে দস্তখত করিয়ে টাকা ধার দেয়। সম্ভবতঃ ঋণগ্রস্থ কৃষকরা উচ্চ মাত্রার চক্রবৃদ্ধি সুদ ও আসল টাকা যথা সময়ে পরিশোধ করতে না পারার কারণেই এরা তাঁদের জমির ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এরা গ্রামীণ প্রান্তিক কৃষকসহ বিভিন্ন শোষিত শ্রেণীর কাছে অচিরেই ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। অপরদিকে, তারা বিপুল পরিমাণ জমি বর্গা প্রদানের সুযোগে বেশ কিছু সংখ্যক বর্গা কৃষকের ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য কায়েম করে। উক্ত নির্ভরশীল বর্গা কৃষকগণ তাদের চাষের অধিন বর্গা জমিকে

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা করতেই জোতদারের আধিপত্য মেনে নেয়। ফলে গ্রামীণ সমাজে জোতদার শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই বর্গা কৃষকগণ অনেক সময় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গ্রামীণ জোতদারদের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রাক্তণ জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামে তাদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। গ্রামীণ পর্যায়ে ইংরেজ সৃষ্ট জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘটিত সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। এ সংগ্রাম বিশ্বের দশকের শেষে এসে একটি পরিণতি লাভ করে। তার পর থেকে সামাজিকভাবে গ্রামীণ জোতদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এরা গ্রামীণ কৃষকদের নেতৃত্ব দখল করে। এ সকল কারণে গ্রামীণ জোতদার শ্রেণী ষাট দশকে এসে গ্রামীণ সমাজের ওপর তহাদের নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের গোষ্ঠীগত প্রাধান্যকে সহজেই ব্যবহার করতে পারে। গ্রামীণ সমাজের সব গোষ্ঠী প্রধান রা মাতবর জোতদার না হলেও অধিকাংশ জোতদার ই ছিল মাতবর। ফলে এ মাতবরী ক্ষমতাকেও জোতদাররা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে কাজে লাগায়।

### ৬.৩.২ ধনী কৃষক

প্রয়োজনের তুলনায় এদের জমির পরিমাণ ছিল বেশি। এরা নিজ খামারের অধীনে অধিকাংশ জমি চাষাবাদ করতো, কিছুটা বর্গা দিত। এদের চাষাবাদের কাচে নিয়োজিত শ্রমশক্তির প্রধান অংশ আসতো ভাড়া করা শ্রম থেকে। এরা একদিকে যেমন শ্রম শোষণ করতো; অন্যদিকে আকাংখানুযায়ী অর্থকরী ফসলের দাম পেতো না। ফলে আইয়ুব সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি তাদের ক্ষোভের কিছু বস্তুগত কারণ ছিল। এরা আবার স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ, গোষ্ঠী প্রাধান্য, মাতবরী ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করারও সুযোগ পেতো। অবশ্য শ্রেণীগত দিক থেকে এরা ক্ষেতমজুরদের শোষক ও ক্ষমতা প্রয়োগের অংশীদার হলেও জোতদার শ্রেণীর আধিপত্য ও বড় পুঁজির বাজারে ওপর আধিপত্য তাদের বিকাশকে বাঁধাগ্রস্থ করে। তবে শ্রেণীগতভাবে এরা পাকিস্তান রাষ্ট্র ও আইয়ুব সরকারের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করতো বা করা সম্ভব ছিল তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর আলোচনার পরই পরিস্কার হয়ে উঠবে। কেননা ষাট দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্র যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করে, তা কোন শ্রেণীর বিকাশের জন্য কতটা অনুকুল বা প্রতিকূল অবস্থায় সৃষ্টি করে তার ওপরই নির্ভর করে কোন শ্রেণী কি ধরনের ভূমিকা পালনের উপযোগী।

### ৬.৩.৩ মাঝারি কৃষক

শ্রমশক্তির তুলনায় এদের ভারসাম্যমূলক পরিমাণ জমি ছিল। খরা, বন্যা ও ঘুর্ণিঝড় কবলিত এ ভূখন্ডে এ ধরনের পরিবারের ভাল বা খারাপ থাকাটা নির্ভর করতো ভাগ্যের ওপর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলে ভালই চলতো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে যৎসামান্য সঞ্চয়ের ওপর হাত পড়তো। আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অর্থকারী ফসলের দাম না থাকার কারণে কখনই এরা বিদ্যমান সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি সন্তুষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারতো না। তার ওপর জোতদারদের নেতৃত্বে আইয়ুব সরকারের পক্ষে স্থানীয় ক্ষমতা বলয় সৃষ্টি হওয়ার কারণে এরা প্রায় সব সময়ই বিব্রত বোধ করত। আইয়ুব সরকারের আমলে উক্ত স্থানীয় ক্ষমতা বলয় ছাড়াও সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠার অন্য কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল কিনা তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তবে সংখ্যাগত দিক থেকে এরা এত বিরাট একটি শ্রেণী ছিল যে, এদের যে কোন দরনের ভূমিকা আন্দোলনের গতিমুখকে পরিবর্তন করে দিতে পারতো।

### ৬.৩.৪ ছোট ও প্রান্তীক কৃষক

জমির পরিমাণের স্বল্পতার কারণে এরা কখনও সচ্ছল হতে পারে না। জোতদার রা ধনী কৃষকের জমি বর্গা নিয়ে এরা পরিবারের বাড়তি শ্রমশক্তির কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এরা একদিকে যেমন বর্গা শোষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ, অন্যদিকে আকাংখানুযায়ী অর্থকরী ফসলের দাম না পাওয়ার কারণে সরকারের প্রতি থাকত অসন্তুষ্ট। ষাট দশকে এ শ্রেণীটি খুব দ্রুত তাদের ক্ষুদ্র জমিজমা হারাতে থাকে। ঘাটতি বাজেটের কারণে ভাল বছর এরা কোনক্রমে এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বছর এদের অস্তিত্ব রক্ষার কোন উপায় থাকত না। তারা তাদের শেষ সম্বল জমি ও হালের গরু বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে এ শ্রেণীটি যেমন একদিকে জমি বন্ধক রেখে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হত, তেমনই সুদসহ ঋণের টাকা ফেরৎ দেয়াও এদের পক্ষে সম্ভব হত না। তাই স্থানীয় জোতদারদের ক্ষমতা বলয়ের মূল চাপটা এদের ওপরই পড়ে। সংখ্যায় এরা একটি বিশাল শ্রেণী। এদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে এদেরকে সংগঠিত করার যে কোন উদ্যোগ সফল হওয়ার জন্য ষাট দশকের শেষ বছরগুলি ছিল অত্যন্ত অনুকূল। তবে এই বিশাল শ্রেণীটির ভূমিকা কি রকম হওয়া সম্ভব ছিল তা এদের সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্যোগ ও কর্মসূচীর ওপর নির্ভর করছে।

### ৬.৩.৫ ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুর

এরাও ছিল ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের মত একটি বিশাল শ্রেণী। উৎপাদনের উপায় বলতে দুই একটি হালের বলদ ও কাস্তে নিড়ানি ছাড়া কিছুই এদের ছিল না। এদের একটি অংশ জোতদারদের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করতো, তবে এদের উৎপাদনের উপকরণ খুব কম থাকার কারণে বর্গা জমি সেভাবে পেতো না। তবুও নিজের জমিগুলি হারিয়ে যারা একমাত্র বর্গা জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, ভূমিহীনদের সেই ক্ষুদ্র অংশটি গ্রামীণ সমাজের সবচেয় অসহায় শ্রেণী। এদের বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ করার কোন শক্তি ছিল না, বলা চলে জোতদারদের করুণার ওপর এরা কোন রকম বেঁচে থাকতো। ভূমিহীনদের উপর অন্য অংশ ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছিল। ক্ষেতমজুরদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে শহরে রিকশা চালক কিংবা মুটে- মজুরের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। দিনমজুরী কাজের খোঁজে এরা নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রাম, অন্য থানা কিংবা অন্য জেলাতে যেতে শুরু করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এদের জীবন-জীবিকা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এরা প্রান্তিক চাষী ও বর্গা ভূমিহীনদের চেয়ে একটি সচেতন জনগোষ্ঠী ছিল। এলাকার ক্ষেত্রে জোতদার কিংবা ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এদের কিছু দিধাদ্বন্দ্বের কারণ থাকলেও এলাকার বাইরে গিয়ে এ ধরনের কোন আন্দোলনে অংশ নিতে এদের কোন অসুবিধা ছিল না। অবশ্য এরা কতটা আন্দোলনে অংশ নিতে পেরেছিল তা রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচী ও পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করেছিল। তবে ষাট দশকের শেষে এসে এই ক্ষেতমজুর শ্রেণীটি যে বস্তু গতভাবে একটি লড়াকু শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য বাস্তব অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন, সচেতন শ্রেণী মেরুকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য বাস্ড়ব অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন, সচেতন শ্রেণী মেরুকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পদক্ষেপই মূল ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচী ও পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ই এদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

### ৬.৩.৬ গ্রামীন কুটির শিল্প

এরা সংখ্যায় একটি বিরাট জনগোষ্ঠী, শহরে শ্রমিকের চেয়ে এরা ছিল কয়েকগুণ। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুইটি অংশ ছিল। একটি অংশ খুবই গতানুগতিক উৎপাদন রীতিকে তখনও আকড়ে ছিল এবং আধুনিক বাজার ব্যবস্থার প্রসারের কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের অনেক বিকল্প ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিদ্বন্দী হিসাবে তখনও কোন কিছু আত্মপ্রকাশ করেনি; যেমন কুমার বা মৃচীদের উৎপাদিত মাটির তৈজসপত্র বা বাঁশ, বেত দিয়ে তৈরি জিনিষকে আধুনিক শিল্প প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করেনি। তবে এ সকল দ্রব্যের অসংখ্য বিকল্প তৈরি হওয়ার কারণে ষাট দশকে কুটির শিল্প ধ্বংশের মুখোমুখি এসে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু জাত পাতের কারণে এই জনগোষ্ঠী নিয়তির লিখন হিসবে তা মেনে নিয়েছে, কোন প্রতিবাদের শক্তি তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি। অন্যদিকে, কুটির শিল্পের অপর অংশ, বিশেষতঃ তাঁতশিল্প, আধুনিক তাঁতের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আধুনিক তাঁতশিল্প এ গতানুগতির তাঁতকে ধ্বংস করতে সাধারণ বাঙ্গালী পোশাককে হিন্দুয়ানী পোষাক বলে অপ্রচারণা করতেও ছাড়েনি। হস্তচালিত এই তাঁত শিল্প দুই শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েও বাঙ্গালীর বিশেষ ধরনের বস্ত্র ব্যবহার রীতির কারণে মোটা শাড়ি, গামছা আর লুঙ্গিকে কেন্দ্র করে কোন রকম টিকে ছিল। দেশ বিভাগের পর মিলে তৈরি শাড়ি, ধুতি ইত্যাদির সরবরাহে সংকট দেখা দিলে হস্তচালিত তাঁত শিল্পটি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বৃহৎ তাঁত শিল্প গড়ে ওঠার কারণে এই ক্ষুদ্র কুটির শিল্পটি আবার সংকটের সম্মুখীন হয়। এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশ নিজে মালিক হলেও উপযুক্ত দামে সূতা পাওয়া এবং তা বিক্রি করার ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে এরা ষাট দশকের শেষ দিকে এসে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর সে কারণেই কুটির শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ষাট

*Dhaka University Institutional Repository*

দশকের প্রথম থেকে আনুপাতিকভাবে প্রতিবছর হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫১ সালের শুমারী থেকে দেখা যায়, ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৮৯ টি তাঁতী পরিবারকে ঘিরে চার লক্ষাধিক শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল কিন্তু তার ১৬ নবছর পর তথা ১৯৬৬ সালের হস্তশিল্প শুমারে দেখা যায় এদের সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি। অর্থাৎ আধুনিক তাঁত শিল্পের বিকাশ এদের অস্তিত্বকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কোন ভূমিকা আদৌ ছিল কিনা তা শুধু রাজনৈতিক দল বা তাঁতী সমিতির কর্মসূচীর প্রতি আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে।

### ৬.৩.৭ বড় শিল্পপতি

শুটিকয়েক ব্যক্তির নেতৃত্বে তৎকলীন পূর্ব পাকিস্তানে বিশাল পুঁজির অধিকারী একটি শ্রেণীর জন্ম হয়। এদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে চিহ্নিত করার জন্য তাদের বিকাশ ধারাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তবে ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটি পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পের স্থায়ী মূলধনের প্রধান অংশের মালিক এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রধান অংশের জোগানও এদের থেকেই এসেছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে মাত্র এক যুগে এদের এই বিপুল অগ্রগতির কারণ ও প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করতে পারলেই এদের চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

### ৬.৩.৮ মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি

আধুনিক প্রযুক্তির ধারক ও সীমিত মূলধনের অধিকারী এ শ্রেণীটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি বর্ধিষ্ণু শ্রেণী হিসবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দেশ বিভাগের পর মাত্র শতকরা চার ভাগ প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে শ্রেণীটির যাত্রা শুরু হয়। ষাট দশকের শেষে এসে এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৯ ভাগে উপনীত হয়। সরকার কিংবা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কোনরকম সাহায্য ছাড়াই মূলতঃ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করেই এদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এদের স্থায়ী মূলধন ছিল এক লক্ষ টাকার থেকে শুরু করে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই শ্রেণী সৃষ্টির সামাজিক উৎস সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এদের ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এ শ্রেণী সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ক আলোচনাও এদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

এই মাঝারি ও ক্ষুদ্রে শিল্পপতিরা একদিকে যেমন বৃহৎ পুঁজির প্রসারে শংকিত, ঠিক তেমনি এরা বিকাশউন্মুখ। কিন্তু সরকার থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ার কারণে তারা স্বাভাবিকভাবেই সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ। অন্যদিকেএদের কাজকর্ম যেমন স্বল্প পুঁজি নিয়ে, ঠিক তেমনি এদের অধীনস্থ শ্রমিক সংখ্যাও কম। ফলে আদিম রীতিতে শোষণ করতে তাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে শ্রমিক স্বার্থের প্রশ্নে তাদের ভূমিকা বড় শিল্পপতিদের চেয়ে মোটেই ভাল নয়। বরং বড় শিল্পে সব

Dhaka University Institutional Repository

কিছুরই যেমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ থাকে, ছোট শিল্পে তা থাকে না- ফলে সেখানে শোষণের মাত্রা থাকে অত্যধিক।

### ৬.৩.৯ শহুরে মধ্যবিত্ত

শহরে মধ্যবিত্তরা প্রধানত ঃ কয়েকটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। এ উপ-শ্রেণীগুলি হচ্ছে ঃ ১. শিক্ষিত পেশাজীবী যেমন, ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, গবেষক, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ইত্যাদি। ২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাধারণ কর্মচারী ও কেরাণী। ৩. ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা ক্ষুদে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার। ৪. অসংখ্যা ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ছোট দোকানদার, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি।

মধ্যবত্তিদের এ সব উপ-বিভাগই মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তবে এদের একটি অংশ রাষ্ট্রের সহায়তায় বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের ভবিষ্যৎ কে নিরাপদ করে তুলতে সক্ষম। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ইত্যাদি সরাসরি কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে না, অভাব অনটনের প্রাবল্যও এদের মধ্যে কম। কিন্তু এরা বেশ সচেতন ও অগ্রসর নাগরিক বিধায় তারা দেমের ভালমন্দ বিচার করতে পারে। আর তুলনামূলকভাবে স্বাধীন অবস্থানের কারলে এরা যে কোন ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করতে পারে। অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিম্ন কর্মচারী, যেমন শিল্প-কারখানার কেরাণী ও সুপারভাইজর, সরকারী-বেসরকারী অফিসের তৃতীয় ও চতুর্থ শেণীর কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে কোন উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়। তাদের যে বৈধ আয়ের পরিমাণ তা দিয়ে ভদ্রজনোচিত জীবন-জীবিকা নির্বাহকরা কঠিন। এরা শহরে সমাজের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী। অবস্থানের দিক থেকে এরা মধ্যবিত্ত হলেও, এমনকি কলকারখানায় এরা শ্রমিকদের ওপর মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চতম শ্রম শোষণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখা সত্ত্বেও এরা মধ্যবিত্তের জীবনাচরণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন শর্তই পুরণ করতে পারে না। এদেরই মত স্কুল শিক্ষক, ক্ষুদে দোকানদার, দোকান কর্মচারী, আপন শ্রম-নির্ভর ফ্যাক্টরী মালিক ইত্যাদি নামমাত্র মধ্যবিত্ত হয়ে নিম্নবিত্তের জীবন যাপনে বাধ্য হয়।

মধ্যবিত্তের একটি অংশ, যারা সরকারী কর্মকর্তা, সরকারের সহযোগিতার সুযোগে পারমিট লাইসেন্সধারী বড় ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার, এদের জীবিকার পথই এমন যে, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। ফলে এরা বিদ্যমান রাষ্ট্রের ও সরকারের অনুগত থাকতে অভ্যস্ত। সংখ্যার দিক থেকে এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। যাইহোক, ষাট দশকের শেষ দিকে মধ্যবিত্তের সংখ্যাই ছিল শহরে জনগোষ্ঠীর তিন-চতুর্থাংশ। এদের মধ্যে গুটিকয়েক সরকার ও রাষ্ট্রের অনুগত আমলা ও সহযোগিতাকারী মুৎসুদ্দী পর্যায়ভূক্ত বিত্তবান ব্যক্তি ছাড়া বাকি সমগ্র জনগোষ্ঠী ছিল সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার আওতার বাইরে। শিক্ষিত পেশাজীবীগণ মোটামুটি উন্নত জীবন

*Dhaka University Institutional Repository*

যাপন করার কারণে চেতনাগতভাবে তাদের প্রভাবমুক্ত থাকার কথা। অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী মধ্যবর্ত্তি হয়েও অবিরত অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত ছিল।

**৬.৩.১০ শহুরে শ্রমিক শ্রেণী:**

শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান অংশ কারখানা শ্রমিক। এরা সদ্য বিকাশমান একটি জনগোষ্ঠী। প্রত্যক্ষভাবে এরা শ্রমের সাথে যুক্ত ছিল সন্দেহ নেই, তবে এরা যে শ্রেণীতে অবস্থান করতো সেই শ্রেণীর নিজস্ব সমস্যার কতটুকু তাদেরকে সরকার-বিরোধী হতে সহায়তা করেছিল যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সেই সাথে অন্যান্য শ্রেণীর ওপর অন্যায় অত্যাচার কিংবা সহযোগিতার প্রতিক্রিয়া কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর পড়েছিল তাও যাচাই করা প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন ইস্যুতে ষাটের দশকে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি করেছিল, সেদিকে লক্ষ্য করলেই শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছা ও প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। তবে কারখানা শ্রমিকগণ যে পরিবর্তনকামী শ্রেণী হিসবে একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ শ্রেণী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করে উপরোক্ত যে সব শ্রেণী চিহ্নিত করা হল, এগুলি শুধু মাত্র তাদের অীস্তত্বেরই স্বীকৃতি। বিভিন্ন শ্রেণীর স্ব স্ব স্বার্থ ও চিন্তা-ভাবানার স্বরূপ সম্পর্কে কোন নির্দেশনাই এখানে দেয়া যায়নি এবং সে চেষ্টাও এখানে করা হয়নি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর আয়তন বা সংখ্যাগত যে ধারণা পাওয়া যায় তা মনে রেখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপকে যখন বিচার করা হবে, কিংবা তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও ভূমিকাকে বিচার করা হবে তখন বিভিন্ন শ্রেণী বা সামাজিক শক্তি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে তা পরিস্কার হয়ে উঠবে। সে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বিভিন্ন সামাজিক বর্গের মধ্যে কোন বর্গটি বা কোন শ্রেণীটি বিদ্যামান রাষ্ট্র কিংবা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। আর ব্যক্তি হিসাবে কে সামনে থাকলো তা মোটেই নির্ধারনের বিষয় নয়, বরং যে শ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে সে কাজ করছে সেই শ্রেণীটির নেতৃত্বই আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা হবে এবং তার মধ্য দিয়ে এই নির্দিষ্ট প্রকৃতির রাষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর সুগভীর ছাপ ফেলেছিল তা সুস্পভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৬.৪ পাকিস্তানক কর্তৃক শোষণের চিত্র

অত্যন্ত সুপরিকল্পিভাবে পাকিস্তানের গঠনের পর হতেই নানা ছুতোয়, নানা ধারায় এই শোষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। রাজস্ব সূত্রের সব স্থিতিস্থাপক উৎসগুলো ক্রমে ক্রমে প্রদেশের এখতিয়ার থেকে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে গ্রহণ করা হলো। শরণার্থীদের পূণর্বাসন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার যুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত সম্পদের ওপর ভাগ বসালো। একেবারে শুরুতেই আমদানি শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে চলে গেল। তারপর বিক্রয় করের অর্ধেকের ওপর কেন্দ্র ভাগ বসালো। পাট রফতানির শুল্কও কেন্দ্রীয় সরকার চেয়ে নিল। আয়করের ওপর চিরাচরিত প্রাদেশিক হিস্যা প্রদান বন্ধ হলো। তদুপরি কৃষি জমির ওপর শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করলো। সব প্রদেশেরই ক্ষতি হলো কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতির কোনো তুলনা ছিল না। পশ্চিমে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান, এবং সব সরকারি দফতরের পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে পশ্চিমের অধিবাসীদের কর্তৃত্বের ফলে পশ্চিমের প্রদেশগুলোর ক্ষতি পূষিয়ে নেয়ার সুযোগ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের বৃহদাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি ব্যয়ে ব্যবহৃত হওয়ায় পশ্চিমের অর্থনীতিই লাভবান হয়। পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বরাদ্দ সবসময়েই খুব কম ছিল। কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য (ঋণ ও অনুদান) সবসময় পশ্চিমের তুলনায় কম ছিল। দেখা যায় রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনাটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ লুণ্ঠনের পাকিস্তানি মডেল।

কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয় ও ব্যয়ে দুই প্রদেশের অবদান নিয়ে ১৯৬১ সালের একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর এই প্রতিবেদনে (Report on the Economic Relations between East & West Pakistan) বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা মাত্র ২২ শতাংশ এবং চলতি ব্যয়ে সেই হিস্যা হলো ১২ শতাংশ। তবে আয়ের ৭ শতাংশ এবং ব্যয়ের ৪৩ শতাংশ দুই প্রদেশে ভাগ করা যায় না। এই সমীক্ষা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে এই মন্ত্রণালয় আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদন ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্বের বরাদ্দ ও বিভাজন (Report of hte Allocation & Approtionment of Resource between the Centre and the Provinces)। এতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা দেখানো হয় যথাক্রমে ২৫ ও ৩৪ শতাংশ। তৃতীয় একটি হিসাব জাতীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ১৯৬৯ সালে উপস্থাপন করা হয়। এতে তিন বছরের কেন্দ্রীয় রাজস্ব আদায়ের হিসাব দেয়া হয়। সারণি ৬.১৪-এ এই হিসাবটি প্রদত্ত হলো। চলতি ব্যয়ের বিভাজনের ওপর ১৯৭০ সালে অর্থনীতিবিদদের প্যানেল একটি সামগ্রিক হিসাব প্রদান করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের পুরো সময়ে কেন্দ্রীয় রাজস্বের মাত্র ২৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে বলে তাঁরা অভিমত দেন। তাঁদের হিসাবও সারণি ৬.১৪-এ দেয়া হলো। উক্ত সারণি ও হিসাব নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬.১৪.

কেন্দ্রীয় রাজস্বের আঞ্চলিক উৎস ১৯৬৫-৬৮ (মিলিয়ন টাকার হিসেবে)

| | ১৯৬৫-৬৬ | | ১৯৬৬-৬৭ | | ১৯৬৭-৬৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পূর্ব | পশ্চিম | পূর্ব | পশ্চিম | পূর্ব | পশ্চিম |
| আমদানি শুল্ক | ৩৭৮ | ৭০৩ | ৪৬৭ | ৮১৩ | ৪৯৮ | ৭৮৪ |
| | ৩৪.৯% | ৬৫.১% | ৩৬.৫% | ৬৩.৫% | ৩৮.৮% | ৬১.২% |
| আবগারি শুল্ক | ১৯৮ | ৭৮৭ | ৩০৫ | ১১৮৭ | ৪০২ | ১৪০০ |
| | ২০.১% | ৭৯.৯% | ২০.৪% | ৭৯.৬% | ২২.৩% | ৭৭.৭% |
| আয়কর | ১৪৪ | ৫৭১ | ১৫৫ | ৬০৩ | ১৬২ | ৬২৮ |
| | ২০.১% | ৭৯.৯% | ২০.৫% | ৭৯.৫% | ২০.৫% | ৭৯.৫% |
| বিক্রয় কর | ২৩১ | ৬০৬ | ২৩৪ | ৬৮৪ | ১৭০ | ৪০১ |
| | ২৬% | ৭৪% | ২৫.৫% | ৭৪.৫% | ২৯.৮% | ৭০.২% |

উৎস: Pakistan , Ministry of Economic Affairs 1947-1967.

চিত্র-১

পূর্ব-পাকিস্তান ও কেন্দ্রের রাজস্ব আদায় (১৯৪৮-১৯৬৫)

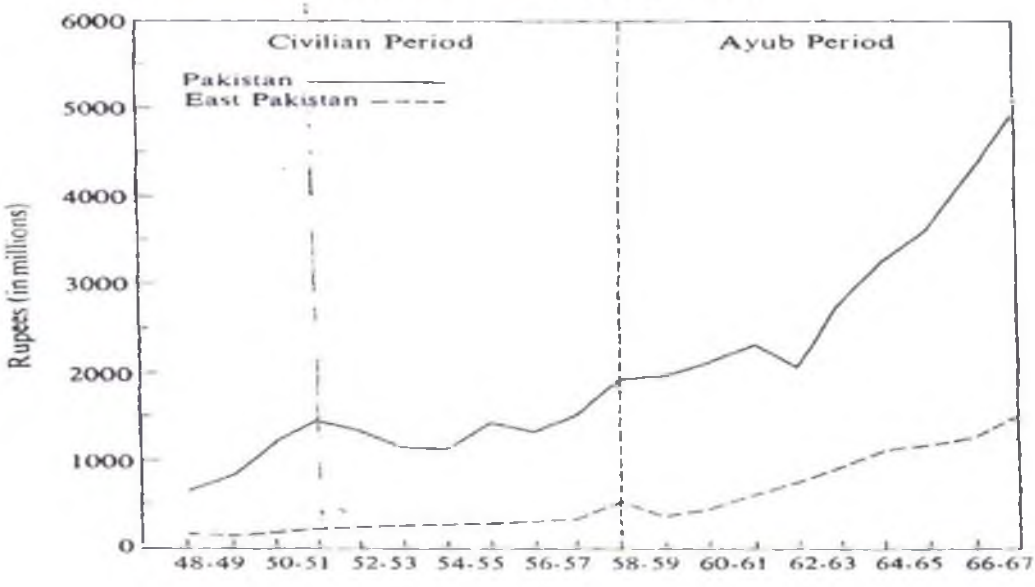


উৎস : Pakistan , Ministry of Economic Affairs 1947-1967 (p. 276-77)

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.১৫

পাকিস্তানে রাজস্ব ব্যয় ১৯৫০-৭০ (মিলিয়ন টাকার হিসেবে)

| সময় | পূর্ব পাকিস্তান | পশ্চিম পাকিস্তান |
|---|---|---|
| ১৯৫০-৫৫ | ১৭১০ | ৭২০০ |
| ১৯৫৫-৬০ | ২৫৪০ | ৮৯৮০ |
| ১৯৬০-৬৫ | ৪৩৪০ | ১২৮৪০ |
| ১৯৬৫-৭০ | ৬৪৮০ | ২২২৩০ |
| ১৯৫০-৭০ | ১৫০৭০ | ৫১২৫০ |

উৎস : পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন : Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan, ১৯৭০

এই সব প্রতিবেদন থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আদায় হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই হিসাবটি টিকে না। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে আদায়কৃত আয়করের হিস্যা হলো এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু অনেক করদাতা বিশেষ করে কোম্পানি যারা পশ্চিম পাকিস্তানে আয়কর দিত তাদের আয়ের মূল উৎস ছিল পূর্ব পাকিস্তান। অনেক ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা বা উৎপাদন করত; কিন্তু তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় দফতর থেকে আয়কর প্রদান করা হতো। সম্ভবত এই খাতে আরো দশ শতাংশ রাজস্ব পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসতো। একইভাবে আমদানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক যা পশ্চিমে আদায় হতো তার প্রকৃত বোঝা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ন্যস্ত হতো। পশ্চিমে আমদানিকৃত স্টিল ব্লেড রডে রূপান্তরিত হয়ে পূর্বে বিক্রয় হত। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে এই খাতেও পূর্ব পাকিস্তান হয়তো ৩৩ শতাংশ রাজস্ব প্রদান করত।

## ৬.৪.১ বহিঃসাহায্যের বন্টন ও ব্যবহার

মূলত বিভিন্ন ধররনের সাহায্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং দাতা দেশ থেকে আসে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ যেমন সাহায্য দেয়, পূর্ব ইউরোপ ও চীনের সমাজতান্ত্রিক দেশও তেমনি সহায়তা করে। পাকিস্তানের তেইশ বছরে জাতি প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। এই সম্পদ

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রবাহের যুক্তি ছিল পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণের দুর্দশা লাঘব। পাকিস্তানে বাঙালিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত গরিব। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তারাই এই বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ থেকে বঞ্চিত হয়।

অর্থনৈতিক বিষয়াবলি বিভাগ (Economic Affairs Division) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বয়ম্ভর অর্থনীতি প্যানেলের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের একটি আঞ্চলিক হিসাব প্রদান করে। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক সাহায্য মিলে তার গোটা হিসাব সারণি ৬.১৬ -এ তুলে ধরা হয়েছে। এই হিসাবে বেশ ক'টি গলদ রয়েছে। অপ্রকল্প সাহায্যকে ৩০:৭০ অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে ১৯৬০ সালে গৃহীত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তখন বাণিজ্য মন্ত্রী হাফিজুর রহমান নির্দেশ দেন যে, এই অনুপাতে সমুদয় অপ্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হবে। পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র কখনোই সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হুবহু মেনে চলে নি এবং এই ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। বাস্তবে পূর্ব পাকিস্তান কখনো ৩০ শতাংশ অপ্রকল্প সাহায্য ব্যবহার করে নি। এই হিসেবের আর এক ভিত্তি হলো পিআইএ এবং এনএসসি যে সব ঋণ গ্রহণ করে সেগুলোকে সমান ভাগে দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। কল্পনার ফানুসকে সর্বোচ্চ চড়িয়েও কখনো বলা যাবে না এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বা সেবা পূর্ব পাকিস্তান সমানভাবে পেয়েছে। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পরেও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সম্পদ বাংলাদেশ পায় নি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় খরচের প্রায় সবটুকুই হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এই হিসাবে ধরা হয়েছে যে, তারও এক-তৃতীয়াংশের উপকার পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে। তাই এই হিসাবটিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্ত হিস্যা যা দেখানো হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্ত হিস্যা আরো উক্ত হিসাবে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.১৬

১৯৪৭-১৯৭০ বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার (মিলিয়ন ডলারের হিসাবে)

| | পূর্ব পাকিস্তান | পশ্চিম পাকিস্তান | কেন্দ্রীয় | সরকার |
|---|---|---|---|---|
| প্রকল্প সাহায্য | ৪১৭ | ৬০৮ | ১০৮ | ১১৩৩ |
| অপ্রকল্প সাহায্য | ৪০৮ | ৬৭৩ | ৫৩ | ১১৩৪ |
| পিএল ৪৮০ খাদ্য | ৪৪৫ | ৭৯১ | ৫ | ১২৪১ |
| গ্যারান্টি প্রদত্ত ঋণ | ৩৫২ | ৬২৩ | ১১ | ৯৮৬ |
| প্রকল্প অনুদান ও কারিগরি সাহায্য | ৫৬ | ১৪০ | ২০০ | ৩৯৬ |
| দ্রব্য অনুদান | ২৬৩ | ৫৭৫ | ১৫ | ৭৯৩ |
| সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রম | - | ৭৫৬ | - | ৭৫৬ |
| মোট | ১৯৪১ | ৪১০৬ | ৩৯২ | ৬৪৩৯ |

উৎস : পরিকল্পনা কমিশন : Reports of Advisary Panels for the Fourth Five Year Plan, ১৯৭০

449932

'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিবেদন' ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যত সাহায্য পাওয়া যায় তার আঞ্চলিক বিভাজনের হিসাব দিয়েছে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা ছিল ৪৮২ মিলিয়ন ডলার, পশ্চিম পাকিস্তানের ১২৭৯ মিলিয়ন আর এজমালি ২৯৭ মিলিয়ন ডলার। এই এজমালি বরাদ্দকে ২০:৮০ অনুপাতে ভাগ করা সমীচীন হবে। ১৯৬০-৬৫ কালে পাকিস্তানের মোট বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ছিল ২৩৫১ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৬১২ মিলিয়ন ছিল অপ্রকল্প সাহায্য। ১৯৬৫-৭০ কালে ৩২৩১ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য মিলে এবং এর ১৩২০ মিলিয়ন ছিল অপ্রকল্প সাহায্য। ষাটের দশকে অপ্রকল্প সাহায্যের আঞ্চলিক বিভাজন ৩০:৭০ অনুপাতে ধরা যায়। প্রকল্প সাহায্যের ১০৭০ মিলিয়ন ডলার ছিল সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রমের জন্য (তারবেলা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত)। অন্য প্রকল্পগুলোকে বিচার করলে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অবশিষ্ট প্রকল্প সাহায্যের ৩৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়। তাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বরাদ্দের হিসাব সারণি ৭.১৬-এ তুলে ধরা হল ১৯৭০ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আরো সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৩২৩ মিলিয়ন ডলার আর এতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা ছিল ১৫৫ মিলিয়ন, যার



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

বৃহদাংশ ছিল খাদ্য সাহায্য। এ সময়ে চীন পাকিস্তানকে ২০০০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য দেয়, যার সিংহভাগ অব্যবহৃত থাকে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ হিস্যা ছিল

**সারণি ৬.১৭**

**১৯৪৭-৭০ প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলারের হিসাবে)**

| | সাহায্যের প্রকার | পূর্ব পাকিস্তান | পশ্চিম পাকিস্তান | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৪৭-৬০ | দ্রব্য সাহায্য (খাদ্য অন্তর্ভূক্ত) | ২৮৮ | ৬১২ | ৯৮০ |
| | প্রকল্প ও কারিগরি সাহায্য | ২৫৪ | ৯০৬ | ১১৫৮ |
| ১৯৬০-৭০ | দ্রব্য সাহায্য | ৫৭৯ | ১১৫৩ | ১৯৩২ |
| | প্রকল্প ও কারিগরি সাহায্য | ৯০৩ | ১৬৭৭ | ২৫৮০ |
| | সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রম | ০ | ১০৭০ | ১০৭০ |
| | মোট | ২০২৪ | ৫৬১৬ | ৭৬৪০ |
| ১৯৫৪-৬৫ | সামঞ্জস্য বিধান | -১২০ | +১২০ | |
| | সর্বমোট | ১৯০৪ | ৫৭৩৬ | ৭৬৪০ |

পূর্ববর্তী বছরগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্যের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২০৫৯ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২৩ শতাংশ। এই বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অব্যবহৃত সাহায্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের খাতায় ৪১২ মিলিয়ন ডলার আর পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবে ৫৬৮ মিলিয়ন ডলার। তুলনামূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের হিসাবে অব্যবহৃত সম্পদ ছিল বেশি, পাকিস্তানের প্রায় ৪৩ শতাংশ। ষাটের দশকের শেষভাগে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকতর সাহায্য বরাদ্দ হচ্ছিল বলেই অবব্যহৃত সাহায্যের কলেবর এত বড় ছিল। তাই পাকিস্তানের ২৩ বছরে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের ২৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবহৃত সাহায্যেও ২১ শতাংশ হিস্যা ছিল। তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হয়।

### ৬.৪.২ বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণঃ

দুই অঞ্চলের আমদানি-রফতানি পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত দফতর থেকে পরিচালিত হতো। পাকিস্তানে বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। পঞ্চাশ দশকের শেষদিক থেকে পূর্ব

*Dhaka University Institutional Repository*

পাকিস্তানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু দফতর পূর্বাঞ্চলে স্থাপিত হয়। তবে সাধারণত এগুলো হয় সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। আমদানি ব্যবসার জন্য একটি বিস্তৃত লাইসেন্স ব্যবস্থা চালু ছিল। রপ্তানি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ হতো শুল্ক বহাল করে অথবা বিশেষ উৎসাহী ব্যবস্থা চালু করে। তার ফলে যদিও বহির্বাণিজ্য পুরোপুরি ব্যক্তিমালিকানা খাতেই অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু মোটামুটিভাবে সরকারই নির্ধারণ করে দিত কোন ধরনের দ্রব্যাদি পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ভূমিকা রাখবে।

রপ্তানি বলতে শুধু কাঁচামালের রপ্তানিই ছিল পাকিস্তানের শুরুতে, যেমন পাট, চা, তুলা, উল বা চামড়া। শিল্পায়নে সামান্য অগ্রগতি হলেই প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদির রফতানি শুরু হয়, বিশেষ করে সুতা ও কাপড় এবং পাটজাত দ্রব্য। ষাটের দশকে অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত সামগ্রীর রফতানিও শুরু হয়। যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের রফতানি চলে। সারণি ৬.৭-এ পাকিস্তানের রফতানি আয়ের হিসাব দেয়া হয়েছে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সারা দেশের আয়ের ৬০ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, কেবল ১৯৬৬-৬৭ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানি আয় পূর্ব পাকিস্তানের সমান হতে থাকে এবং মাঝে মাঝে বেশিও হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়াটিই এমন যে তাতে কাঁচামালের রফতানি ক্রমেই কমতে থাকে আর প্রক্রিয়াজাত শিল্পদ্রব্য রফতানির কলেবর বাড়তে থাকে। প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ দরকার হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের তারই ছিল দারুণ ঘাটতি। পূর্ব পাকিস্তানের যে তবুও রফতানি ব্যবসায় অধিকতর আয় করে তা বস্তুতই অত্যাশ্চর্য বিষয়। ষাটের দশকের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয়ের অর্ধেক ছিল প্রক্রিয়াজাত পাটজাত দ্রব্য থেকে। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানি আয়ের ৯৭ শতাংশ ছিল প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি থেকে। পশ্চিমের প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য রফতানি করার জন্য বিশেষ উদ্যোগও নেয়া হয়। বোনাস ও রেয়াতির একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে রফতানিকারকদের উৎসাহ প্রদান করা হতো। ১৯৫৮ সালে একটি বোনাস ভাউচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১০০ ডলারের রফতানির জন্য ১০০ ডলার দাম সরাসরি দিয়ে বাকি ৪০ ডলারের একটি ভাউচার দেয়া হতো। এই ভাউচারের বদলে অধিক হারে দেশি মুদ্রা পাওয়া যেত, অধিক হারটি সচরাচর দশ থেকে পঁচিশ শতাংশ ছিল। এক কথায় শিল্পদ্রব্যের ক্ষেত্রে এক হিসেবে মুদ্রামানের অবমূল্যায়ন করা হয়। শেষের দিকে কাঁচামালের কোনো কোনোটির জন্যও ভাউচার দেয়ার প্রচলন হয়। এই ব্যবস্থায় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ এবং শিল্পের জন্য রসদ অল্প ব্যয়ে আমদানি করা চলতো, অথচ বেশি দামে উৎপাদিত দ্রব্য রফতানি করা যেত। শিল্প দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির স্বার্থে যে সব দ্রব্য রফতানি হতো তার জন্য আবগারি বা বিক্রয় শুল্ক রেয়াতির ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও যে শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানি করতো সে তার প্রয়োজনীয় রসদ আমদানির জন্য বিশেষ লাইসেন্স পেত এবং বর্ধিত হারে আমদানি করতে পারতো। এই সব ব্যবস্থা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের মঙ্গলেই আসে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সব কাঁচামাল রফতানি হতো তারা এই সব বিশেষ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত ছিল এবং পাটজাত দ্রব্য অনেককাল কোনো ভাউচার পেত না এবং পরবর্তীকালে অত্যন্ত নিম্ন হারে ভাউচার পেত। তাই রপ্তানি প্রসারের সমুদয় পদক্ষেপই ছিল পূর্ব

*Dhaka University Institutional Repository*

পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী এবং নিতান্তই বৈষম্যমূলক। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের তেইশ বছরে মোট পূর্ব পাকিস্তানই অর্জন করে রপ্তানি আয়ের ৫৪.৭ শতাংশ ।

## সারণি ৬ .১৮

## পাকিস্তানের রপ্তানি (মিলিয়ন টাকার হিসাবে)

| সাল | পূর্ব | পশ্চিম |
|---|---|---|
| ১৯৪৭-৪৮ | ২৭২ | ৪৪৪ |
| ১৯৪৮-৪৯ | ১৩২৮ | ৫৪২ |
| ১৯৪৯-৫০ | ৬৮৩ | ৫৩৫ |
| ১৯৫০-৫১ | ১২১১ | ১৩৪২ |
| ১৯৫১-৫২ | ১০৮৩ | ৯২২ |
| ১৯৫২-৫৩ | ৬৪২ | ৮৬৭ |
| ১৯৫৩-৫৪ | ৬৪৫ | ৬৪১ |
| ১৯৫৪-৫৫ | ৭৩২ | ৪৯১ |
| ১৯৫৫-৫৬ | ১০৪১ | ৭৪২ |
| ১৯৫৬-৫৭ | ৯০৯ | ৬৯৮ |
| ১৯৫৭-৫৮ | ৯৮৮ | ৪৩৪ |
| ১৯৫৮-৫৯ | ৮৮১ | ৪৪৪ |
| ১৯৫৯-৬০ | ১০৮০ | ৭৬৩ |
| ১৯৬০-৬১ | ১২৫৯ | ৫৪০ |
| ১৯৬১-৬২ | ১৩০০ | ৫৪২ |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৬২-৬৩ | ১২৪৯ | ৯৯৮ |
| ১৯৬৩-৬৪ | ১২২৮ | ১০৭৫ |
| ১৯৬৪-৬৫ | ১২৬৮ | ১১৪০ |
| ১৯৬৫-৬৬ | ১৫১৪ | ১২০৪ |
| ১৯৬৬-৬৭ | ১৫৭৯ | ১৩৩৮ |
| ১৯৬৭-৬৮ | ১৪৮০ | ১৮৬৪ |
| ১৯৬৮-৬৯ | ১৫৪০ | ১৭৬৩ |
| ১৯৬৯-৭০ | ১৬৬৩ | ১৬০৮ |
| মোট | ২৫৫৫৯ | ২১১৩৭ |
| | (৫৩৭০ মি. ডলার) | (৪৪৪০ মি. ডলার) |

উৎস: কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর, পাকিস্তান সরকার : Monthly Foreign Trade Statistics, ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয় ছিল ৫৩৭০ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া যেখানে বৈদেশিক সম্পদ প্রবাহ ছিল প্রায় ১৬০০ মিলিয়ন ডলার; কিন্তু মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৪২১৬ মিলিয়ন ডলার। তাই পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ২৭৫৪ মিলিয়ন ডলার প্রকৃত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার হাতিয়ে নিত এবং এর অধিকাংশ পশ্চিমের জন্য ব্যয় হতো। তাই পশ্চিম পাকিস্তান একদিকে যেমন বৈদেশিক সম্পদের সিংহভাগ ব্যবহার করে, অন্যদিকে দেশের রপ্তানি আয়েরও সিংহভাগ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। পাকিস্তানের তেইশ বছরের লেনদেনের একটি হিসাব সারণি ৭.১৯-এ প্রস্তুত করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.১৯

বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব ১৯৪৭-৭০ (মিলিয়ন ডলারের হিসাবে)

| | আয় | | ব্যয় |
|---|---|---|---|
| দ্রব্য রফতানি | ৯৮০০ | দ্রব্য আমদানি | ১৩৫০০ |
| বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য | ৭০০০ | ঋণ পরিশোধ | ১০০০ |
| সামরিক সাহায্য | ৩০০০ | অদৃশ্যমান খাতে | ১১০০ |
| মোট = ১৯৮০০ | | নিট খরচ = ১৯৮০০ | |

ব্যাখ্যা দ্রব্য রপ্তানি আয় ও আমদানি খরচ সারণি ৪.৭ ও ৪.৮ হতে নেয়া।

১. অর্থনৈতিক সাহায্য সারণি ৬.১৯ থেকে নেয়া, অব্যবহৃত সম্পদ বাদ দেয়া হয়েছে।

২. সামরিক সাহায্যপ্রাপ্তির হিসাব : আমেরিকা ২৫০০ মিলিয়ন, চীন ও অন্যান্য (রাষ্ট্রসহ) ৫০০ মিলিয়ন ডলার।

৩. ঋণ পরিশোধের হিসাব Budget in Brief 1971-72, ইসলামাবাদ, পৃ. ৬৭ থেকে।

৪. নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারে কিছু অস্ত্রসম্ভাব সংগ্রহ করা হয়। ১২০০ মিলিয়ন ডলারের হিসাব লেখক পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা সচিবালয়ের উপসচিব হিসেবে যে বিভিন্ন হিসাব দেখার সুযোগ পান তার ভিত্তিতে তৈরি।

৫. অদৃশ্যমান খাতের হিসাব কয়েক বছরের বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব দেখে বানানো হয়। মোটামুটিভাবে রপ্তানি আয়ের ৩০ শতাংশ ছিল এই খাতে আয় আর ব্যয় ছিল আমদানি ব্যয়ের ৩০ শতাংশ।

পশ্চিম পাকিস্তানকে বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয় তা অত্র হিসাব থেকে বৈদেশিক লেনদেনের তথ্যের মাধ্যমে পরিস্কার হওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ পরিশোধ এবং অদৃশ্যমান খাতের নিট খরচ বহন করে এবং এই দুটি খাতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্য পায় খুবই সামান্য এবং তাও ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই। তাই ঋণ পরিশোধে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা বড় জোর এক-চতুর্থাংশ হতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের বর্হিবাণিজ্যের কলেবর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধেক ছিল। তাই অদৃশ্যমান খাতের নিট খরচের মাত্র এক-তৃতীয়াংশই পূর্বাঞ্চলের ভাগে বিবেচনা করা যায়। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের অন্তত ২০০০ মিলিয়ন ডলার পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায়। পাকিস্তানি মুদ্রামানের বিকৃতি-বিচ্যুতি হিসাবে নিলে সম্পদ পাচারের কলেবর সহজেই দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়।

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ৬.২০

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ১৯৪৭-৬৯ (মিলিয়ন টাকায়)

| | পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি | পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি |
|---|---|---|
| ১৯৪৭-৪৮ | ১৯ | ১৪০ |
| ১৯৪৮-৪৯ | ৫০ | ২৩৫ |
| ১৯৪৯-৫০ | ৬২ | ২৭২ |
| ১৯৫০-৫১ | | |
| ১৯৫১-৫২ | ১৪৯ | ২১৮ |
| ১৯৫২-৫৩ | ১৫১ | ৩৮৭ |
| ১৯৫৩-৫৪ | ১৯৮ | ৩০৫ |
| ১৯৫৪-৫৫ | ২১৮ | ৩৩৪ |
| ১৯৫৫-৫৬ | ২৪৪ | ৫৩২ |
| ১৯৫৬-৫৭ | ২৬৯ | ৭০১ |
| ১৯৫৭-৫৮ | ২৮৯ | ৬৮৬ |
| ১৯৫৮-৫৯ | ৩৬২ | ৫৬৯ |
| ১৯৫৯-৬০ | ৩৬৩ | ৮২৬ |
| ১৯৬০-৬১ | ৪০২ | ৮৫৫ |
| ১৯৬১-৬২ | ৪৭১ | ৯৫৭ |
| ১৯৬২-৬৩ | ৫৯১ | ৮৯৫ |
| ১৯৬৩-৬৪ | ৫৪৪ | ৮৭৫ |
| ১৯৬৪-৬৫ | ৬৫৫ | ১২০৯ |
| ১৯৬৫-৬৬ | ৭৩৯ | ১৩২৫ |
| ১৯৬৬-৬৭ | ৭৮৫ | ১২৩৩ |
| ১৯৬৭-৬৮ | ৮৭১ | ১৩৮৫ |
| ১৯৬৮-৬৯ | ৯৬৬ | ১৮০০ |
| | ৮২৩৮ (১৭৩৭ মি. ডলার) | ১৫৭৩৯ (৩৩০৯ মি. ডলার) |

*Dhaka University Institutional Repository*

মূলত পাকিস্তানের বাণিজ্য নীতি যে পশ্চিম কর্তৃক শোষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত তা দুই অঞ্চলের সম্পর্কটিকে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক রূপ দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামালের আমদানি। বৈদেশিক সাহায্য এবং নিজস্ব রফতানি আয় দিয়ে এই প্রয়োজন মেটানো হয়। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য বাজার খুঁজতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বানানো হয় একটি বন্দি বাজার এবং সেখানে চড়া দামে এই সব দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। বৃটিশ আমলে যেমন চামড়া বিলেতে নিয়ে গিয়ে তা ফেরত পাঠানো হতো জুতো হিসেবে, পাকিস্তান যুগে চামড়া একইভাবে রফতানি হতে থাকে, তবে তখন জুতো আসতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের বাজার এবং রপ্তানি আয় দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন সাধন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করে, কম দামে কৃষি সামগ্রী খরিদ করে নিয়ে এবং চড়া দামে প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি বাজারে ছেড়ে সার্বিক চাহিদাকে নিম্নমুখী করে রাখা হয়। তার ফলে ভোগ দ্রব্য বেশি করে আমদানির সুযোগ রহিত করে পশ্চিমের উন্নত মানের জীবনের চাহিদা মেটানো হয়। তদুপরি পূর্ব পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি ঘটিয়ে সেখানকার মানুষকে আরো বঞ্চিত করা হয়। শুধু বাণিজ্য সূত্রে ফি বছর পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করে দেড়শো মিলিয়ন ডলার।

### ৬.৪.৩ মূলধন ও মুনাফা বৈষম্য ঃ

মূলধন গ্রহণ করা হয় অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কারণ বৈদেশিক মূলধন একটি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের অভাব মোচন করে এবং লভ্যাংশের পুর্নবিনিয়োগ আরো বিনিয়োগ বাড়ায়। বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে আসে প্রযুক্তির হস্তান্তর, স্থানীয় শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা মহলে নব নব কৌশল ও দক্ষতা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনার সুযোগ। বৈদেশিক বিনিয়োগের আর একটি অবদান হল নানা স্তরে কর্মসংস্থান। কৃষি খামার বা বাগান স্থাপন করে ঔপনিবেশিক শক্তি বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করতো কিন্তু এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে শোষণ বেশি হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজি বাংলাদেশে এই ঔপনিবেশিক কায়দায়ই প্রবাহিত হয়। যা পুজি শোষণের জ্বলন্ত উদাহরণ।

দুই অংশে দুটি স্বতন্ত্র ভূখন্ড হওয়া সত্ত্বেও তারা একত্রে একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করে। তাই পশ্চিমের পুঁজি পূর্বে নিয়োজিত হতো, পশ্চিমের কর্মচারী পূর্বে কর্মরত থাকতো-এ ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ ছিল না। পশ্চিমের পুঁজি পূর্ব পাকিস্তানে শুধু লভ্যাংশের সন্ধানে থাকত এবং সচরাচর তাদের লাভ পশ্চিমে স্থানান্তরিত হতো; পুনর্বিনিয়োগের হার ছিল খুব কম। আদমজি চটকল সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, তাদের সমুদয় বিনিয়োগ তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে তারা উসুল করে নেয়। পশ্চিমের পুঁজি সাধারণত পূর্বে কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণে লিপ্ত হতো এবং তা পশ্চিমে পাঠাতো শিল্পজাত দ্রব্যে রপ্তানিকরণের জন্য। যেমন পশ্চিমের পুঁজি পূর্বে চামড়ার কারখানা স্থাপন করলো,

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়াজাত চামড়া তারপরে বিদেশে ও পশ্চিম পাকিস্তানে গেল। পশ্চিমে এই চামড়া দিয়ে তারা জুতো, স্যান্ডেল এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন করলো। এইসব ভোগ্যপণ্য আবার পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি হলো। দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পর্কের এই দিকটি বৃটিশ আমলের কথাই মনে করিয়ে দিত। ভারতের কাঁচামাল বৃটেনে শিল্প দ্রব্যে পরিণত হয়ে আবার এসে ভারতে বিক্রয় হতো। এই ঔপনিবেশিক সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন পূর্ব পাকিস্তানে দেখা গেল না। দিন দিন তা আরো প্রকট আকার ধারণ করল।

স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিকে বাংলাদেশের মোট শিল্প খাতে স্থির সম্পদ ছিল ৬৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । এর প্রায় অর্ধেক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের মালিকানায়। পশ্চিম পাকিস্তানি এই পুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ হয় পাকিস্তান সরকারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি খাতে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করে সস্তা দামে তা পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতির হাতে তুলে দেয়া হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো কর্ণফুলি কাগজ কল। পিআইডিসি এই কারখানাকে দাউদ গ্রুপের কাছে সামান্য দামে বিক্রয় করে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই কারখানা ব্যক্তিমালিকানা খাতে হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কারখানাটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এই লাভে চন্দ্রঘোনায় রেয়ন মিল স্থাপিত হয়। আর এক উপায়ে পশ্চিমের পুঁজিকে উৎসাহ দেয়া হয়। আর্থিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান থেকে পশ্চিমের পুঁজিপতিদের ঋণ দিয়ে তাদের পূর্বে পাঠানো হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান আইডিবিপি (পাকিস্তান শিল্প ব্যাঙ্ক) এবং আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান পিকিক (পাকিস্তান শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা) এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক, যার প্রায় সবগুলোই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠান, তারাও কম যায় নি। প্রায়ই দেখা যেত যে, মাত্র দশ শতাংশ নিজ সম্পদ বিনিয়োগ করে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা সহজেই ৯০ শতাংশ ঋণ নিয়ে কারখানা স্থাপন করতে পারতো। এই সুযোগ কিন্তু বাঙালিদের সচরাচর না দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হতো।

সরকারের সহায়তায় এবং করুণায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্বে এসে কারখানা পড়তো। কিন্তু যেই তারা লাভের মুখ দেখতো তখনই শুরু হতো পশ্চিমে সম্পদ পাচার। আদমজি গোষ্ঠী তাদের সব সম্পত্তি গড়ে তুলে চটকলের ব্যবসা করে। কিন্তু ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ বীমা কোম্পানি ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি সুবিধা লুটবার মানসে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নামমাত্র সদর দফতর স্থাপন করে; কিন্তু কোম্পানি পরিচালনা হতো করাচি থেকে এবং কোম্পানির ব্যবস্থা ছিল মূলত পশ্চিমে। প্রগ্রেসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ তার সব পুঁজি বানায় সিলেটের ফল চাষ ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানায়। কিন্তু পাকিস্তান ভাগের সময় তাদের প্রধান ও বেশি বিনিয়োগ ছিল করাচিতে। এই ধরনের ভূরি ভূরি কাহিনী রয়েছে। এতো সব কাহিনীর মোদ্দা কথাটি হলো যে, পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজি পূর্ব পাকিস্তানকে শোষনের একটি উপনিবেশ হিসেবেই বিবেচনা ও ব্যবহার করে।

Dhaka University Institutional Repository

### ৬.৫.৪ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে বৈষম্য

সরকারি নীতি ও উদ্যোগ বিভিন্ন সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে তা আমাদের নজর এড়ায়নি । চলতি ব্যয়ের ধারা, বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের কায়দা এবং পুঁজির বিকাশে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা একটি দুরভিসন্ধিমূলক চরিত্রের পরিচয় দেয়। বস্তুতপক্ষে সকল অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য ছিল একটি। মুদ্রানীতি ও সরকারি আয়-ব্যয় কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধি। ছয়সালা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের শোষণই ছিল তার মূলনীতি। সঙ্কীর্ণমনা আমলাতন্ত্র ও বিশেষজ্ঞরা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের উপায় হিসেবেই বিবেচনা করে। পাকিস্তানের প্রায় বিশ বছরের পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের চরিত্রটি সারণি ৬.২১-তে তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তান দাবি করতো যে, পূর্ব পাকিস্তানে দক্ষতার অভাব ছিল, বৃহত্তর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষমতা ছিল না, উন্নয়ন আত্তীকরণ দক্ষতা ছিল না। তারা আরো বলতো যে, পূর্বে কোনো গতিশীল ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত না থাকায় বিনিয়োগে অগ্রগতি আসে নি।

**সারণি ৬.২১**

**পাকিস্তানে উন্নয়ন ১৯৫০-৭০ (মিলিয়ন টাকার হিসাবে)**

| সাল | পূর্ব পাকিস্তান | | | পশ্চিম পাকিস্তান | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সরকারি খাত পরিকল্পনা | পরিকল্পনা বহির্ভূত | বেসরকারি খাত | সরকারি খাত পরিকল্পনা | পরিকল্পনা বহির্ভূত | বেসরকারি খাত |
| ১৯৫০-৫৫ | ৭০০ | ০ | ৩০০ | ২০০০ | ০ | ২০০০ |
| ১৯৫৫-৬০ | ১৯৭০ | ০ | ৭৩০ | ৪৬৪০ | ০ | ২৯৩০ |
| ১৯৬০-৬৫ | ৬২৫০ | ৪৫০ | ৩০০০ | ৭৭০০ | ২৩১০ | ১০৭০০ |
| ১৯৬৫-৭০ | ১১০৬০ | ০ | ৩০০০ | ১৯১০০ | ৩৬০০ | ১৬০০ |
| মোট ১৯৫০-৭০ | ১৯৯৮০ | ৪৫০ | ৯৫৩০ | ২৪৪৪০ | ৫৯১০ | ৩১৬৩০ |

উৎস : পরিকল্পনা কমিশন : Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan, ১৯৭০

একটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা দরকার কি কারনে পূর্ব পাকিস্তানে ভঙ্গুর উন্নয়ন এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে পুঁজিপতিদের বিকাশ হলো না। উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যবস্থাটিই ছিল এমন যে,

*Dhaka University Institutional Repository*

পূর্ব পাকিস্তান কোনো মতেই তার ন্যায্য হিস্যা পেতে পারতো না। কেন্দ্রীয় সরকারের সমুদয় কার্যক্রম ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে অবস্থিত ছিল এবং তাদের সমস্যা তারা সহজে দেখতে পেত এবং উপলব্ধিও করতে পারতো। প্রাদেশিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে যে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য পোহাতে হতো তার মোকাবিলা করা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল দুরূহ, শুধু দূরত্বের কারণেই অনেকটা বিঘ্নিত হতো। তার উপরে ছিল কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য। তারা পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতো না এবং নিজের অঞ্চলের স্বার্থটা ভালো বুঝতো। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ হতো প্রায়ই দেখা যেত তা খরচ হতো না। আশ্চর্যজনকভাবে যখন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি হলো এবং প্রাদেশিক সরকারের উচ্চ পদে বাঙালি কর্মকর্তারা আসীন হতে থাকলো তখনই কিন্তু তহবিলের ব্যবহার শনৈ শনৈ করে বেড়ে গেল। ১৯৫৫-৫৬ সালে বাস্তবায়নের হার ছিল ৪৮ শতাংশ অথচ ১৯৫৭-৫৮ সালে তা বেড়ে হলো ৮১ শতাংশ এবং পরবর্তী বছরে হলো ৯৩ শতাংশ যা উল্লেখ যোগ্য।

পূর্ব পাকিসস্তানের স্বার্থের পরিপন্থি বিশেষ যে দিকটি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্থায়ননীতি ও প্রয়োগ । প্রদেশগুলোর রাজস্ব ক্ষমতা ছিল সীমিত, তাই নিজস্ব রাজস্ব আয় থেকে তাদের খরচই জোগাতে হত না। কেন্দ্রীয় রাজস্বের যে হিস্যা তারা পেত তার ফলে তাদের সামান্য উদ্বৃত্ত হতো। কেন্দ্রীয় রাজস্বের বন্টনে পূর্ব পাকিস্তান কখনো সুবিচার পায় নি, তা আগেই বিবৃত হয়েছে। রাজস্ব উদ্বৃত্তের সিংহভাগই হতো কেন্দ্রে। ১৯৬৮-৬৯ সালে যেমন মোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিল ২৩১৪ মিলিয়ন টাকা, পূর্ব পাকিস্তানের ১৭৮ মিলিয়ন, পশ্চিমের ৪১২ মিলিয়ন আর কেন্দ্রের ১৪১০ মিলিয়ন। কেন্দ্র দুই প্রদেশকে উন্নয়ন অনুদান ও ঋণ প্রদান করতো এবং তা থেকেই প্রাদেশিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন হতো। এ ছাড়া প্রদেশগুলো বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পেত। ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসাবটিই দেখা যাক। বৈদেশিক সাহায্যের একটি কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহার করে। কেন্দ্র দুই প্রদেশে অনুদান ও ঋণ দেয় ২৯১২ মিলিয়ন টাকা আর মোট বৈদেশিক সাহায্য মিলে ২৭২৯ মিলিয়ন টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

# সপ্তম অধ্যায়

## ৭.০ বাংলাদেশ: জাতি রাষ্ট্র উত্থানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের চেতনা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের আদর্শ এ অবতলের জনগনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালী জাতিসত্ত্বা স্বল্প সময়ের জন্য ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কাছে পরাজিত হলেও এ সত্ত্বা ধ্বংস না হয়ে থেকে যায় সুপ্ত, লির্লিপ্ত। ভাষাভিত্তিক এ জাতীয়তাবাদের স্রোতধারা বহুকাল থেকে এ অঞ্চলে অতি সন্তর্পনে বহমান ছিল। একই ভাষা ঐতিহ্যেও অধিকারী বাঙালী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে অখন্ড বাংলার চিন্তা তারই ফসল। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে শুরু হয় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার পুনর্জাগরণ। উনিশ শতকে এ উপমহাদেশে ধর্মভিত্তিক যে জাতীয় চেতনা দেখা যায় তার মূলেও ছিল বুর্জোয়া শ্রেনীর স্বার্থ। অখন্ড ভারতে হিন্দু বুর্জোয়াদেও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টেকা অসম্ভব ভেবেই বিকাশন্মুখ মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেনী পরবর্তীতে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জোয়ার তুলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। বাঙালী মুসলমান সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্ঠির পর বাঙ্গালী উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ অবাঙালী বুর্জোয়া শ্রেনী কর্তৃক ব্যহত হতে থাকে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মোহ ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালী ভাষা সংস্কৃতির উপর পরিকল্পিত আক্রমন চালায়, অবাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে যাতে বাঙালী মধ্যবিত্ত্য শ্রেনীর বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে এবং শোষণ –শাসনের পথ নিরাপদ হয়।

মেকিয়েভেলীর মতে কোন জাতিকে পদানত করতে হলে প্রথমে সে জাতির মাতৃভাষা ধ্বংস করা প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রয়োজন শাসকগোষ্ঠীর ভাষার ব্যাপক প্রচলন। পাকিস্তনের পুঁজিপতি শ্রেনীর স্বার্থ রক্ষাকারী শাসকগোষ্ঠী সে পথেই অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু গোখলের বিখ্যাত উক্তি ``What Bengal thinks to day, the rest of india would think tomorrow'' সত্য বলে বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ বাংলায়ই প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার সূত্রপাত হয় এবং বাঙালীরাই জাতীয়তাবাদী আদর্শ সমগ্র ভারতীয় ছড়িয়ে দেয়। বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লব বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ হয়। যাই হোক, বাঙালী তার সহজাত বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টির বলে পাকিস্তানী শাসক শ্রেনীর অভিপ্রায় আঁচ করতে পারে। এ কারণে আক্রমণ রাখা অর্থনৈতিক শোষনের বিষদাঁত বিচক্ষণ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেনীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

বাঙালী যুগ যুগ ধরে বিদেশীদের দ্বারা শোষিত ও শাসিত হয়েছে। জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে তারা কখনও রুখে দাড়ায়নি। বিদ্রোহ হয়েছে। প্রতিরোধ হয়েছে,খন্ডিতভাবে বিচ্ছিন্নভাবে। কোন

*Dhaka University Institutional Repository*

আন্দোলন বা বিদ্রোহ সমগ্র বাঙালী জাতির শেকড়ে নাড়া দিতে পারে নি,কখনও স্বতন্ত্র জাতি চেতনার উদয় হয়নি। বাঙালী প্রথমবারের মত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার জাতিসত্তার সমন্বিত রূপ আবিষ্কার করে প্রথমবারের মত বাঙালী বুঝতে পারে বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র একটি জাতি। এই জাতীয়তাবোধকে সামনে রেখে জাতিসত্তা ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকে এগিয়ে চলে বাঙালীর সংগ্রাম। যা ছিল জাতীয়তাবোধ উৎসারিত। অর্থাৎ বাঙালীর রাজনৈতিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে না হয়ে হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জাতিসত্তা ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর লক্ষ্যে।

### ৭.১ সাতচল্লিশ পূর্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঃ

১৯২৪ সাল থেকে হিন্দু- মুসলিম সম্পর্ক ছিল টানটান উত্তেজনাপূর্ন এবং ১৯২৮ সালে তা চরমে পৌঁছলো। কংগ্রেসের একজন নিবেদিত সদ্য মাওলানা মোহাম্মদ আলী কংগ্রেস ছাড়লেন এবং দেশত্যাগও করেণ। ১৯২৯ সালে ঐক্যের দূত মোহম্মদ আলী জিন্নাহ সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে চৌদ্দ দফা পেশ করলেন। বিফল মনোরথ ও হতাশ হয়ে তিনি দেশত্যাগ করে বিলেতে বসতি স্থাপন করলেন। সাইমন কমিশন ১৯৩০ সালে তাদের প্রতিবিদনে ভারতের জন্য এক ইউনিটের সকরাকর নাকচ করে দিল। প্রদেশের ক্ষমতার প্রতিসংক্রম অব্যাহত রেখে সেখানে দায়িত্বশীল সরাকর গঠনের প্রস্তাব পেশ হলো। কিন্তু কেন্দ্রের শুধু সরকারি কর্মমর্তাদের নিয়ে শাসন পরিচালনার সুপারিশ করা হলো এবং এরা কোনো ভোটদাতারেদ কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না। প্রতিবেদনে সাংবিধানিক কাঠামোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য গোল টেবিল বৈঠকের আহবান জানানো হয়। কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা মোহনদাস করমচাদ গান্ধী এই প্রতিবেদনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেলেন। তার দাবি হলো দুটো: প্রথমত, লবণ কর রহিত করা আর দ্বিতীয়ত, নেহরু প্রতিবেদনের সুপারিশ গ্রহণ করা। এদিকে অসহযোগ আন্দোলন চললো, অন্যদিকে ১৯৩০ সালে গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অবিবেশনের পর ১৯৩২ সালে রামজে ম্যাকডোনাল্ড সম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি ঘোষণা করলেন। ১৯৩৪ সালে রামজে ম্যাকডোনাল্ডয ঝিমিয়ে গেল এবং এই সুযোগে ওয়েষ্টামিনিস্টার পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার আইন পাস হলো। ১৯৩৪ সালে মুসলিম নেতারা জিন্নাহকে দেশে প্রত্যাবর্তনের জস্য সার্থক চাপ প্রয়োগ করে। তিনি মুসলিম লীগের পুর্নজাগরণের ভার নেন। ১৯৩৫ সালের আইন সবদিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কিন্তু তা ছিল মন্দের ভালো। প্রদেশে দায়িত্বশীল নির্বাচিত সকরাক হবে। কেন্দ্রেও ক্রমে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে । মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দুই দলই এই অসম্পূর্ণ সংবিধানিক ব্যবস্থাকে সুযোগ দিতে রাজি হলেন, চেষ্ট করে দেখা যাক কি হয়। একটি যৌথ নির্বাচনী কৌশল এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠন নিয়ে দলের মধ্যে দীর্ঘ সংলাপ চলেলো।

*Dhaka University Institutional Repository*

মুসলীম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠনের আহবান জানিয়ে ব্যর্থ হলে ১৯৩৭ সালে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বছরব্যাপী কংগ্রেস শাসনের অভিজ্ঞতা মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই তিক্ত। অনেক জায়গায় গো-মাংস নিষিদ্ধ হয়, বিভিন্ন অছিলায় আজান প্রদান বিঘ্নপ্রাপ্ত হয়। নানা জায়গায় মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয় এবং মুসলি- রা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলান দ্বীন-দর্শনের শিক্ষা তো দেয়াই হলো না, পরিবর্তে হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্মাচার হয় বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিষয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলো যুদ্ধ-উদ্যোগের অংশগ্রহণ নিয়ে মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সর্বত্র পদত্যাগ করে। মুসলামনেরা এই উপলক্ষে নাজাত দিবস পালন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এই দু'বছর সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনো দাবি-দাওয়া শুনলো না বা তাদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা নিলো না। এতেই নিহিত ছিল ভারত বিভাগের বীজ। সুপ্ত স্বাতন্ত্রবোধ সাহসাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কবি ইকবাল ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ অধিবেশনে উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে বসেন। ১৯৩৩ সালে বিলেতে অধ্যায়নরত গোঁড়া মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চৌধুরী রহমত আলী উত্তর-পশ্চিমের মুসলামন প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। এইসব কল্পনাবিলাস কংগ্রেস শাসনের অভিজ্ঞার ফলে বাস্তবরূপ পেতে থাকলো। আল্লামা ইকবাল তার মুসলিম রাষ্ট্র ও ভারতের সম্পর্ক কি হবে সে বিষয়ে কোনো স্বচ্ছ ধারণা দেন নি, সম্ভবত তিনি একটি ভারতীয় ফেডারেশনে এই রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন। চৌধুরী রহমত আলী চারটি প্রদেশ ও কাশ্মির রাজ্য নিয়ে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেন। এ ধরনের আরো প্রস্তাব ১৯৪০ সাল পর্যন্ত উত্থাপিত হতে থাকে। এবারে মনে হলো যে, অবিভক্ত ভারতের ভাগ্য তত সুপ্রনন্ন নয়, স্বাতন্ত্রবাদের পালে হাওয়া লেগেছে। ১৯৪০ সালে সত্যি সত্যি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য ঐকান্তিক চিন্তাভাবনা রূপ পেল। লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠলো। ২৩ মার্চ বাঙালি নেতা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করলেন এবং কাউন্সিল পরদিন নিম্নরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে ঃ

"প্রস্তাবিত হচ্ছে যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে দেশে একটি কার্যকরী ও মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে। ভৌগলিকভাবে সংলগ্ন এলাকা নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সীমানা পুনর্বিন্যাস করে আঞ্চলিক দেশ গঠন করা হবে, যাতে যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর ধর্মীয় যেমন উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে, সেসব এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠা হবে এবং এইসব রাষ্ট্র হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

এইসব এলাকায় ও অঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ তাদের সঙ্গে আলাচনা করে সংরক্ষণের জন্য সবিশেষ কার্যকরী এবং বাধ্যতামুলক নিশ্চয়তা ক্ষেত্রে সংবিধানে সন্নিবেশিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই অধিবেশন কার্যকরী কমিটিকে এই মৌলিক নীতির ভিত্তিতে একটি সংবিধানের কাঠামো প্রণয়নের দায়িত্ব দিচ্ছে। এই কাঠামো অনুযায়ী চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যেকটি আঞ্চলিক দেশ বিভিন্ন বিষয়ে যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করবে।"

প্রকৃতপক্ষে দুই বা ততোধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ধারণা ছিল ১৯৪০ সালের এই প্রস্তাবে । পরবর্তী বছরে মাত্র দুটি মুসলিম বসতির কথা উল্লেখ করা হয় এবং লাহোর প্রস্তাবের ভাষা বদলানো হয়। তখন বলা হয়, "ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যে সেখানে স্বাধীন মুসলিম জাতীয় বসতি হিসেবে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যেখানে গঠনকারী ইউনিটগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।" এক পাকিস্তানের ধারণা সুবিধাজনক কৌশল হিসেবে ক্রমে ক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেস ভারতের যে-কোনো বিভক্তিরই বিরোধিতা করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব যত জোর পাওয়া যায় তিনভাগে ভাগ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন আর এক পাকিস্তানের দাবি সেই ঐক্যের পরিচায়ক ছিল। সর্বশেষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে দুই জাতিতত্ত্ব তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগ প্রদান করে। যদি অন্যান্য গোষ্ঠীর হওয়া উচিত। সরকারিভাবে কিনউত এক পাকিস্থানের দাবি ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সাংসদদের সম্মেলনে জায়েজ করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

" উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বাংলা ও আসামকে নিয়ে এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে, অর্থ্যাৎ পাকিস্তান এলাকাগুলো যেকানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলোকে নিয়ে, একিট স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে হবে যে অনতিবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হবে।"

পাকিস্তান পস্তাব গ্রহণের পরেও স্বাধীন ভারতে কি করে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায় তাই ছিল মুসলিম লীগের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৪২ সালে ক্রিপস্ মিশন যখন ভারতের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আসে তখন তাদের কাছেই সর্বপ্রথম পাকিস্ড্রান দাবি উত্থাপন করা হয়। এই মিশন অভিমত দেয় যে, এমন কোনো ব্যবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর ঠিক বলপ্রয়োগে দমন করতে হবে। তাই মিশনের প্রস্তাব ছিল যে ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে, যেন প্রদেশ কোনোটি ইচ্ছে করলে সেই ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্ত নাও হতে পারে, তা প্রদেশের এখতিয়ার।

### ৭.২ ১৯৪৫-এর সাধারণ নির্বাচন ও ভারতের বিভক্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধে ওয়াভেলস পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। ১৯৪৫-এর

*Dhaka University Institutional Repository*

ডিসেম্বর ও ১৯৪৬-এর জানুয়ারীতে দেশব্যপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনে পাকিস্তান দাবির জনপ্রিয়তা যাচাই করা হয়। মুসলিম লীগ দাবি করলো যে, তারাই মুসলমানদের প্রতিনিধি এবং তাদের লক্ষ্য পাকিস্তান। কংগ্রেস এই দাবি অস্বীকার করে বললো যে, তারা ধর্ম-নির্বিশেষে সবার প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনসাধারণ বিভক্ত ভারত চায়। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের সব মুসলিম আসনে নির্বাচিত হলো এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৪৯৫টি আসনের মধ্যে ৪৪৬টি (৯০শতাংশ) দখল করলো। লক্ষণীয় বিষয় ছিল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগের ব্যর্থতা। উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মোট ৩৬টি মুসলিম আসনের মাত্র ১৭টি পেল মুসলিম লীগ। সিন্ধু প্রদেশ ৩৫টির মধ্যে পেল ২৭টি এবং পাঞ্জাবে ৮৬টি আসনের মধ্যে ৭৫টি। সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ালিশন সমানসংখ্যক আসন পেলে দ্বিতীয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং অতি কষ্টে মুসলিম মুসলিম লীগ সহজেই সরকার গঠন করলো। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার এবং পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট-আকালি-কংগ্রেস কোয়ালিশস সরকার গঠিত হলো।

নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সমস্যা সমাধান এবং ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এলো ক্যাবিনেট মিশন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপট্স্ এবং আলবার্ট আলেকজান্ডার ২৩ মার্চ করাচিতে পৌঁছলেন। বিভিন্ন কর্মকর্তা ও দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ১৬ মে-তে তাঁরা সাংবিধানিক নীল নকশা পেশ করলেন। এইটি ছিল সব প্রদেশকে নিয়ে তিনটি গ্রপ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমভিব্যহারে একটি ভারতীয় কনফেডারেশন পরিকল্পনা। খ-গ্রপ ছিল উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে এবং গ গ্রপ ছিল পূর্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে। তাই এই দুই গ্রুপে পাকিস্তান এলাকা এবং ক গ্রুপে ছিল ভারতের বাদ-বাকি প্রদেশ। কনফেডারেশনের দায়িত্ব ছিল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, যোগাযোগ এবং এইসব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব ক্ষমতা। প্রাদেশিক পরিষদগুলো ইউনিয়নের সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করবে এবং এই পরিষদ সদস্যরা তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে তাদের গ্রুপের সংবিধান প্রণয়ন করবেন। নতুন সংবিধানের অধীনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কোনো প্রদেশ তার গ্রপ পরিত্যাগ করে সরাসরি ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য হিসেবে অবস্থান নিতে পারবে। ক্যাবিনেট মিশন একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনেরও প্রস্তাব দেয়। এতে কংগ্রেসের ছয়জন, মুসলিম লীগের পাঁচজন এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ট রাজনৈতিক দলের দু'জন নিয়ে মোট তের জন সদস্য থাকবেন। যদিও এই নীলনকশায় পাকিস্তান দাবি পুরোপুরি মানা হলো না, তবুও মুসলিম লীগ সমঝোতার খাতিরে একে গ্রহণ করলো। ২৫ জুন একই দিনে কংগ্রেস ও এই প্রস্তাব গ্রহণ করলো। তাদের সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা সাংবিধানিক পরিষদের যোগ দিয়ে সংবিধান প্রণয়েনের অংশ নেবে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবে না। কিছুদিন পর কংগ্রেস সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে (১০ জুলাই) ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেস সাংবিধানিক পরিষদে সম্পূর্ন স্বাধীনভাবে সংবিধান রচনা করবে,

*Dhaka University Institutional Repository*

তাতে কোনো পূর্বতন চুক্তি বা সমঝোতা মানা হবে না এবং প্রতিটি সমস্যাকে সমাধানের জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরে বলেলেন যে, তাঁর মতে গ্রুপগুলো সংগঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং বিভিন্ন প্রদেশ শুরতেই গ্রুপ পরিত্যাগ করতে পারেবে। মুসলিম লীগের কাছে গ্রুপ ব্যবস্থা ছিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় মৌলিক বিষয় এবং এর প্রত্যাখ্যান ছিল গোটা পরিকল্পনা প্রত্যাখানের শামিল। একই সঙ্গে তারা দেখলেন যে, বড়লাট অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনে গড়িমসি করছেন, যদিও কথা ছিল যে কোনো দল গররাজি হলেও সরকার গঠন করা হবে।

মুসলিম লীগ পর্যবেক্ষণ করলো যে, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসও এই নীলনকশা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নি এবং গ্রপ ব্যবস্থা মানছে না; অন্য দিকে বৃটিশ সরকার এর বাস্তবায়নে ততো উন্মুখ নয়। এই হতাশার সম্মুখীন হয়ে ২৭ জুলাই কাউন্সিল সভায় মুসলিম লীগ ও এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করলো। পরিবর্তে তারা ১৬ আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ঘোষণা দিল। তাদের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণিত হেলা, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়, বৃটিশ দাসত্বের অবসান এবং পরিকল্পিত উচ্চবর্ন হিন্দু রাজত্বের মূলোৎপাটন'। দ্বিতীয়বারের মতো কংগ্রেসের একগুঁয়েমি এবং অদূরদর্শিতা অবিভক্ত ভারতের সম্ভাবনা বিষন্ন করলো। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম শিরী মওালানা আবুল কালাম আজাদ এই বিবয়ে মন্তব্য করেন, '১৯৩৭ সালের ভুলটি ছিল খুবই খারাপ। তবে ১৯৪৬ মালের ভুলটি হলো মারাত্মক।; এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর বিশ বছর পর। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক সরকার গঠনে মুসলিম লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন হতে পারলে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনেরই সম্ভাবনা রহিত হতো। ১৯৪৬ সালে গ্রুপ ব্যবস্থা মেনে নিলে অখন্ড ভারতে একটি শক্তিশালী কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো।

১৬ আগষ্টে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গার দাবানল জ্বালিয়ে দিলো। কলকাতার মুসলমানরা হিন্দুদের হাতে মার খেল। এর প্রতিক্রিয়া হোলো আরো মারাত্মক। অক্টোবরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা (বর্তানে কুমিল্লা) জেলায় দাঙ্গা বাধলো। মাসের শেষ দিনে ডবিহারের শুর হলো আরো রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। তারপর যুক্ত প্রদেশে। বছর শেষ হতে না হতে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে যে সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা বাধলো তা ছিল আরো পাশবিক এবং আরো ব্যাপক। জুলাই মাসে কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে। কিন্তু ২৪ আগষ্টে কংগ্রেস তাদের অভিমত বদলে ২ সেপ্টেম্বরে সরকার গঠন করলো। দাঙ্গার সময় দেখা গেল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্টমন্ত্রী সরদার বলভ ভাই প্যাটেলের মারপ্যাঁচে মুসলমান স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল এবং হিন্দু দাঙ্গাকারীরা সুযোগ গ্রহণ করছিল। বড়লাট ও মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে একই মতে পৌঁছলেন যে, মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যোগ দিলে মুসলমাদের ভালো হবে, সরকারি নিগ্রহ বল প্রয়োগে ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা পাবে। ২৬ অক্টোবরে মুসলিম লীগ অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা সদস্যদের মধ্যে কিন্তু কোনে সখ্য ছিল না। মুসলিম লীগ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে তফসিলি সম্প্রদায়

*Dhaka University Institutional Repository*

থেকে মনোনয়ন দিলে কংগ্রেস খুবই ক্ষুব্ধ হয়। লিয়াকত আলী খানের অর্থ মন্ত্রনালয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ সরদার প্যাটেল বরদাশত করতে পারলেন না। যাই হোক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহাল হলো। কিন্তু সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন ডাকাই গেল না। মুসলিম লীগ জানালো যে, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে সাংবিধান রচনা সম্ভব নয় এবং তারা কোনো অধিবেশনে অংশ নেবে না।

লন্ডনে বৃটিশ সরকারকে নিতান্তই আতঙ্কিত করে তোলে সম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতা ও বিস্তার । লর্ড ওয়াভেল একটি সর্বসম্মত সমাধান প্রচেষ্টার খোজে অটল থাকলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিলেন। লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করলেন এবং লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন এলেন নতুন বড়লাট হয়ে। মাউন্টব্যাটেনের অবিশ্রান্ত প্ররোরোচনা দেশ বিভাগের পক্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করলো। তবে সরদার প্যাটেলের যুদ্ধংদেহি মনোভাবই কংগ্রেসের মত পরিবর্তনের সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভুমিকা পালন করে। সর্বপ্রথম পন্ডিত নেহরুকে সম্মত করাতে হলো এবং তারপর সাড়াশি আক্রমণ শুরু হলো মাহত্মা গান্ধীর ওপর। মাহাত্মা গান্ধী মোটেই ভারতের বিভক্তি চান নি। তিনি এক সময় বলেছিলেন, ভারত বিভাগ হবে তার মৃতদেহের উপর। নেহরু ও প্যাটেলের চাপে অবশেষে মহাত্মা গান্ধীও রাজি হলেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবে ভারত ও পাকিস্তানের স্বতন্ত্র দুটি সাংবিধানিক পরিষদ বা গণপরিষদ। বাংরা ও পাঞ্জাব ভাগ হবে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের ভোটে। সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় সিদ্ধান্ত হবে গণভোটের মাধ্যমে। সীমানা নির্ধারণ করবে একটি কমিশন। এপ্রিল মাস থেকেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দি ২৭ এপ্রিল এর ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন এবং শরৎ বসু ও আবুল হাশিম দুজনে মিলে একটি স্বাধীন দেশের একটি কাঠামো তুলে ধরলেন। সোহরাওয়ার্দি মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সম্মতি আদায় করলেন এবং শরৎ বসু মহাত্মা গান্ধীর সম্মতি নিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ও এই ব্যবস্থায় কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকবালে পন্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস এতে ঘোর আপত্তি ওঠালেন। যখন ভারত বিভাগের নীলনকশা চূড়ান্ত হলো তাতে স্বাধীন বাংলার কোনো সুযোগ রইলো না। মে মাস শেষ হতে না হতে সংযুক্ত বাংলার সমাধি রচিত হলো। ২০ জুন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ বৈঠকে মুসলমান সদস্যরা বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করলেন। তবে হিন্দু সদস্যদের বিভাগের পক্ষে দাবি তোলায় তারা পাকিস্তানে যোগ দিতে মত দিলেন। ২৩ জুন পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের এই রকম সিদ্ধান্ত হলো। সিন্ধু ও বেলুচিস্তানেও পাকিস্তানে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সিলেটে ৬ ও ৭ জুলাইয়ের গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে অভিমত হলো ( ২৩৯,৬১৯,১৮৪,৯১৪) সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তানের দাবি উঠলো তবে তার কোনো অবকাশ না থাকায় গণভোটে ফলাফল পাকিস্তানের পক্ষে গেল। র‍্যাডক্লিফ সীমানা কমিশন ১৩ আগষ্টে লর্ড

Dhaka University Institutional Repository

রোয়েদাদ দিয়ে পাঞ্জাবে ও সিলেটে ভারতের পক্ষে সুযোগ করে দিল । ১৫ তারিখে দিল্লি-তে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম বড় লাট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। এর পূর্বে ১৪ আগষ্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের নতুন বড়লাট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন।

## ৭.৩ বিভক্তি পরবর্তী সংকট

শূন্যের কোঠা থেকে একটা দেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে যে চাপ পড়ে, সেটা ছিল অসহনীয়। কেন্দ্রীয় এবং পূর্ব বাংলা সরকারের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপন করতে হয়। ভারত থেকে আগত লাখ লাখ শরণার্থীর পুনর্বাসন ছিল একটা দুরূহ কাজ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ পাকিস্তানে ছিল খুবই সীমিত এবং এসবই বৃটিশ-ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে আমদানি করতে হতো। পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমার ভেতরে যেসব কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো, সেগুলো শুধু প্রক্রিয়াজাত করাই নয়, বরং সেসবের ব্যবহারও করা হতো ভারতের ভৌগোলিক সীমায়। সম্পর্কের এই ধরনটির পরিবর্তন করা ছিল একটা দুঃসাধ্য কাজ। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে দেখা দিলো ১৯৪৮ সালের কাশ্মির যুদ্ধ। অর্থনৈতিক জটিল সব সমস্যা, প্রতিরক্ষাগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একটি নতুন সরকার গঠনের উদ্যোগ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বিরাট এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এর মোকোবিলা করতে সমর্থ হন নি। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রায় একনায়সুলভ নেতৃত্ব। পাকিস্তানের ক'বছর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালি নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের রাজনীতিতে অবদান রাখার কোনো সুযোগ পান নি। বটবৃক্ষের নিচে লতাগুল্ম বেড়ে উঠবার সুযোগ পেলেও অন্য কোনো বৃক্ষ বা গাছ বেড়ে উঠবার সুযোগ পায় না। পাকিস্তানের রাজনীতি থেকেও এসব মহান নেতা বিতাড়িত হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পর লিয়াকত আলী খান তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন।

মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে সোহরাওয়ার্দি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু পাকিস্তান মুসলিম লীগের উর্ধ্বতন মহলের কায়সাজিতে তিনি পূর্ব বাংলায় মুখমন্ত্রী হতে পারলেন না। পরিবর্তে নমনীয় এবং অনুগত খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। এই হতাশা সোহ্‌রাওয়ার্দিকে উপমহাদেশের ব্যাপক বিশাল রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেয়। এই সময় ভারতের বিভিন্ন এলাকায় (বিশেষ করে বাংলা, বিহার ও পাঞ্জাবে) যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুর হয়, তার প্রশমনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যোগ দেন। মাহত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর সোহরাওয়ার্দি পাকিস্তান বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিষেধাজ্ঞার ফলে তাঁকে ঢাকা ছাড়তে হয়। কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উদ্যোগে তাঁকে জাতীয় রাজনীতি থেকেও সাময়িকভাবে অবসর নিতে হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর

*Dhaka University Institutional Repository*

গণপরিষদ সদস্যপদও কেড়ে নেয়া হয়। একটি বিরোধী দল গঠনে উদ্যোগী হয়ে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৪১ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে একমত হতে না পেরে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে পরাস্ত করে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন দেশভাগের সময় তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে পাকিস্তানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সামনে হাজির হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানাকে বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, বিশেষ করে কলকাতাকে পূর্ব পাকিস্তান অন্তর্ভূক্ত করার দাবি তোলেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগে তাঁর কোনো স্থান ছিল না। দেশভাগের পর কিছুকাল তিনি কলকাতায় অবস্থান করে শেষে ঢাকায় চলে আসেন। পাকিস্তানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি রাজনীতিবিদ ছিলেন, তাঁদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনো রকম ভূমিকা নিতে দেয়া হয় নি।

ঔপনিবেশিক বড়লাটের মতো রাজত্ব করতে থাকেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি একাধারে যেমন গণপরিষদের সভাপতি এবং সরকারি দল মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, তেমনি প্রধানমন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার এক সিদ্ধান্তে তাঁকে জাতির মহান নেতা হিসেবে (কায়েদে আযম) মন্ত্রিসভার গুরত্বপূর্ণ সব বৈঠকে সভাপতিত্ব করার অধিকার দেয়া হয়। এছাড়াও, তাঁকে যে-কোনো মন্ত্রীর মতামত নাকচ করার ক্ষমতাও রাখতেন। তদুপরি, প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে মন্ত্রণালয়ের যে-কোনো সচিবের কাছ থেকে যে-কোনো তথ্য দাবি করতে পারতেন। ১৯৪৮ সালে ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়। মৌলবাদী তমিজউদ্দিন খান হলেন গণপরিষদের নতুন সভাপতি বা স্পিকার। মুসলিম লীগের সভাপতি হলে লিয়াকত আলী খান। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে বড়লাট নিযুক্ত করা হলো। সংসদীয় গনতন্ত্রের ধারায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হলে নির্বাহী বিভাগের মুখ্য কর্তা এবং বড়লাট খাজা নাজিমউদ্দিন হলেন সংবিধান সম্মত রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি বছর পর ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তাঁর তিরোধানে রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হলো আরো গভীর এক শূণ্যতা ও অনিশ্চয়তা। মুসলীম লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং বড় বড় নেতা নানা ধরনের যড়যন্ত্রের লিপ্ত হলেন। অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ এবার কাঁধে তুলে নিলেন বড়লাটের দায়িত্ব। এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন দেশের শীর্ষচূড় আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গোলাম মোহাম্মদ এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাঞ্জাবের শক্তিশালী উপদলের নেতৃত্বে সমাসীন হলেন। তাঁরাই ঠিক করলেন যে দুর্বল প্রকৃতির ও

*Dhaka University Institutional Repository*

নমনীয় স্বভাবের খাজা নাজিমউদ্দিন হবেন প্রধানমন্ত্রী। একজন বাঙালি অন্তত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আর তাই দেখে বাঙালিরা তৃপ্তি অনুভব করতে থাকেন।

সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ পূর্ব বাংলার হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজধানী স্থাপিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালি রাজনীতিবিদরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা ধরনের ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দেন। এ জন্য যে দুটি বিকল্পের কথা ভাবা হয়, সেগুলো ছিল সিন্ধু প্রদেশের করাচি এবং সীমান্ত প্রদেশের এ্যাবোটাবাদ। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের করাচি এবং দফতরগুলো স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সশস্ত্র তিনটি বাহিনীর প্রধান দফতর স্থাপিত হয় করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান দফতর হয় করাচিতে। বাঙালি রাজনীতিবিদরা প্রথমদিকে এসব বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ করেন নি। পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন দুটি অংশের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত গণপরিষদ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং নিজেদের আসনে পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারত থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন করেন। পাকিস্তান গণপরিষদে মূলত ৬৯ জন সদস্য ছিলেন, যার মধ্যে ৪৪টি আসন ছিল পূর্ব বাংলার। পরবর্তীকালে আরো ১০টি আসন সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট সদস্য সংখ্যার পালা ভারি করা হয়। পূর্ব বাংলার। পরবর্তীকালে আরো ১০টি আসন সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট সদস্য সংখ্যার পালা ভারি করা হয়। পূর্ব বাংলার আসন থেকে ৭ জন পাকিস্তানি নেতাকে নির্বাচিত করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ (পরবর্তীকালে বড়লাট), একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ইশতিয়াক হোসেন কোরেশি (পরবর্তীকালে করাচি বিশ্ববিদ্যালরে উপাচার্য) এবং প্রখ্যাত মাওলানা সাব্বির আহমদ ওসমানি। মন্ত্রিপরিষদেও বাঙালি প্রতিনিধিত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত। পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ এবং এঁদের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালি। পরবর্তীকালে ৩ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করলে আরো ৭ জন নিযুক্তি লাভ করেন। এই মোট ১৩ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন বাঙালি। এছাড়াও আরো ৬ জন প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন, যার মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালি। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনে বাঙালিদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। প্রথম যুগে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল খুবই সীমিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারই ছিল সর্বেসর্বা। সরকার তখন মোটমুটিভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুসরণে পরিচালিত হতো। সেই আইনে যেসব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়, পাকিস্তানে তারও কিছু কিছু কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুক্ষিগত করে। উদাহরণস্বরূপ শিল্প খাতকে প্রাদেশিক দায়িত্ব থেকে কেন্দ্রীয় দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ক্ষমতা কেন্দ্রায়নের আরেকটি নজির হলো, বৃটিশ ভারতের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'- এর পূনর্বিন্যাস। বিভাগ-পূর্বকালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের যে প্রাদেশিক ক্যাডার ছিল, পাকিস্তানের একেবারে শুরুতেই তাকে পরিবর্তন করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসকে

Dhaka University Institutional Repository

একটি কেন্দ্রীয় ক্যাডার পরিণত করা হয়। এইসব অনাকাঙ্খিত ব্যবস্থার পরিণতি তারা উপলব্ধি করতে পারেননি কেননা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তান-প্রেমে খুবই অন্ধ ছিলেন।

### ৭.৪ জটিলতার আবর্তে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খাই ছিল ভিন্ন। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা ছিল একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তান ধারণার প্রতি পূর্ব বাংলার অঙ্গীকার ছিল খুবই দৃঢ়, পক্ষান্তরে ঐ ধারণার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের আনুগত্য তেমন পোক্ত ছিল না। দুই দেশের সমাজ-কঠামোও ছিল ভিন্ন। পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক মানসিকতা ছিল অনগ্রসর। পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল ছিল একটি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। অন্যদিক পূর্ব বাংলায় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করা ছিল একটি সহজাত প্রবৃত্তি। দেশের দুই অংশের দুইটি সমাজ ও মানসিকতার এই পার্থক্য সংবিধান রচনায় স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সংবিধান রচনার জন্য যে মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়, তার প্রথম দুইটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বাহ্যত দুটি মৌলিক বিষয়েই সমঝোতার অবকাশ ছিল না। বাঙালিদের দাবি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান শুধু উর্দুকেই সেই সম্মান দিতে রাজি ছিল। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূলনীতি কমিটির অন্তরবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, সেখানে পূর্ব বাংলাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়। এই প্রতিবেদনে দুইটি পরিষদের প্রস্তাব দেয়া হয় : নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত হবে এবং উচ্চ পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশের সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে। বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নস্যাৎ করা হয় দুই পরিষদকে সমান ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে।

দুই পরিষদেই পাকিস্তানের দুই অংশকে সমান প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হয় মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে । এই প্রতিবেদন নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে, কিন্তু মন্ত্রিসভার পাঞ্জাবি চক্রটি তাতে ঘোর আপত্তি জানায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং মুশতাক আহমদ গুরমানি এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে লিপ্ত হন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিয়া মমতাজ দৌলতানার প্ররোচনায় বিভিন্ন ইসলামি জনমত গঠনে লিপ্ত হন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিয়া মমতাজ দৌতানার প্ররোচনায় বিভিন্ন ইসলামি গৌষ্ঠী ধর্ম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করে। এই সুযোগ লাহোরে কাদিয়ানি-বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাদের দাবি ছিল যে, কাদিয়ানি গোষ্ঠীকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কাদিয়ানি সদস্য স্যার জাফরুল্লাহ খানকে বহিস্কার করা হবে, আর না হলে নাজিমউদ্দিন সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। পাঞ্জাবের আপত্তির মুখে এই প্রতিবেদন বস্তুতপক্ষে প্রত্যহৃত হয়। মুখ্যমন্ত্রী দৌলতানার প্ররোচনায় ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে লাহোরে কাদিয়ানি-বিরোধী দাঙ্গা বাধে। নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভা বাধ্য হয়ে সেখানে জারি করে সামরিক শাসন

Dhaka University Institutional Repository

এবং এর প্রতিবাদে দৌলতানা পদত্যাগ করেন। পাঞ্জাবি চক্র এই সাময়িক সঙ্কট মোকাবিলায় গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে এর বহিপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে। বড়লাট মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে।

### ৭.৫ গণতন্ত্র ধ্বংসের চক্রান্ত

বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ যখন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে বরখাস্ত করলেন, তখন থেকেই শুরু হলো পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক রীতি ধ্বংসর প্রক্রিয়া। গণপরিষদে খাজা নাজিমউদ্দিনের কোনো শক্ত প্রতিপক্ষ ছিল না এবং তিনি ছিলেন পরিষদের বৃহত্তম দলের নেতা। গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে বরখাস্ত করার জন্য একটা নতুন অজুহাত সৃষ্টি করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও অদক্ষতার অপবাদ তিনি আরোপ করলেন। কিন্তু পাকিস্তানের অপরিপক্ব রাজনীতিতে এইরকম স্বেচ্ছারিতার কোনো প্রতিবাদ হলো না। বস্তুতপক্ষে তখন থেকেই শুরু হলো সামরিক আমলাতানিন্ত্রক আঁতাতের কর্তৃত্ব। পাঞ্জাবি ক্ষমতাসীন চক্র গণতন্ত্রের ওপর এই অনাকাঙ্খিত আঘাতকে সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য একজন বাঙালি রাজনীতিবিদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। অবিভক্ত বাংলার সোহ্‌রাওয়ার্দি মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তখন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। তাঁকে ডেকে এনে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানো হলো। গোলাম মোহাম্মদ, মুশতাক আহমেদ গুরমানি ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর এই ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিলেন। সঠিকভাবেই তাঁরা বিবেচনা করেন যে, পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন মোহাম্মদ আলী সবসময়ই অনুগত থাকবেন। প্রায় ছয় মাসের মাথায় ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তাঁর সাংবিধানিক পস্তাব পেশ করলেন। নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পতিনিধিত্ব হবে এবং উচ্চ পরিষদে হবে প্রদেশের ভিত্তিতে। কিন্তু সম্মিলিত দুই পরিষদে থাকবে সমান সমান প্রতিনিধি, পূর্ব এবং পশ্চিম অংশ থেকে প্রত্যেকের ১৭৫ জন করে প্রতিনিধি থাকবে। মোহাম্মদ আলী এই প্রস্তাব 'বগুড়া- নিশতার সমীকরণ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এর ফলে যেন মনে হলো, বিদ্যমান সাংবিধানিক সঙ্কটের একটা সমাধান পাওয়া গেল।

প্রথম থেকেই জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে পূর্ব বাংলায় মুসলীম লীগ সরকার। ১৯৪৮ সালে জানুয়ারি মাসেই ছাত্ররা একটি সরকার-বিরোধী সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করে। মার্চ মাসে সূচিত ভাষা আন্দোলনের দুটো দিক লক্ষণীয়। একটি হলো মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অন্যটি হলো মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা করা। একই সঙ্গে আরো অনেকে সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিম্ন বেতনভূক্ত কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে কৃষকরা অন্যায় ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এইসব আন্দোলন ছিল জনগনের প্রত্যাশারই বিস্ফোরণস্বরূপ। কিন্তু সরকার যেভাবে জনগণের প্রত্যাশা-সম্পৃক্ত এইসব আন্দোলন-বিক্ষোভ-

*Dhaka University Institutional Repository*

সমাবেশ দমন করেন, তাতে করে তাদের জনপ্রিয়তা, বলতে গেলে, শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। ১৯৪৯ সালের শুরুতে পূর্ব বাংলায় প্রথম উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। টাঙ্গাইলের এই উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী তরুণ এক ছাত্রনেতা শামসুল হকের কাছে পরাজিত হলেন। মুসলিম লীগ সরকার এই ঘটনায় এতোটাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে যে, তাদের ছয় বছরের শাসনামলে আর দ্বিতীয় কোনো উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করার সৎসাহস দেখায় নি। আইন পরিষদের ৩২টি আসন শূন্য হলে ১৯৫৪ সালে যখন মুসলিম লীগ সরকারের পতন হলো।

সোহরাওয়ার্দির উদ্যোগে এবং তরুণ প্রগতিশীল নেতাদের উৎসাহে ১৯৪৯ সালে জুন মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিভাগ-পূর্বকালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলাম। তিনিই হলেন নবগঠিত এই রাজনৈতিক দলটির প্রথম সভপতি। সোহরাওয়ার্দির প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি নিখিল পাকিস্তান সংগঠনে পরিণত হয় এবং বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলায় ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে মুসলিম লীগ পরিণত হয় একটি পুরোপরি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে। জনগণের মধ্যে এ ধারণা জোরদার হতে থাকে যে, এই দলটি প্রদেশের মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে কিছু প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। একজন অত্যন্ত প্রতাপশালী মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীকে দুনীর্তির কারণে তাঁকে 'প্রোডা' বলে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিষিদ্ধ করে তার নিজের দল।

## ৭.৬ ভাষা আন্দোলনঃ জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। মূলত সাংস্কৃকি আন্দোলনের মকাধ্যমে এর সুচনা হলেওক্রমে এটি একটি রাকনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। দুই পর্বে বিভক্ত এ আন্দোলন ১৯৪৮ সালে অনেকটা শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হলেও ১৯৫২ সালে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। এ পর্যায়ে শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিহক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির প্রতি বৈষম্য প্ররিস্ফটিত হয়ে ওঠে। এর ফলে ভাষা আন্দোলন বাঙালী জাতিকে একক রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন করে তোলে। এভাবে অসাম্প্রাদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী তেনা উন্মোষ, নতুন

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব সৃষ্টি, উদার দৃষ্টি ভঙ্গির সূচনা, সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে নতুন পরিমন্ডলে নিয়ে যায়। ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতির পরবর্তীকালে সংগিঠিত প্রতিটি আন্দোলনে প্রেরণা আসে। ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাই বাঙালি জাতিকে স্বচবাধিকার আন্দোলনে দীক্ষিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংরাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়। সুতরাং বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের ফলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের মানচিত্রে।

### ৭.৬.১ পটভূমি

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট। ভাষা, নৃতত্ত্ব,ইতিহাস,ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগলিক পরিবেশ, খাদ্যভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কেবল ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় এক হাজার মাইলের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ( আজকের বাংলাদেশ) অন্তর্ভূক্ত করে অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। এই রাষ্ট্রের কর্ণধাররা প্রথমেই শোষণ ও বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয় বাঙালির প্রাণের বাংলা ভাষাকে। ১৯৫১ সালে পাকিস্ড়ানের প্রথম আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬০% বাংলা, ২৮.০৪% পাঞ্জাবি, ৫.৮% সিন্ধি, ৭.১% পশতু, ৭.২% উর্দু এবং বাকি ১.৮% ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিক। এখানে মোট ১০৪.৫৪% হওয়ার কারণ অনেকে নিজেদের দ্বিভাষী বলে উল্লেখ করেছে। এর থেকে দেখা যায় উর্দু ছিল পাকিস্তানি ভাষাভাষীর দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার ৪.৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৪.১৩ কোটি ছিল বাংলা ভাষাভাষী। এখানে ৯৮% বাংলা এবং ১.১% ছিল উর্দূ ভাষী। অথচ বাংলা ভাষাকে সর্ম্পূণ উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বেশ কিছু পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্য লালিত বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর এ আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পাকিস্তান সৃষ্টির ছ'মাস পেরুতে না পেরুতে তারা বাংলা ভাষার মর্যদা রক্ষার জন্য রাজপথে নামে যা ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় পর্বের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে। প্রতিষ্ঠা পায় বাংলার মানুষের মাত্রি ভাষার দাবি।

### ৭.৬.২ রাষ্ট্রভাষা বির্তক : উর্দু বনাম বাংলা

প্রথম থেকেই শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের মতো বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টির জন্য একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রওয়োজনীয়তা অনুভব করেন । পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা থেকে শুরু করে প্রভাবশালীদের বড় অংশ

*Dhaka University Institutional Repository*

ছিলেন উত্তর ভারত থেকে উর্দুভাষী। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, লিকায়ত আলী খান থেকে শুরু করে পাকিস্তানের উচ্চ পদবীধারীরা ছিলেন। মোহাজের। জিন্নাহ ও তার উত্তরসূরি লিয়াকত আলির মন্ত্রিসভাকে তাই 'মোহাজের মন্ত্রিসভা' বলা হতো। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৪৭-৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট ২৭ জন গভর্ণর জেনারেল প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রাদেশিক গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ১৮ ছিলেন মোহাজের। এদের আবার অধিকাংশের ভাষা ছিল উর্দু। পুর্ব বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী খাজা পরিবার ছিলেন উদউভাষী। যে কারণে প্রথম থেকেই শ্রেণী স্বার্থে তারা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন। এমনকি খাজা নাজিমুদ্দিন যিনি পূর্ব বাংলার উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন তিনি ছিলেন উর্দূভাষী। এছাড়া পূর্ব বাংলা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ইস্পাহানি, আদমজিসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত যারা মুসলিম লীগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তারা ছিলেন উর্দুভাষী। স্বভাবতই তারা ও পশ্চিম পাকিস্তানি গোষ্ঠী রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সর্বত্র নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এ ভাষাকে বেছে নেয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বহুদিন থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে চর্চা করায় তারা উর্দুর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রভাবশালী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানি হওয়ায় তারা সকলে এ ভাষার পক্ষে ছিলেন। তবে পূর্ব বাংলায় এর প্রতিবাদ ওঠে। কারণ পুর্ব বাংলায় কখনোই উর্দূ চর্চা হয়নি। বাঙালিরা গণতন্ত্র, সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি কারণে প্রায় ৫৫% জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবি করে। এর সঙ্গে জড়িতে ছিলেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। সব যুক্তি উপেক্ষা করে প্রশাসন, অর্থনীতির কেন্দ্রসহ পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রের রাজধানী স্থাপিত হয় করাচিতে। মুসলিম লীগের প্রভাবশলী অংশ সেখানে অবস্থানের ফলে স্বাভাবিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ এলাকা এবং পূর্ব বাংলা অবহেলিত এলাকায় পরিণত হয়। বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগের ব্যবহার, উন্নয়ন কর্মকান্ডের বড় অংশ পশ্চিমে সম্পাদনের ফলে বঞ্চিত পূর্ব বাংলাবাসীদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে শুধু শাসকের বদল হয়েছে। ব্রিটিশ শোষকের বদলে পাকিস্তানি শোষকের আবির্ভাব হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতি, প্রশাসনসহ চাকরি ও পদের ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চিত করার নীতি। উর্দুকে সরকারি ভাষা ঘোষণা, গণমাধ্যমে ব্যাপক উর্দুর ব্যবহার, সরকারী কর্মকান্ডে যেমন, মানি অর্ডার ফর্ম, টেলিগ্রাম ফর্ম, ডাকটিকেট, মুদ্রায় উর্দু ব্যবহার শুরু এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উর্দু ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হলো শিক্ষিত বাঙালিরা এর প্রতিবাদ জানায়। প্রথম থেকেই তাই বাঙালি ছাত্র ও নেতৃবৃন্দের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলা-আলোচনা, দাবি-দাওয়াতে বাংলা ভাষাকেও সরকারি মর্যাদা দানের দাবি তোলা হয়। শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়া বাংলা ভাষার দাবি।

Dhaka University Institutional Repository

### ৭.৬.৩ ভাষা বিতর্ক উৎপত্তি

উর্দু বনাম বাংলা নিয়ে ভাষা বির্তক দেখা দেয় পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই । ১৯০৬ সালে যখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগের এই অধিবেশনেরও এ প্রশ্ন ওঠে। তবে তখন পর্যন্ত এই সমস্যাটি তত প্রকট হয়নি। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ সভাপতি মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের একটি এদ্যাগ নিলে এ.কে.ফজলুল হকের বিরোধিতায় তা সফল হয়নি। তৎকালীন পুর্ব বাংলা সরকারের সময়ও ভাষা নিয়ে তেমন সমস্যা হয়নি। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের প্রক্কালে এ বিতর্ক মৃদুভাবে দেখা দেয়। কংগ্রেস নেতারা হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে পাল্টা ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ উর্দু ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে খুব ক্ষুদ্র অংশ হলেও বাংলার পক্ষে দাবি ওঠে। তবে ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় তখন ভাষা বিতর্ক নতুন রূপ নেয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশলী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এভং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য দেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়াও বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখন, বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন এভং বাংলার পক্ষে বক্তব্য দেন। পূর্ব বাংলায় ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পত্র পত্রিকায় মহতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে পূর্ব বাংলায় গঠিত বিভিন্ন সংগঠন ।

'গণআজাদী লীগ' নামে একটি আর্দশভিত্তিক সংগঠন '৪৭ এর জুলাই মাসেই কামরুদ্দীন আহমদকে আহবায়ক করে গঠিত হয় । এই সংগঠণ স্পষ্টভাবে বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে। পরের মাসে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষা বির্তক আরে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত 'তমদ্দন মজলিস' সভা-সমিতি ও লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। এ সংগঠনের উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' যার আহবায়ক মনোনীত হন নূরুল হক ভূঁইয়া। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশ্য কয়েকটি কমিটি গঠিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সভা ও স্মারকলিপির মাধ্যমে বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংবাদিক সংঘ সহ বিভিন্ন সংগঠন ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই বাংলার জনগণের দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষ সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারি কোনো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। ঢাকার বাইরেও এ আন্দোলনের প্রসার ঘটে। ঢাকায় ৬ ডিসেম্বর প্রতিবাদ মিছিল শেষে বিক্ষোভকারীরা মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করে। যদিও এ পর্যায়ে সরকার ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি উর্দুভাষী মোহাজেরদের বাংরা ভাবার পক্ষে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ১২ ডিসেম্বর এমনি একটি বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন বাঙালি ছাত্র আহত হন। ভাষা সৈনিক নুরুল হক ভূঁইয়া এই ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেসন," বাঙালিদের উপর অবাঙালিদের এটা যে অন্যায় হামলা ছিল তা সবার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়। বাঙালির মাঝে নিজেদের অস্তিত্ব, জাতীয় সত্তআ ইত্যদি সম্পর্কে সচেতনাত লক্ষ করা যায়। এর ফলে ভাষা আন্দোললন দ্রুত জনসমর্থন লাভ করে।" এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর সচিবালয়ের কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করে। ১৫ দিনের জন্য সভা-সমাবেশ নিবিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

### ৭.৬.৪ ভাষা সংগ্রামের যৌক্তিকতা

আপাতদৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের যে কারণ জানা যায় তা হচ্ছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্টা করা। এটি এর প্রধান কারণ হলেও বিষয়টি আরো গভীর এবং বিশ্লেষণ দাবিদার। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল বাঙালির সংস্কৃতির প্রশ্ন, ছিল তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নও। ভাষা আন্দোলনের নিম্নলিখিত কারণ চিহ্নিত করা যায়:

১। সাংস্কৃতিক কারণ : ভাষার ওপর আঘাত গুরো জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করা হয়েছিল। অতএব বাংলাদেশের মানুষের প্রতিক্রিয়ারও ছিল বেশ জোরালো। বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা গোড়াতেই তমদ্দুন মজলিস গঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সাংগঠনিক উদ্যেগ গ্রহণ করেন। তমুদ্দন মজলিসের উদ্যোগে ' ৪৭ সালেই ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর আগে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, ড.মুহম্মদ শহীদুল-াহ প্রমুখের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে একটি পুস্তিকা পকাশ করা হয়। সেখানে সেদেশর শীর্ষস্থানীয় পন্ডিতজনেরা কোনো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত তার বিস্তারিত বিবরণ তুরে ধরেন। পরবর্তীকালে পত্রপত্রিকাসমূহেও এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ফোরামেও বিষয়টি আলোচিত হয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে দাবিটি জোরালো ভাষায় উত্থাপিত হয়। পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের ও বেশি ছিল বাঙালি।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবতই তাদের ভাষা-সাংস্কৃতিক ছিল পাকিস্তানের মূল স্রোত। কিন্তু ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণী ও বিষয়ে ইচ্ছকৃতভাবে উদাসীনতা এবং অবজ্ঞা দেখালে বাঙালির আন্দোলন ও সংগ্রাম ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না।

২। অর্থনৈতিক কারণ ঃ ভাষা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈকিতক আন্দোলন হলেও এর পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশের কথা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব বাংলার বেশির ভাগ মানুষই ছিল একভাষী। তাদের একটা অংশ বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত ছিল এবং অনেকে চাকরি প্রত্যাশী ছিল। বিকাশমান এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাষাজনিত জটিলতায় নিজেদের অবস্থান হারানোর আশঙ্কায় ছিল। একই আতঙ্কে ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ব্যক্তিরাও। তারা পাকিস্তানের পক্ষে মতামত দিয়ে এখানে সরাকরি চাকুরতে যোগ দিয়েছিল। এদেরও বিপদগ্রস্থ হবার আশঙ্কা ছিল। সরকারের নিম্নপদস্থ এসব কর্মচারীদের একটা বড় অংশ বাস করত নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাকসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকায়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। এ সরকারি কর্মচারীরা অচিরেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে তাদের মধ্যে যে সচেতনাত জাগ্রত হয় তাই পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের দাবি আদায়ের আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমিতি গঠিত হয়। এরা পরবর্তী সময়ে সরকারের নিকট যেসব দাবি তুলেছিল তাতে অর্থনৈতিক বিভেদের প্রসঙ্গ উল্লেখ ছিল। শুধু সরকারি কর্মচারী বা চাকরি প্রত্যাশীরাই নয় নানাভাবে আতঙ্কিত হচ্ছিল ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত এবং সমাজের বিভিন্ন স্ড়রের মানুষ। তাদের সামনে অর্থনৈতিক বিভেদের কারণে ইতোমধ্যেই সৃষ্ট বঞ্চনার বিষয়টিতো ছিলই, একই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভাষা হারানোর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সার্বিক প্রভাবে পড়ার আতঙ্কও তৈরি হয়েছিল। উর্দুকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যম ঘোষণা করায় পূর্ব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এর প্রতিবাদ জানায়। মুসলিম লীগ সরকারের অযোগ্যতা ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলায় খাদ্যভাব দেখা দেয়। ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে এবং পরে ১৯৫১ সালে তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে জনগণ ব্যপকভাবে দুর্ভিক্ষের কবলে এ সময় সিলেটে, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং তা সশস্ত্র আকার ধারণ করে। সময়মনসিংহে টংক প্রথা, সিলেটে নানকার প্রথা, রাজশাহী নাচোলে সাঁওতাল কৃষকরা ব্যপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এভাবে কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে তার কারণ

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তা জনগণের রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত হয়। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনের নেপথ্যে কাজ করেছিল।

৩। রাজনৈতিক কারণ : শুরুতে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও অচিরেই এটি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে কংগ্রেস পার্টির সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টের গোড়া থেকে বাংলা ভাষার বিষয়টি নিয়ে দাবি উত্থাপন শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্টার পর থেকেই বাঙালির রাজনৈতিকভাবে অবহেলীত হচ্ছিল। যদিও পাকিস্তান প্রতিষ্টার আন্দোলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা এব ধরনের ঐক্যে আসতে পেরেছিরেন তথাপি স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া আধিপত্য এবং পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার বাইরে রাখার প্রচেষ্টা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভাষা আন্দোলনই ছিল প্রধান দাবি আদায়ের আন্দোলন যেখানে সব শ্রেণীর মানুষের ব্যপক সমর্থন ছিল। সুতরাং রাজনৈতকি নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও দাবি আদায়ের প্রতীক হিসেবে ভাষা আান্দালনের ওপর ঝুঁকে পড়ে। এমন একটা অবস্থায় বলাই বাহুল্য, ভাষা আন্দোলন একটি রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে।

### ৭.৬.৫ ভাষা আন্দোলনের বিকাশ ও বিস্তৃতি (১৯৪৮)

১৯৪৮ সালের প্রথম থেকেই ভাষা প্রশ্নে বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত অংশ বাংলা ভাষার পক্ষে সোচ্চার হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদের অধিবেশনের কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল সদস্যের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এর প্রতিবাদ করে প্রথমে ছাত্রসমাজ। ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহবান করে। ঐদিন হরতাল চলাকালে পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকে আহত হন। শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদের ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। শুধু ঢাক

Dhaka University Institutional Repository

নয় ঢাকার বাইরে সর্বত্র ১১ মার্চ হরতাল ও অন্যান্য দিনের কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ মার্চ নাজিমুদ্দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন।

তড়িঘড়ি করে তার চুক্তি সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। ১৯ মার্চ রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বৈঠক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে মতামত দেন। জিন্নাহর ২৪ মার্চ বক্তৃতার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত ছাত্ররা 'না' 'না' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলার ববস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদে রিরোধী দল এর প্রতিবাদ করলেও নাজিমুদ্দিন তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেননি। যদিও শেষ পর্যন্ত পরিষদে উত্থাপিত এই প্রস্তাবটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

১৯৪৮ সালে জিন্নাহর মৃত্যুর পর বিশেষত মার্চ মাসের পর হতে ভাষা আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্তিমিত থাকলেও বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ৮ এপ্রিল থেকে ১৮ দিন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট, মেডিকেল ছাত্রদের ধর্মঘট, জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চলে। ১৪ জুলাই পুলিশ ধর্মঘট করে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে গুলি চলাকালে ২ জন পুলিশ নিহত হয়। এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালে ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা এলে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানায়। লিয়াকত আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্য হতে আবার ও 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

### ৭.৬.৭ ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রবাব ফেলে। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলে যা নিম্নরূপ:

১। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ : ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠেনি। এর সঙ্গে তাদের জীবিকার্জনের প্রশ্নও জড়িত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই জনসংখ্যার

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি অমান্য করে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী, প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয়। শাসকদের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বেছে নেয়ার বাঙালিদের চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা হিসেবে বেছে নেয়ার বাঙালিদের চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতিসহ সর্বত্র বাঙালিকে বঞ্চিত করার পশ্চিমা মানসিকতা। তাই ভাষা আন্দোল বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিতজাতি তত্ত্বভিত্তিক জাতীয়বাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে তারা বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়। যার ফলশ্রুতিতে আজকের স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র।

২। প্রগতির সন্ধান লাভ : ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে সংশয় দেখা দেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির সম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গণপরিণদের হিন্দু সদস্যদের ভাষার পক্ষে যে কোনো প্রস্তাব-বক্তব্যের বিরোধিতা করেন মুসলিম সদস্যরা। মুসলিম লীগ ও শাসকচক্র চিরাচরিত ঐতিহ্যানুযায়ী ধর্মকে ব্যবহার করে ভাষা আন্দোলনকারী ও সমর্থকদের 'ভারতের দালাল','অমুসলিম','কাফের' বলে চিহ্নিত করেও আন্দোলন থামাতে পারেনি। ফলে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘদিন পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক বৃহৎ রাজনৈতিক দল তাদের দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করে। এ কারণে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংকট আগের তুলনায় কম ছিল। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে ভাষা সৈনিকরা সাম্পদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেন। এতে দেখা যায় যেসব জেলা, মহকুমা ও থানায় ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সেখানে চমৎকার সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রীতি বজায় থাকে যা আজো বিদ্যমান।

৩। নতুন রাজনৈতিক সমীকরণঃ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ৪টি পৃথক ভাবাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা লক্ষণীয় ছিল-১. মুসলিম জাতীয়তাবদী ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ আবার চারটি উপদলে বিভক্ত ছিল। ক) নাজিমুদ্দি-আকরম খান গ্রুপ, খ) সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ, গ) এ.কে ফজলুল হক গ্রুপ, ঘ) মাওলানা ভাসানী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপ। প্রথম উপদলটি ছিল কট্টর ও উর্দুর পক্ষে। বাকি উপদলগুলো ছিল বাংলার পক্ষে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই বাকি তিনটি উপদলই মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে। ২. আংশিক ধর্মরিপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় কংগ্রেস, এদের তেমন প্রভাব না থাকলেও এরা ছিল বাংলার পক্ষে। ৩. বিপ্লবী সামম্যবাদী ভাবধারার প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিষ্ট পার্টি। ৪. মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রগতিশীল গণআজাদী লীগ। শেষোক্ত দলগুলোও ছিল বাংলার পক্ষে। এরূপ রাজনৈতিক বিভাজন রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক মেরুকরণ ঘটায়। রক্ষণশীল মুসলিম তূস্বামী শ্রেণী প্রতিনিধিত্বকারী এবং পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ অনুগত নাজিমুদ্দিনের উপদলটি ছিল উর্দু প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। এর কারণ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ভেতর সর্বাধিক প্রভাবশালী সকলের মাতৃভাষা উর্দু। তাদের পেছনে শক্তি যুগিয়েছে এদেশে আগত উর্দুভাষী ভারতীয়রা (মোহাজের)। এদেশে উর্দুভাষী মোহাজেরদের মাধ্যমে উর্দু ভাষা প্রতিষ্টার চেষ্টা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়। বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেই বিদেশী বাষা উর্দুকে মেনে নেয়নি। জনগণের এই মানসিকতা উপলব্ধি করেই কংগ্রেস, আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণআজাদী লীগ, কমিউনিষ্টপার্টি তাদের নির্বাচনী কর্মসূচি ও দলীয় কর্মসূচিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ জনগণের এই মানসিকতা উপেক্ষা করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের জোয়ারে অনেক উদারপন্থী মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীরা ভাষা আন্দোলন ও আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। নিবিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সারির নেতারা আত্মগোপনে থাকায় দ্বিতীয় সারির নেতারা আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। এই পর্যয়ে অনেক শিক্ষার্থী আওয়ামী মুসলি লীগরে ছাত্র সগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে সংশ্লিষ্ট থেকে আন্দোলনে অংশ নেন। এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ওঠা ভাষার কারণে সম্ভব হয়েছিল।

৪। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নির্বাসন : ভাষার যৌক্তিক দাবির প্রতি বিরোধিতা, স্বৈরশাসন, বাঙালিদের অধিকারের প্রতি উপেক্ষা সর্বোপরি দলের নেতাদের শ্রেণী চরিত্রের কারণে এ দলটি জনবিচ্ছিন্ন হতে সময় লাগেনি। ভাষা আন্দোলনে দলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের ভুমিকা তাদের চরিত্র আরো উন্মোচিত করে। ১৯৫২ সালেই আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণতান্ত্রিক দল, ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণতন্ত্রী দল, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলমী মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। কমিউনিষ্ট পার্টি ফ্রন্টে যোগ না দিলেও কেউ কেউ আওয়ামী মুসলিম লীগরে টিকেটে প্রার্থী হন। সমাজবিজ্ঞানী রঙ্গলাল সেন লিখেছেন যে, ১০ জন কমিউনিষ্ট পাটির সদস্য আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগের পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের সমর্থক যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হয়। ৩০৯টি আসেনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ১০ টি আসন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন আইন পরিষদ নির্বাচনে তার এলাকায় সম্পূর্ন অপরিচিত তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন। তার মন্ত্রিপরিষদের অন্যন্য সদস্যদের পরণতি তার মতোই হয়। কারো কারো জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিমলীগ জয়ী হতে পারেনি। বরং এই দল পাকিস্তান আমলে বহুধাবিভক্ত হয়ে একটি দুর্বল সংগঠনে পরিণত হয়। মুসলিম লীগের মুখপাত্র দৈনিক আজাদ ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির জন্য যে ১০টি কারন চিহ্নিত করে তার প্রথমটি ছিল " বাংলা ভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নুরুল আমীন সরকারের দমননীতি।"

৫। স্বতঃস্ফূত অংশগ্রহণ : ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৫২ সালে আন্দোলন ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। ১৯৫২ সালের থাকলেও ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পরিস্থিতি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। স্বঃস্ফুর্ত প্রতিবাদে পরের দিনের গায়েবানা জানাজার পর ঢাকা শহরের পরিস্থিতির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারে নির্দেশ ছাড়াই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মহল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতঃস্ফুর্ত মিছিল রাজপথে নেমে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে জনতার বহু স্থানে সংঘর্ষ হয়। সারা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছিল প্রতিবাদ, মিছিল আর হরতালের শহর। ঢাকয় পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর মফস্বলে ছড়িয়ে পড়লেও সেখানে ও স্বতঃস্ফুত প্রতিবাদ, সমাবেশ হয়। প্রতিটি গণপরিষদ সদস্যদের পদত্যাগ, হতাহত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ , বিচার দাবি করা হয়। যেসব এলাকায় আন্দোলন তীব্র ছিল সেগুলো হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, রাজশাহী, পাবনা, যশোর। আন্দোলন শুধু শহরে নয় গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি। এই আন্দোলনে ঢাকার মতোই এই প্রথম কৃষক, শ্রমিক মেহনতী মানুষ যুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গবেষক বদরুদ্দীন উমর জোর দিয়ে বলেছেন, "পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশায় নিয়েজিত মেহনতি জনগণের সকল অংশ এ আন্দোলনে যতখানি ব্যাপক ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে এসেছিরেন, ততখানি অন্য কোথাও নয়।" বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের ভাষা আান্দোলন: অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান গবেষণা গ্রন্থেও একই মত পোষণ করা হয়েছে। আজাদ ও তার ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ৭১এর স্বাধীনতা যুদ্ধেও পটভূমি শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে একই মত পোষণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। সাম্প্রদায়িকতায় আঘাত : তরুন সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও মায়ের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায়র জন্য মেয়েরা রক্ষণলশীলতার প্রাচীর পেরিয়ে রাস্তায় নামে। ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অনেক ছাত্রীই প্রথমে গোপনে পোষ্টার লিখে, চাঁদা দিয়ে বা চাঁদা তুলে সহযোগিতা করতো। অবশ্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অনেক মেয়ে সরাসরি মিছিল মিটিং- এ ছেলেদের সঙ্গে অংশ নেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রথম শোভাযাত্রায় মেয়েরাই প্রথম ছিলেন। ১৯৪৮ সালে যশোর ভাষা সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন হামিদা রহমান। নারায়গঞ্জের আন্দোলনে অগ্নিকন্যা ছিলেন মগার্ন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম। মিছিলে, সমাবেশে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। এছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, দিনাজপুর, সৈয়দপুরে নারী সমাজের ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ভাষা আন্দোলনের ফলে এমনিভাবে প্রকাশ্যে মহিলাদের সভা-সমিতিতে, মিছিল যোগদান সমাজে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে। ভাষা আন্দোলনের পর পর রাজনীতি, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। যা ভাষা আন্দোলনের একটি উল্লেখ যোগ্য দিক।

৭। ভাষার সম্মান বৃদ্ধি : ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী পাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ পাকিস্তান ঘনপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব স্বয়ং মুসলিম লীগ পাস করে। যদিও গণপরিষদে তা বাধার সম্মূখীন হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের আগে এই বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোসণা করে। এচাড়া একই বছর গণপরিষদ পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলা এবং পার্লামেন্টে ইংরেজি ছাড়াও উর্দু ও বাংলায় বক্তব্য রাখার বিধান করা হয়। গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং এভাবে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালের সংবিধানেও একইভাবে বাংলাকে বহাল রাখা হয় যা পাকিস্তান আমলে আর পরিবর্তন করা হয়নি। এতে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও বাঙালির আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়।

৮। ভাষা বিকাশ : রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়। এ পথ ধরেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। সম্ভব হয় সংস্কৃতিক খন্ডিত ও বিকৃত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে তোলার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল জোরালো প্রতিবাদ। কবি, সাহিতকি, সাংস্কৃতিক কর্মীরা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হন। হাসান হাফিজুর

*Dhaka University Institutional Repository*

রহমান, শামসুর রহামন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক এবং আরো অনেকে কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে এগিয়ে আসে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) এই পালাবদলের স্বাক্ষরবাহী। আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথায় ও আলতাফ মাহমুদের সুরে রচিত হয় বাঙালির প্রাণের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তের রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী'। প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে রচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বাঙালি জাতিকে আত্মপরিচয়য়ের সন্ধান দেয় উর্দূ ও পাকিসস্তানি সাহিত্য ক্রমেই পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়। এভাবে ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে সমৃদ্ধ জাতি গঠনের পথ প্রসস্থ হয়।

৯। শহীদ মিনার নির্মান: শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরে রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় শহীদ মিনার গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় শহীদ মিনার।এই শহীদ মিনার শুধু শহীদরেদর স্মৃতিকেই অমরত্ব দেয়নি, প্রতিষ্ঠিত করেছে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এক উদ্দীপনা। মহীদ মিনারই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদ, বাঙালির সংস্কৃতি চর্চা ও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই কারণে মুক্তি যুদ্ধের প্রথম প্রহরেই পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে কেন্দ্রীয় শহীদমিনার সহ দেশের প্রায় সকল শহীদ মিনার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১০। স্বায়ত্তশাসনের দাবী : ভাষা আন্দোলকালে ও পরে বিভিন্ন লেখনি ও দাবি দাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাংলা ভাষা নয় বরং বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয়। ভাষা আন্দোলণ ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ক্রমে এর সঙ্গে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। গণপরিষদের পূর্ব বাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি নিয়োগ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। যুক্তফ্রন্ট এসব দাবিকে প্রথম জনসমক্ষে নিয়ে আসে। যা ষাটের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবিতে পরিস্ফুটিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে যা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। তাই বলা যায় যে, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন। তারই ফলশ্রুতি আজকের স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

## ৭.৭ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন

প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইউনিয়ন নির্বাচনে ১৯৫২ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। সলিমুল্লাহ হলে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট বিরাট ভোটের ব্যবধানে মুসলিম লীগ সমর্থিত ছাত্র গ্রুপটিতে পরাজিত করে। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। শেরে বাংলা তাঁর পুরনো দলকে পূনর্গঠিত করে নতুন নামকরণ করেন কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি)। নির্বাচনের ঘোষণা ছাত্রসমাজকে গঠনে ঘোষণা ছাত্রসমাজকে যুক্তফ্রন্ট গঠনে তৎপর করে তোলে। আওয়ামী মুসলিম লীগভুক্ত যুব সম্প্রদায়ও এই ব্যাপারে বিশেষ হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দি এবং শেরে বাংলার যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে মিলিত হয় আরো বেশ কয়টি ছোট ছোট রাজনৈতিক দল, যেমন, নেজামে ইসলাম, খেলাফতে রাব্বানি পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি। যুক্তফ্রন্ট প্রধানত প্রদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কায়েমের দাবি-দাওয়া সংবলিত ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। উক্ত ইশতেহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে এই ছিল ২১ দফার প্রথম দফা । এ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি দফা, ছিল, যেমন, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে শহীদদের পরিবারকে ভাতা প্রদান, একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধারণ ছুটি ঘোষণা এবং শিক্ষা সর্বস্তরে বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করা। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য একুশ দফায় ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র তিনটি দায়িত্ব রাখা হয়, যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা। একই সঙ্গে বলা হয় যে, দেশের দুই অঞ্চলে যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আরেকটি দফায় বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বল্পব্যায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ দাবি করা হয়। ভূমি সংস্কার, শিল্পোয়ন, সেচ ব্যবস্থার প্রসার এবং শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন লক্ষ্য এই ইশতেহারে অন্তভূক্ত ছিল। গণতান্ত্রিক আচরণ সমুন্নত করার খাতিরে নিয়মিতভাবে উপনির্বাচনের ব্যবস্থারও দাবি করা হয়। যদি তিনটি উপনির্বাচনে সরকারি দল পরাজিত হয়, তাহলে তারা পদত্যাগে বাধ্য থাকবে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক নির্বাচনের ছয় মাস আগে পদত্যাগ করে সার্বিক রাষ্ট্র ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করার অঙ্গীকারও এই ইশতেহারে সন্নিবেশিত হয়। অন্য একটি দফায় সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়া এবং যাবতীয় কালাকনুন রহিত করার প্রস্তাব রাখা হয়। প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কার্যক্রম এই ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি সুচিন্তিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করা হয় যা পাকিস্তানের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের ভরাডুবি হয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ১১টি আসনে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন। ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে শেরে বাংলা ফজলুল হক সরকার গঠন করেন। একেবারে সূচনাতেই যুক্তফ্রন্টভুক্ত দুইটি প্রধান অঙ্গদল আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার তিন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রথম অসুবিধা ছিল নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল; দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক প্রশাসনের অভিযোগ সহযোগিতার অভাব এবং সর্বশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন চক্রান্ত। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদানের নির্দেশ আমলাতন্ত্রের গড়িমসির কারণে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলো না। কর্ণফুলি জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং আদমজি শ্রমিক এলাকায় স্থানীয় ও অস্থানীয়দের যে দাঙ্গা বাধে, তাতে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ছিল। এইভাবে সার্বিক পরিস্থিতি বেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। তবে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনী সাফল্যে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলন। বিজয়ের একটা আনন্দ পরিলক্ষিত হতে থাকে সর্বত্র।

### ৭.৮ গণতন্ত্রের কবর রচনা

এই রকম অস্থিতিশীল এক অবস্থায় সামরিক বাহিনীর সমর্থনে রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খার সমাধি রচনায় লিপ্ত হন। এবারে সামরিক বাহিনী পর্দার অন্তরাল থেকে বীরদর্পে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো। ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি মির্জা দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করলেন। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ নয় বছরের টানা-হ্যাঁচড়ার পর পাকিস্তানে নতুন সংবিধান চালু হয়। যে প্রক্রিয়ায় সংবিধান গৃহীত হয়, সেটা শুভলক্ষণযুক্ত কিছু ছিল না। রাষ্ট্রপতি মির্জা সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে নানাভাবে ব্যাহত করতে তৎপর থাকেন। প্রথমেই স্থির হলো যে, ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচন হবে। এই তারিখ দুই দু'বার পরিবর্তন করে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত হয়। বিভাগ-পূর্বকালে ১৯৪৬ সাথে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৫৫ সালের মধ্যেই সব ক'টি প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই যুক্তি থেকেই রাষ্ট্রপতি মির্জা বারবার সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে চলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্ষমতাসীন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা তাঁর সঙ্গে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। যা কিছু বিপত্তি দেখা যায়, তার সবই ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে। ফেডারেল সরকারের রিপাবলিকান পার্টি এবং আওয়ামীলীগের কোয়ালিশনের ফলে মনে হয়, যেন নির্বাচনকে আর কোন মতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। পাশাপাশি এও মনে হয় যে, ক্ষমতাসীন হওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অগ্রগতিকে আর দেখা যাবে না।

*Dhaka University Institutional Repository*

রাষ্ট্রপতি মির্জা পাকিস্তানের প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আইউব খানকে দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করলেন।সামরিক শাসন জারির ফলে সংবিধান বাতিল হলো ১৯৫৮ এর ৭ই অক্টবর সবগুলো আইন পরিষদ বিলুপ্ত হলো এবং রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হলো। জনগণ রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন তৎপরতা এবং তাদের পারস্পরিক কোন্দলে অসন্তুষ্ট ছিল এবং দুর্নীতি ও চোরাচালানের ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু সামরিক শাসনের ঘোষনা তাদেরকে সাময়িকভাবে হতচকিত করে দেয়। ওপনিবেশিক শাসনের পদ্ধতির ব্যাপারে জনগনের সম্যক কোনো ধারণা ছিল না। ১৯৫৩ সালে লাহোরে কাদিয়ানি শাসন জারি করা হলেও, তার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। সংবিধান বাতিল করার ফরে দেশে আইনের শাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়লো। একই সঙ্গে বড় বড় শহরে সশস্ত্র বাহিনীর মহড়া বা কুচকাওয়াজ জনগণের মনে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার করলো। সামরিক শাসনের তিন দিনের মাথায় 'আইন-শৃঙ্খলা' ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে Laws Continuance in Force Order শীর্ষক আইন জারী করা হয়। সামরিক শাসনে আমলাতন্ত্রকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য একজন শীর্ষস্থানীয় আমলা আজিজ আহমদকে সাধারণ সচিব ও উপ-সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি মির্জা কয়েকজন বেসামরিক মান্যগণ্য ব্যক্তি এবং তিনজন জেনারেলকে নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। সামরিক সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, চোরাচালান রোধ এবং সার্বিক নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জনগণের মনে সামিরক শাসন সম্পর্কে যে আপাত ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, সেটা দূর হলো। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে জনগণের মনে স্বস্তির ভাব ফিরে এলো। কিন্তু গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার যে অপমৃত্যু হলো, সেটা তারা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারলো না। বলতে গেলে সাধারণ মানুষ সামরিক শাসনকে আপাতঃদৃষ্টিতে খুশির সঙ্গেই গ্রহণ করলো।

নির্বাচন নিয়ে কথা বলার অবকাশ থাকলো না। দেশে রাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হলো। মাস যেতে-না যেতেই আরেকটি বিরাট পরিবর্তন ঘটলো। রাষ্ট্রপতি মির্জাকে সেনাবাহিনীর নেতারা আর ক্ষমতায় রাখতে চাইলেন না। জেনারেলদের চাপে মির্জাকে বৃটেনে নির্বাসন দেয়া হলো। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সমগ্র দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইউব খান হলেন একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং অন্যদিকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। বস্তুতপক্ষে জেনারেল আইউব খান রাষ্ট্রপতি মির্জাকে সামরিক শাসন ঘোষণা করতে বাধ্য করেন; তাঁকে হুমকি দেন এই বলে যে, অন্যথায় তিনি নিজেই সামরিক শাসন ঘোষণা করবেন। পরবর্তীকালে জানা যায় যে, সামরিক শাসন জারি করার সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হয়েছিল ঐ বছরেরই ৩০ সেপ্টেম্বরে।

Dhaka University Institutional Repository

এক হিসেবে পাকিস্তানে বিদ্যমান যে রাজনৈতিক অবস্থার সোহরাওয়ার্দি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, সামরিক শাসন সেই অবস্থাকেই জোরালোভাবে পুর্নপ্রতিষ্ঠা করে। সামরিক শাসন একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে হত্যা করলো, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতার চৌহদ্দি থেকে বাঙালিদের বিতাড়িত করলো।এই সম্বন্ধে তারেক আলী বলেন, "যখন সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্র সামরিক শাসনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা বিভাগোত্তরকালে দেশ যে অবস্থা প্রায় অক্ষুণ্ন ছিল, তাকেই পুনরায় বহাল করে।"

## ৭.৯ স্বৈরশাসকের অবৈধ সংবিধান (১৯৬২)

### ৭.৯.১ পটভূমিঃ

১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারী পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা পরের মাসের ১৪ তারিখে আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার ৩দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচার প্রতি সাহাবুদ্দিনকে প্রধান করে সংবিধাণ প্রণয়নের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের দায়িত্ব ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধান ব্যর্থ হওয়ার কারণ নির্ণয় এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান বিষয়ে সুপারিশ করা। সংবিধান কমিশন সদস্যগণের ইচ্ছে ফেডারেশন পদ্ধতি প্রবর্তন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত কমিশন ফেডারেশন পদ্ধতির পক্ষে সুপারিশ করে। রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত ২২-৩১ অক্টোবর গভর্নরদের সভায় এ রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। সুপারিশে যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার, শক্তিশালী আইন পরিষদ, পাকিস্তানর এক অংশ থেকে প্রেসিডেন্ট, অন্য অংশ থেকে ভাই প্রেসিডেন্ট নিয়োগ, মৌলিক অধিকার, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের উভয় অংশ থেকে সমান সংখ্যাক প্রতিনিধি এবং মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বলবৎ ইত্যাদি সুপারিশ করে। সুপারিশগুলো আইয়ুব খানের মনঃপুত না হওয়ায় অবশেষে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য অস্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৪ মাস পর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সংবিধান ঘোষণা করেন। এ সংবিধান ৮ জুন কার্যকরী করা হয়। মূলত এই সংবিধান বাংলার মানুষের গোলামির জিঞ্জির।

### ৭.৯.২ প্রতিক্রিয়া ঃ

রাজনীতিবিদ ও ছাত্র সংগঠনের নেতারা এক 'অগণতান্ত্রিক' হিসেবে আখায়িত করেন ১৯৬২ সালের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত কমিশনের সুপায়িশ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান পূর্ব পাকিস্তানে কোনো উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সকল দল,

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যাখান করেন। তাঁরা ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনঃজীবিত করার দাবি জানান। রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্তেও ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ সমাবেশ, ক্লাস বর্জন অব্যাহত রাখে। ছাত্ররা নতুন সংবিধান ও শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৫ মার্চ সংবিধানের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হয়। সেই দিন ঢাক মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রদের সভায় সংবিধানের কপি পোড়ানো হয়। ২৪ মার্চ পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরর ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। ৩ দফা দাবির জন্য প্রথম দু'দফর সংবিধান বাতিল, পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি করে। এ ধর্মঘট ১২দিন চলে। সরকার ব্যাপকভাবে ছাত্র নেতা ও রাজনীতিবিদদের ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ ও ৬মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষনা দেয়। যদিও তখনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দিলের মুসলিম লীগ ও বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ নির্বাচনে অংশ নেয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ এ নির্বাচন প্রত্যাখান করে। মে মাসে রাজনৈতিক দলে কর্মকান্ড চালু হলে সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পার্লামেন্টারি শাসনের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিতে এসব দাবির প্রতিফলন ঘটে। যে কারণ আইউব খান ৬ দফার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। ৬ দফা প্রত্যেকটি দাবি ছিল ১৯৬২ সালের সংবিধান বিরোধী ।

## ৭.১০ ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনসাধারণের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্দোলনে এ অঞ্চলের ছাত্র ও যুব সমাজের ব্যাপক অবদান রয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অঙ্গ দল হিসেবে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৬২ সালের আইউব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলো গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ । বাবত্তি সালের আইউব বিরোধী আন্দোলন সাধানভাবে 'শিক্ষা আন্দোলন' হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন। '৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠে তা পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বিকশিত হয়।

**ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিঃ**

ছাত্র আন্দোলন বাংলার প্রতিষ্ঠার সাথে অতঃপ্রতোভাবে একাকার। ১৯৬২-১৯৬৪ সালের শিক্ষা আন্দোলন ছাত্র আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমসাময়িকা শিক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এ আন্দোলনের পটভূমি দু ভাগে বিভক্ত:

*Dhaka University Institutional Repository*

১। **শিক্ষা আন্দোলন:** ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষা আন্দোলন নামে খ্যাত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতি এ অঞ্চলের ছাত্র সমাজকে সরকার বিরোধী- আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাকিস্তান সরকাররের পরিকল্পনা ছিল পূর্ব বাংলায় শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করতে পারলে এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ স্তিমিত হয় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি দীর্ঘকাল টিকে থাকবে। তাই শুরু থেকেই সরকার পূর্ব বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূল নীতি অনুসরণ করতে থাকে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এই বৈষম্যের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। যেমন- ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে পূর্ববাংলায় প্রাথমিক স্কুল, ঐ সমস্ত স্কুলের শিক্ষার্থীর হার ছিল যথাক্রমে রাষ্ট্রের মোট সংখ্যার ৭৭.৮৯%, ৮০.৯৩%, ৭৮.৯৭%, কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে এসে তা হ্রাস পেয়ে দাড়ায় যথাক্রমে ৪৮.৯৩%, ৫৭.৬৮% ও ৬৩.৫৪% তেমনি মাধ্যমিক স্তরে ১৯৪৮-৪৮ সালে স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর হার ছিল যথাক্রমে ৫৭.২৬%, ৫৬.৩৮% ও ৫০.৪৭%। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে হ্রাস পেয়ে দাড়ায় যথাক্রমে ৪৮.৫০%,৩৯.৫৪% এবং ৩৭.৫৫% উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্বাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান অনগ্রসরতার ছিত্র সমভাবে হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে একটি ও দুটি। ১৯৬১-৬২ সালে দু'অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাড়ায় যথাক্রমে ৪টি ও ৬টি। অথচ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় বিশ্ববির্দ্যলয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬২০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ৬৫৪ জন। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে ৭১৪০ জন ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৯৪৬৪ জন। পূর্ব বাংলায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তাদের মাথাপিছু বরাদ্ধও ছিল অনেক বেশি। ১৯৪৭-৪৮ সালে থেকে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত শিক্ষা খাতে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণের পরও সরকার ১৯৬২ সালের শেষদিকে পাকিস্তানের যে নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করে তাতে পূর্ব বাংলায় শিক্ষার নিম্নগতিকে আরো ত্বরান্বিত করার কৌশল অনুসরণ করা হয়। ফলে এ অঞ্চলের সচেতন ছাত্র সমাজ তথা ছাত্র সংগঠনগুলো আইউব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।

**২। ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি :**

ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরপরই পূর্ব বাংলার কয়েকটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' উল্লেখযোগ্য। মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্টা, গনপ্রতিনিধিদের দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালিত রাষ্ট ব্যবস্থা, বিদেশী শোষণের অবসান প্রভৃতি ছিল এ সংগঠনের লক্ষ্য কিন্তু সরকারি দমননীতি ও নির্যাতনের মুখে ১৯৪৮ সালেই এ সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে গঠিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হল 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে এ সংগঠন গঠিত হয়। পরের বছর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে ছাত্র সংগঠনটি মূলত আওয়ামী মুসলিম লীগের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করতে থাকে। ১৯৫৫ সালের পর দু' সংগঠনের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 'পাকিস্তান কমিউনিষ্ঠ পার্টি' এবং পাশাপাশি এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে 'ছাত্র ইউনিয়ন' গঠিত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলার গণমানুষের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যুগপৎ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে ১৯৫২ সালে ভাষার দাবি নিয়ে পূর্ব বাংলায় সরকার বিরোধী যে দূর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তহার নেতৃত্ব দিয়েছিল এ অঞ্চলের ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্র সমাজ। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজ পূর্ব বাংলার যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জন্ম দিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ইতিবাচক ফলাফলের ওপর। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত নামেমাত্র গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলে ও১৯৫৮ সালে তারও অবসান ঘটে। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগরে ভরাডুবি সরকারি মহলকে গণতন্ত্রের প্রতি ভীতি জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া' ৫৪ সালের নির্বাচরেন পর পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবাদের যে ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয়, ক্ষমতাসীন দল তাতে ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে তা নস্যাৎ করার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়। তাই জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করে। সকল রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসে এ অঞ্চলের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো তথা ছাত্র সমাজ। সামরিক সরকার ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর কড়া নজর রাখলেও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং ১৯৬২ সালে সরাসরি সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।

### ৭.১১ ছাত্র আন্দোলন (১৯৬৩-১৯৬৪)

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা '৬৩ সালের প্রথম থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও কলেজ এমনকি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। মোনায়েম খানের গভর্ণর নিয়োগ এবং তাঁর বিশস্ত ড. ওসমান গণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দমন নীতি বেড়ে যায়। এছাড়া আইয়ুব ও সামরিক

*Dhaka University Institutional Repository*

শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রতিহত করতে তিনি পেশাদার বাহিনী হিসেবে পরিচিত ন্যাশনাল ছাত্র ফেডারেশন বা এস.এস.এফ, গঠন করেন। ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান এ বাহিনীকে ঢাকাবিশ্ববিদ্যলয়ের 'সন্ত্রাসের জনক' হিসোব অবহিত করেছেন। ১৯৬৩ সালে গঠনের পরই এ বাহিনী শুধু ছাত্রদের উপরই নয়, শিক্ষক, কর্মচারীদের উপরও ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। একই বছর জানুয়ারিতে ঢাকা পলিটেকনিক ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে ৯ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেয় হয়।

ছাত্ররা প্রথম থেকেই মোনায়েম খানকে প্রতিরোধের চেষ্ট করে। ১৯৬৩ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি রংপুর গেলে ষ্টেশনে গেলেই ছাত্ররা তাকে প্রবেশে বাধা দেয়। কনভেনশন মুসলিম লীগপন্থী ছাত্রদের বাধা দিলে সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়। এর প্রতিবাদে ১৫ জানুয়ারী রংপুরে হরতাল পালিত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাশশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়। পুলিশ রপাজশাহীতে ৬ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। রংপুরে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। পলিটেকনিক ছাত্রদের ঢাকা স্পেশাল জজ ১৪ জানুয়ারী মুক্তি দিলে ছাত্র আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়। তবে সরকার ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকদের শায়েস্তার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়। ঢাকা পলিটেকনিক, রংপুর ঘটনাসহ আইয়ুব ও মোনায়েম বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে ১৯৬৩ সালের প্রথম তিন মাসে পাইকরী হারে ছাত্রদের গ্রেপ্তার ছাড়াও বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের বিরদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকার কলেজ ম্যানেজিং কমিটিসমূহের কাছে এক গোপন সার্কূলার পাঠায়। যদিও এ উদ্যোগ তেমন সফল হয়নি। তবে মার্চে আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩১ মার্চ জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়।

চরম দমন নীতি সত্ত্বে ও ১৯৬৩ সালে ছাত্ররা ২৩১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালন করে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের দমনীতির কঠোর সমালোচনা করেন। জুন মাসে চট্টগ্রামে ফ.ম. চৌধূরীর ছাত্রদের আর 'লেখা পড়া শিখে লাভ নেই' মন্তব্যের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্রদের সঙ্গে একত্মতা ঘোষনা করে সাংবাদিকরা। বাংলাদেশ ছাড়িয়ে এ আন্দোলন করাচিতে পৌঁছে এবং অনশন ও ধর্মঘট হয়।

আইয়ুব ও মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন '৬৩ সালের মাঝামাঝি মধ্যেই ঢাকা, চট্টগ্রাম এছাড়াও পটুয়াখালী, চাঁদপুর ছড়িয়ে পড়ে। মোনায়েম খান যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই ছাত্ররা বিক্ষেভ, কালো পতাকা প্রদর্শন করেছে । অবশ্য এই অরাজকজতার মধ্যেও ১৯৬৩ সালে ডাকসুর নির্বাচন হয়। নির্বাচন এন.এস.এফ এর বিরদ্ধে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ প্যানেলে অংশ নেয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের রাশেদ খান মেনন এবং মতিয়া চৌধূরী

*Dhaka University Institutional Repository*

জয়লাভ করেন। মোট ৯৩টি আসনের মধ্যে ৮০ টি আসন ছাত্র ইউনিয়ন পায়। নির্বাচনে সরকারপন্থী এন.এস.এফ এর চরম ভরাডুবি শাসক মহলকে চিন্তিত করে তোলে। নির্বাচনের পর সরকারবিরোধী তৎপরতা আরো জোরদার হয়। ১৯৬৩ সালের এপ্রিলে সলিমুল্লাহ হলে একদল ছাত্র মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি সংসদ ও কার্যালয় থেকে অপসারণ করে। কায়েদে আযম কলেজ, সলিমুল্লাহ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ অনেক দিন বন্ধ থাকে। ১৯৬৩ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' ছাত্ররা মহাসমারোহে পালন করে। যদিও ছাত্রদের কর্মসূচিতে কোথাও কোথাও পুলিশ বাধা দেয়।

**১৯৬৩-১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের মূল্যায়ন**

১৯৬৪ সালে এসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এক সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৫-২২ মার্চ পর্যন্ত অবিরাম আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১৯ মার্চসংগ্রাম পরিষদের ডাকে এবং ছাত্রদের সমর্থনে ঢাকাসহ সারা দেশে হরতালের মাধ্যম 'ভোটাধিকার দিবস' পালিত হয়। ওইদিন বিকেলে পল্টন ময়দানে রাজনীতিবিদ ও ছাত্রদের জনসভা হয়। পুলিশ ঢাকা থেকে ২৩ জন ছাত্র এবং ৩২ রাজনৈতিক কর্মী এবং চট্টগ্রাম থেকে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে। ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর মোনায়েম খানের আগমনকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলন প্রবল রূপ নেয়। ঐইদিন ছাত্রদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশ এন.এস. এফ এর সহযোগিতা মোনায়েম কান সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়। পুলিশ ও এন.এস.এফ এর গুন্ডাদের হাতে বহু ছাত্র আহত হয়। রাতে ১৫০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার ছাড়াও ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের ৭৪টি কলেজ, ১৪০০টি উচ্চ বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। সারা দেশে ছাত্র গ্রেপ্তার হয় ১৪০০০জন। এছাড়া অনক ছাত্রদের ডিগ্রি বাতিল করা হয়। বিভিন্ন মেয়াদে বহিস্কার করা হয়। এসব ঘটনার প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২৯ মার্চ প্রতিবাদ দিবস এবং ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ৩০ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। এছাড়া বহিস্কারাদেশের বিরদ্ধে হাইকোর্টে রীট আবেদন করলে কোর্ট ৮ জুলাই ছাত্র বহিস্কার অবৈধ ঘোষণা করে। এসময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ও বন্ধ করে দেয় হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

আন্দোলনের এ পর্যায়ে ছাত্ররা আইয়ুব- মোনায়েমের বিরুদ্ধ ব্যাপক বিক্ষোভ, কর্মসূচী দেয়। ৬ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা সরকার বিরোধী ২২ দফা দাবি পেশ করে। সরকার ১৮ সেপ্টেম্বর প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। সরকারের দমনর নীতি সত্ত্বেও ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালনের মাধ্যমে সরকারি নীতির সমালোচনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের প্রতিবাদে ছাত্রদের সঙ্গে রাজনৈতিক দল, মহিলা সংগঠনগুলো আন্দোলনে অংশ নেয়। ২৯ সেপ্টেম্বর সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। এমনকি বাংলাদেশের ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে করাচিতে ছাত্ররা বিক্ষোভে অংশ নিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। স্কুল শিক্ষকরা ধর্মঘটের ডাক দিলে ৮ অক্টোবর হতে শিক্ষকদের গনহারে বরখাস্থ শুরু করে। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধিদল ও ছাত্ররা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সিম ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী দাঁড় করায় এবং তার অক্টোবরে থেকে প্রচারভিযানে নামে। একই সাথে এ বচছরের ডিসেম্বরে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঘোষণা করা হলে ছাত্ররা তা প্রত্যাখান করে। এভাবে ১৯৬২-৬৪ সাল পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন প্রকট রূপ ধারণ করে।

**৭.১২ ছয় দফা ও এগারো দফা কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ ও আকর্ষণ:**

ছয় দফা প্রচারিত হতে না হতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আপত্তির জোয়ার উঠলো। পূর্ব পাকিস্তানেও প্রথমে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শেখ মুজিব যখন ছয় দফা ঘোষণা করেন তখনও আওয়ামী লীগ বিধিসম্মতভাবে এই নীতিমালা গ্রহণ করে নি। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগ কমিটি ছয় দফা অনুমোদন করে এবং ১৮ ও ১৯ মার্চে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় তা গৃহীত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ কতিপয় আওয়ামী লীগ সদস্য এতে দলের কাজে নিস্পৃহ হয়ে যান। এই কাউন্সিলে নতুন কমিটিও গঠিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান হন সভাপতি, তাতেও কিছু পুরনো সদস্য ব্যথিত হন। ছয় দফার প্রচারে আওয়ামী লীগ যেমন ভূমিকা পালন করে তার চেয়ে উত্তম ভূমিকা পালন করেন প্রেসিডেন্ট আইউব। তাঁর আক্রমণ শুর হয় ঢাকায় ১২ মার্চ এবং পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে প্রতিদিনই তিনি ছয় দফার ওপর বক্তব্য রাখেন। চট্টগ্রামে এক জনসভায় ১৫ মার্চ তিনি বলেন যে, এটি একটি বীভৎস স্বপ্ন এবং যুক্তবাংলার পক্ষে একটি অবাস্তব কল্পনাবিলাস। তাঁর মতো, পাকিস্তান না ভারত কেউই স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইবে না। স্বাধীন বাংলা কোনোমতোই টিকে থাকতে পারে না। পাকিস্তান এই কার্যক্রমের মোকাবিলা করবে অস্ত্রের ভাষায়। ছয় দফায় তিনি এতোই বেকায়দায় পড়েন যে, তিনি একে প্রতিহত করার জন্য তার শাগরেদদের হুকুম দেন। এই সময়ে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশনের এক নৈশ ভোজেও আইউব ছয় দফা নিয়ে আলোচনা করেন। এটি একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং যারা এই কার্যক্রম দিয়েছে তারা দেশের ধ্বংস কামনা করে। এতে ভারতকে পূর্ব পাকিস্তান দখলে আহ্বান করা হয়েছে এবং এই ধারণাটির জন্মদাতা হচ্ছে ভারতীয় ও হিন্দু স্বার্থ। আইউবের মনকে ছয় দফা যেভাবে আবিষ্ট করে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

এই উপলক্ষে গৃহযুদ্ধের ঘোষণা দেন। আইউব কি সত্যি সত্যি এই কার্যক্রমের জনপ্রিয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন? না কি তিনি তাঁর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভিত্তি রচনা করেছিলেন?

পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থ ছয় দফায় নিতান্তই ভয় পেয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয় আর থাকবে না। এমন কি একটি নিশ্চিত বন্দি বাজারও আর পাওয়া যাবে না। প্রশাসন বা ব্যবসা-বাণিজ্যে এতো বড় একটি উপনিবেশ আর শোষণ করা যাবে না। সবচেয়ে বিপজ্জনক ইঙ্গিত পাওয়া গেল তা হলো অতিকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আশঙ্কা হয়ে ওঠে অসহনীয়। যেভাবে হোক তাকে রুখতে হবে। কিন্তু ওখানেই হলো সমূহ ভুল। আওয়ামী লীগকে তারা যতো দমন করতে গেল ততোই তাদের কার্যক্রমকে আরো জনপ্রিয় করে তুললো। তারপর যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা অপবাদ চাপানো হলো দেশে যেন ঘটলো বিস্ফোরণ। বক্তব্য-সাক্ষ্যতে বেরিয়ে এলো শোষণ ও অত্যাচারের ঘৃণ্য কাহিনী। আসামিদের জবানবন্দি হলো বাঙালিদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার। আইউবের পতন সত্যি হলো, কিন্তু ছয় দফা সফল হলো না। ১৯৭০- এর অবাধ নির্বাচনে ছয় দফা হলো বাংলাদেশের মহাসনদ বা ম্যাগনাকার্টা। নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ে অনাগ্রহ ও দুর্দশাগ্রস্থ লোককে সাহায্য করতে অনীহা আরো বুঝিয়ে দিল যে, বাঙালির সঙ্গে চলবার জন্য যে সহমর্মিতার প্রয়োজন পশ্চিম পাকিস্তানে তা মোটেই নেই। ১৯৭০-৭১-এর সাধারণ নির্বাচনে তাই ছয় দফা পেল ভোটদাতাদের ৮০ শতাংশের সমর্থন।

## ১১ দফার রূপ রেখা

১ম দফা: এ দফায় ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত ১৭টি দাবি উত্থাপিত হয়। যথা-

ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরনের নীতি পরিত্যাগ করা এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া।

খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করা এবং বেসরকারি উদ্যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দেয়া। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা।

গ) প্রদেশের কলেজসমূহের দ্বিতীয় শিফটে নৈশ ক্লাস চালু করা।

ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ভাগ হ্রাস করা। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে এসকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা।

*Dhaka University Institutional Repository*

ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন খরচার শতকরা ৫০ভাগ সরকার কর্তৃক সাবসিডি হিসেবে প্রদান করা।

চ) হল ও হোস্টেলের অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা।

ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করা। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকসংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিসহ বাক্ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা।

ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজ পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করণসহ মেডিকেল ছাত্রদের ও নার্সদের সকল দাবি মেনে নেয়া।

ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% কল বাতিল, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মেনে নেয়া।

ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দেয়া এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করে একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দেয়া।

ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে পৃথক 'ফ্যাকাল্টি' করা।

ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়া। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স' কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের অন্যান্য দাবি মেনে নেয়া।

ঢ) ট্রেন, স্টিমার ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড, দেখিয়ে শতকরা ৫০%ভাগ কম ভাড়ায় টিকিট দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোনো স্থানে যাতায়াতের সুযোগ দেয়াসহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অধিকসংখ্যক বাসের ব্যবস্থা করা। সরকারি ও আধা সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ৫০% কন্সেশন দেয়া।

ণ) চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা

ত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া।

*Dhaka University Institutional Repository*

থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল পূর্বক ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করা।

২য় দফা : প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। বাক্ স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর আরোপিত নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহার সহ সংবাদপত্রের স্বধীনতা নিশ্চিত করা।

৩য় দফা : এ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার সম্বলিত ৬টি দাবি উথাপিত হয়। যথা-

ক. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

খ. দেশরক্ষা,বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে নিরঙ্কশ ক্ষমতা প্রদান করা।

গ. দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন বিধান রাখতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডালের রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দু'অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

ঘ. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকার আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা দিবে এবং এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের ওপর বাধ্যতা মূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

ঙ. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্টে বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসেব থাকবে এবং এক্ষেত্রে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারে নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করবে। দেশ-জাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমদানি রপ্তানি চলবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বহি-বিশ্বের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন এবং আমদানি রপ্তানির করার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর হাতে থাকবে।

চ. পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানসহ পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করা।

৪র্থ দফা ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান,উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান পুর্বক সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫ম দফা ঃ ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ দফা ঃ কৃষকের ওপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করা এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করা। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা এবং তহশিলদারের অত্যাচার বন্ধের ব্যবস্থা করা সহ পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা ধার্য করা এবং আখের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।

৮ম দফা ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারে ব্যবস্থা করা।

৯ম দফা ঃ জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।

১০ম দফাঃ সিয়টো, সেন্টো,পাক-মার্কিন চুক্তি বাতিল পূর্বক জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা।

১১তম দফা ঃ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পারোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা মামলাসহ রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করার দাবি।]

## ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন বিস্তার

এগার দফার দাবিগুলোতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের দাবি সন্নিবেশিত হওয়ার ১৯৬৯ এর জানুয়ারি মাসে যখান ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহযোগিতায় গঠিত ছাত্র সংগ্রাম কমিটি আন্দোলনের ডাক দেয় তখন সারা দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। দেশের জনমত তখন এমন তীব্রভাবে আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছিল যে জানুয়রির (১৯৬৯) তৃতীয় সপ্তাহে সরকারি ছাত্র সংগঠন হিসেবে পরিচিত এন. এস.এফ দলে ভাঙ্গন ধরে এবং এর একাংশ এগার দফা আন্দোলনে যোগ দেয়। উনসত্তরের গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল মুলত জানুয়ারী মাসের মাঝা মাঝি থেকে এবং ফেব্রুয়ারীর ২২ তারিখ আগর তলা মামলা প্রত্যাহার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি যখন এগার দফাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার সাথে যুক্ত হয় ডাক এর আট দফাভিত্তিক আন্দোলন । উভয় পক্ষ ১৭ জানুয়ারি আগারতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস আহবান করে। ওইদিনে সরকার দেশে ১৪৪ ধারা জারি করে। তা সত্ত্বেও ডাক মিছিল নিয়ে বার লাইব্রেরির দিকে অগ্রসহর হয় এবং পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। অপরদিকে সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের বট তলায় সভা আহ্বান এবং ছাত্ররা মিছিল বের করলে পুলিশ লঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রায়ট কার থেকে লাল রঙের পানি নিক্ষেপ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এর প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি ঢাকা ও সারা পূর্ব বাংলায় ছাত্র ধর্মঘটের আহবান করা হয়। ওইদিন ছাত্ররা পুলিশের বাধা অমান্য করে মিছিল বের করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে একজন পুলিশ অফিসারের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন।

*Dhaka University Institutional Repository*

আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্র ও গণআন্দোলন আরো তীব্র রূপ লাভ করে। এর প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক দিনই হরতাল, প্রতিবাদ মিছিল চলতে থাকে। সরকার আন্দোলন স্তিমিত করতে পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া। অধ্যাপক রঙ্গদাস মতে, গণআন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানে নিহত হয় ১০০ জন।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসও ছিল ঘটনাবহুল এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক উত্তপ্তকর অবস্থা।

পূর্ব পাকিস্তানের ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে তখন ১ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান বিরোধী দলীয়

রাজনীতিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টনের জনসভায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টনের জনসভায় আগরতলা মামলাসহ সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি এবং সকল কালো আইন বাতিলসহ আন্দোলনে নিহতদের পরিবারে জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ১২ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করে চলে যান এবং ঘোষনা দিয়ে যান যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। তাঁর এরূপ ঘোষনার কারণে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এর প্রতিবাদে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডাক -এর আহবানে সমগ্র পাকিস্তনে হরতাল পালিত হয়। ইতোমধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আগর তলা মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা এবং ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যার প্রতিবাদে পুর্বে পাকিস্তানে গণআন্দোলন গণঅভুত্থানে রূপ লাভ করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কৌশলগত কারণে ১৭ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষনা করেন। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্বনতি না হওয়ায় অগত্যা ২২ ফেব্রুয়ারী 'ফৌজদারী আইন' প্রত্যাহারপুর্বক আগরতলা মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলার আসামীদের নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানকরে এর মধ্যদিয়ে এগার দফা আন্দোলনের একটা বড় লক্ষ্য অর্জিত হয়। কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৩ ফেব্রুয়ারি সর্ব দলীয় ছাত্র-জনতা এক সম্বর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভুষিত করে।

২২ ফেব্রুয়ারী পর থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অনেকটা নমনীয় নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে সমঝোতার লক্ষ্যে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। পুর্বপাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সর্বদা ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক দাবিতে অনড় থাকেন। অবশেষে ১০ মার্চ আইয়ুব খান এক গোলটেবিল বৈঠকে সংসদীয় নির্বাচন সংক্রান্ত দাবির প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বস্তুত আইয়ুব খানের পদত্যাগের মধ্যদিয়েই ১১ দফাভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানের বিজয় সুচিত হয়। এরপরও ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন অব্যহত থাকে। তবে আন্দোলনের গতি অহিংসরূপে অগ্রসর হয় এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক সাধারন নির্বাচন ঘোষনা পযন্ত (১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ) তা অব্যাহত থাকে।

## ৭.১৩ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আইউব রাজনীতিবিদদের পছন্দ করতেন না। তিনি বস্তুতই একটি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে চান। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি বিশেষ বিরোধিতা আশা করেন নি। বেলুচিরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের কঠোর হাতে দমন করেন। পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের দল আওয়ামী লীগ তাঁর খুবই অপছন্দ ছিল। ৭ অক্টোবর সামরিক আইন জারি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকশ' নেতাকে গ্রেফতার করা হয়, যাঁদের মধ্যে কিছু আমলাও ছিলেন। মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবও গ্রেফতার হন ১২ অক্টোবর। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে মওলানা ভাসানীকে কারামুক্ত করে নজরবন্দি করা হয় এবং ১৯৬২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই ছিল তাঁর অবস্থান। এ এই সময়ে তিনি আইউবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবং নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন। শেখ মুজিব মুক্তি পেলেন ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু তারপর শুরু হলো তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দিয়ে জুলুম। এক সময় আইউব তাঁর জীবিকা নির্বাহের পথও বন্ধ করতে সচেষ্ট হন। শেখ মুজিব তখন আলফা বীমা কোম্পানিতে চাকরি করতেন; আইউবের ইঙ্গিতে এই কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলে। এ ক্ষেত্রে প্রদেশপাল জেনারেল আজমের স্বতোপ্রবৃত্ত হস্তক্ষেপে এই অনাচার বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছয় দফা ঘোষণার পর আইউব শেখ মুজিবের পেছনে লাগেন এবং ১৯৬৬ সালের মে মাসে তাকে গ্রেফতার করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারী আইউব সরকার নাটকীয় ঘোষণা দেয় যে, সরকার একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই ঘোষাণায় বলা হয়, ভারতীয় সামরিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় কতিপয় বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এর আগে পহেলা জানুয়ারিতে এক গুরুত্বহীন সংবাদে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলার খাতিরে আঠাশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয। ৬ জানুয়ারির ঘোষণায় এই আঠাশজনের নামও প্রকাশ করা হয়। এরা ছিলেন কতিপয় রাজনৈতিক কর্মী, দুইজন উর্ধ্বতন আমলা, কতিপয় সামরিক অফিসার ও অন্যান্য সৈনিক। ১৮ জানুয়ারি পরবর্তী ঘোষণায় এঁদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং তাঁদেরকে আর্মি, এয়ারফোর্স

Dhaka University Institutional Repository

ও নেভি আইনে সামরিক হাজতে নেয়া হয়। এই দিনেই শেখ মুজিবুর রহমানরেক এই মামলায় জড়ানো হয়। স্মরণ করা যায় যে, তাঁকে ১৯৬৬ সালের ৯ মেতে ডিফেন্স অব পাকিস্থান আইনে গ্রেফতার করা হয়। ষড়যন্ত্রের গল্পটি ছিল যে- ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একজন নেভি অফিসার লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন শেখ সাহেবের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছেদের কথা আলোচনা করেন। এই অফিসার এবং আরো কতিপয় ব্যক্তি ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে পি এন ওঝা নামের একজন কুটনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ষড়যন্ত্রকারীরা ভারতীয় সামরিক অফিসার লে. কর্নেল মিশ্র ও মেজর মেননের সঙ্গে ভারতের আগরতলায় দেখা করেন। গোটা গল্পের ভিত্তি ছিল এগারোজন রাজসাক্ষীর বয়ান এবং একজন রাজসাক্ষীর কাছে পাওয়া কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ব্যক্তিগত ডায়েরি। মজার ব্যাপার হলো যে, এই ডায়েরিতে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম নেতা সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখেন অথচ এই ডায়েরিটি ছিল একজন রাজসাক্ষীর হেফাজতে। আর একটি মজার ব্যাপার হলো, পুরো ষড়যন্ত্র ছিল নিম্ন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে, যাঁদের অনেকেই ছিল অবসরপ্রাপ্ত। এতো বড় একটি অভ্যুত্থানের জন্য এতো নিম্ন শ্রেণীর প্রস্তুতি! মামলাটি এমনভাবে সাজানো হয় যে, প্রধান কৌসুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিল মনজুর কাদেরকে নাকি গোটা গল্প ও কৌশল বদলাতে হয়। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে এই বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়। প্রথমেই কতিপয় সামরিক ব্যক্তি ও দু'জন সিএসপি অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি তখন খুবই গোপনীয় ছিল এবং দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া আর কেউ কিছুই জানতো না। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান আকবর বিষয়টি অনুসন্ধান করেন ও মামলা তৈরি করেন। এই ব্রিগেডিয়ারই পরবর্তীকালে বাংলাদেশে গণহত্যা বিষয়ে ইয়াহিয়ার শ্বেতপত্রের মিথ্যাচারের রচয়িতা ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার আকবরের ষড়যন্ত্র মামলার কল্পকথাও ইয়াহিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় (তখন তিনি সেনাধিনায়ক) লালিত হয়। ইয়াহিয়া শুরুতেই শেখ মুজিবকে এই মামলায় জড়াতে চান। কিন্তু প্রথম যখন বিষয়টি উচ্চপর্যায়ে আলোচিত হয় তখন এই ধারনাটি বাদ দেয়া হয়। এই আলোচনায় অংশ নেন দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রিয়ার এডমিরাল এ. আর. খান, আইন মন্ত্রী এস এম জাফর, স্বরাষ্ট্র সচিব এবি আওয়াল, সেনাধিনায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, গোয়েন্দা প্রধান ব্রিগেডিয়ার আকবর, তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও তথ্যসচিব আলতাফ গওহর এবং প্রেসিডেন্ট আইউব ও তাঁর মুখ্যসচিব। মামলা সাজানোর পর বেসামরিক গোয়েন্দা প্রধান এন.এ. রাজভিকে মামলা পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা হয়। ডিসেম্বরে যেদিন প্রথম ধরপাকড় শুরু হয় সেদিন আইউব খান প্রদেশপাল মোনেম খানসহ দক্ষিণ বাংলায় হাওয়াই সফরে যান এবং এই সফরকালেই প্রেসিডেন্ট আইউব মোনেম খানকে এই বিষয়ে অবহিত করেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

এতে কোন ভুল নেই যে, বাঙালিরা পাকিস্তানের শুরু থেকেই শোষিত হয় এবং তাই ক্রমে ক্রমে পাকিস্তান বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যেসব সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী পশ্চিম পাকিস্তানে কাজ করতো তাঁরা একটু বিশেষভাবে এই বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন হতো। সামরিক বাহিনীতে বৈষম্য ছিল খুব বেশি এবং পাকিস্তানিরা নিম্নপদস্থ বাঙালিদের খুব হেনস্থা করতো। স্বাভাবিকভাবেই তাই যে কোনোভাবে পাকিস্তানের কুক্ষি থেকে মুক্তির বাসনা বাঙালি সরকারি চাকুরে মহলে ছিল অত্যন্ত প্রকট; রাজনীতিবিদদের চেয়ে কয়েক ধাপ ওপরে। অবশ্য সামরিক অফিসার মহলে এইসব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ব্যক্তিরও কোনো অভাব ছিল না। অনেকেই দেশের রাজনীতি বা অর্থনীতির গতিবিধি নিয়ে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ ও নিরুৎসাহী তবে কিছু বাঙালি সামরিক ব্যক্তি যে দেশ বিভাগের জন্য উদগ্রীব ছিল তা অনস্বীকার্য। তাঁদের অনেকেই রাজনীতিবিদ বা আমলাদের কাছে অন্যায় সমর্থন আদায় করে মানসিক শান্তি পেতে। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো আর এক ধাপ এগিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। তবে একটি রীতিমতো বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্র ছিল পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর বানোয়াট কাহিনী। দুই অঞ্চলের বৈষম্য নিয়ে আলোচনা হলে স্বভাবতই বিচ্ছেদের প্রশ্ন সামনে এসে পড়তো এবং এতে সচেতন খুব কম বাঙালিই সমর্থন দিতে বিরত থাকতো। কিন্তু এরকম আলোচনা এবং বস্তুত একটি সশস্ত্র বিপ্লবের নীলনকশার মধ্যে দূরত্ব ছিল বিরাট। কিন্তু সরকার-বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য উর্বর-মস্তিষ্ক পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী আগরতলা ষড়যন্ত্র বস্তুতই আবিষ্কার করে। সামরিক আইন জারি হওয়ার পর ভারতের সাহায্যে দেশ স্বাধীন করার কথা কোনো কোনো মহলে আলোচিত হয়। কিন্তু শেখ মুজিব তাতে সাড়া দিতে বিরত থাকেন। ১৯৬৩ সালে আবার যখন আইউব-বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে তখন নাকি শেখ মুজিব আগরতলা গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ঘটনার সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কোনো সংযোগ গোয়েন্দা বাহিনীও করে নি। মামলার আর একটি দুর্বলতা ছিল যে, ষড়যন্ত্রকালের পুরো সময়টিই শেখ মুজিব বন্দিশালায় ছিলেন বলে এর পরিচালনায় তাঁর অবদান প্রমাণ করা কষ্টকর হয়। সর্বোপরি পুরো মামলা ছিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত এগারোজন রাজসাক্ষীর বক্তব্য ভিত্তিক। উন্মুক্ত আদালতে তাঁদের অনেকেই তাঁদের স্বীকারোক্তি জোর করে আদায় করা হয়েছে বলে দাবি করেন এবং একজন (কামালুদ্দিন) তো রীতিমতো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন। আদালত তাঁকে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করে ও মুক্তি দেয়। এই ষড়যন্ত্র মামলার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির কাজ শুরু হয় ছয় দফা ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আইউব খান যেভাবে ছয় দফার পেছনে লাগেন তাতে তাকেই এই ষড়যন্ত্র মামলার হোতা বলে বিবেচনা করা যায়। ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে আইউব বলেন, বিদেশীদের প্রভাবে বাঙালি আমলারা সব বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে যাচ্ছে। এরই জের টেনে ১৯৬৭ সালের

Dhaka University Institutional Repository

৪ জানুয়ারী তিনি বলেন, হিন্দুদের হাতে মুসলমানরা যেভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে সেই ইতিহাস ভালো করে সামনে নিয়ে আসা উচিত; তা হলে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারায় বাধা আসবে। ১৯৬৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের অধিবেশন হয়, ঐ সময়েই আগরতলা মামলার ধরপাকড় শুরু হয়। এই সভায় বৈষম্যের কথা ওঠায় আইউব অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং বলেন, বৈষম্যের কথা বলে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা প্রচার করা হয় এবং এটা কঠোরভাবে দমন করতে হবে। তিনি এতোই চটে গিয়েছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয় নুরুল আমিন বা ড. মির্জা নুরুল হুদা সত্যিকারভাবে কি এক পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন। আইউব অনেক দিক দিয়ে অগ্রসর দেশনেতা ছিলেন কিন্তু বাঙালিদের সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা ছিল প্রচন্ড এবং আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতা ছিল তাঁর পরিচয় চিহ্ন। আগরতলা ষড়যন্ত্র যেদিন মন্ত্রীসভায় প্রথম আলোচিত হলো তার দু'একদিনের মধ্যেই আইউব অসুস্থ হয়ে পড়েন। যদিও মার্চ মাসে তিনি সুস্থ হন কিন্তু রীতিমতো কাজ শুরু করতে এপ্রিল পেরিয়ে যায়। আগরতলা মামলা নিয়ে আইউব তাঁর বাঙালি মন্ত্রীদের ওপর খুব ক্ষুন্ন ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, তাঁরা সাহস করে কেউ কিছু বলছেন না। তাঁদের অবশ্য দোষ বড় ছিল না, কারণ তাঁরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না। এই মামলা সম্বন্ধে একমাত্র সামরিক বাহিনীই ছিল খুব উৎফুল্ল। তাদের ধারণা ছিল যে, তাদের স্বাক্ষ্যপ্রমাণ অকাট্য, মামলায় সব আসামির শাস্তি হবে এবং রাজনৈতিকভাবে সরকারের বিরোধীতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মামলা ঘোষণার পর যে থমথমে ভাব ও ভীতির সঞ্চার হয় তাতে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিবাদ গড়ে উঠলো না। প্রথম প্রতিবাদ উঠলো প্রবাসী বাঙালি মহলে যুক্তরাজ্যে এবং তারপর ছাত্রমহলে এবং প্রকাশ্য বিচারের দাবি উঠলো। প্রকাশ বিচার সরকারও চায়, কারণ তারা মনে করে এতেই বিরোধী দলকে ভালো করে ঘায়েল করা যাবে।

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকার সেনাছাউনিতে মামলা শুরু হলো, প্রচারের জন্য বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমকে দাওয়াত করা হলো। সূচনা বক্তব্য হলো বিস্তৃত। সরকার মনে করে যে, এমন বিবৃতি জনগণকে বিরোধী শক্তির শত্রুতে পরিণত করবে, ষড়যন্ত্রকারীদের তারা ঘৃণা করবে। সামান্য বিরতির পর শুরু হলো সরকারি স্বাক্ষীদের পরীক্ষা। রাজসাক্ষীরা যখন বৈরী হতে থাকলো তখন কিন্তু প্রতিবাদ সোচ্চার হতে থাকলো। মওলানা ভাসানীও প্রতিবাদে শামিল হলেন। প্রচার বস্তুতপক্ষে সরকারের উল্টোদিকে গেল। আইউবের মন্ত্রী খান আবদুস সবুর একদিন ব্যক্তিগত পর্যায়ে মন্তব্য করেন, 'প্রকাশ্য বিচার বস্তুতই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রচার করছে।' প্রথমদিকে বিবাদি পক্ষে উকিল পাওয়াই মুশকিল ছিল, কিন্তু ক্রমে সবাই সাহস সঞ্চয় করেন এবং এই সাহস সঞ্চারে সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা রাখেন শেখ মুজিবের বীরোচিত ব্যবহার, নির্লিপ্ত উপস্থিতি এবং সবসময়ে সাহসিকতার নিদর্শন। ২২ আগষ্ট ও ২৬

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর মামলাটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়। প্রধান সরকারি কৌসুলি মনে করেন যে, অর্ধেক আসামি শাস্তি পাবে, তবে শেখ মুজিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের সংযোগ সাধনে বেগ পেতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা যে চাপা পড়বে এবং আওয়ামী লীগ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। ধারণা করা হয় যে, ১৯৬৯ সালের প্রথম তিন মাসেই মামলার নিষ্পত্তি হবে। সুতরাং ১৯৭০-এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইউবকে ঠেকানোর কোনো সুযোগই থাকবে না। সরকার পক্ষ দুশোর বেশি সাক্ষী হাজির করে এবং ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত করে। তারপর শুরু হয় আসামীদের জবানবন্দি ও সওয়াল-জবাব। আসামীদের জবানবন্দি আরো শক্তভাবে ষড়যন্ত্র মামলার অসারতা জনসমক্ষে তুলে ধরে। এর মধ্যে অবশ্য রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম হয়ে ওঠে এবং বিশেষ আদালত প্রায় বাধ্য হয়েই ১৭ ফেব্রুয়ারিতে শুনানি মূলতবি করে। কয়েকদিন পরেই আইউব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ঘোষণা দেন এবং পরের দিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খারিজ হয়। অবশ্য ইতোমধ্যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় এবং আর একজন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে গুরুতরভাবে আহত করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল বাঙালি বিরোধিতাকে দমন করবার জন্য সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কিন্তু মামলাটি সামরিক সেনা নায়কের ক্ষমতার ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে ইন্ধন যোগায় এবং ছয় দফা কার্যক্রমকে বাংলাদেশের ম্যাগনাকার্টায় পরিণত করে। এই মামলা শেখ মুজিবকে এক বিরাট দলীয় নেতার আসন থেকে সারা দেশের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্দেশ্যটি কি ছিল? বামপন্থী লেখক তারেক আলীর মতে এই মামলাটি বানোয়াট এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভরাডুবি করা ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, বাঙালিদের সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়ন করে সামরিক বাহিনীতে নিরঙ্কুশ পাঞ্জাবি প্রাধান্য বজায় রাখা ছিল আর একটি লক্ষ্য। সর্বশেষে দুই অংশের জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতা ও বিভেদ রচনা করা ছিল অন্য উদ্দেশ্য এই রকম পরিস্থিতিতে কায়েমি স্বার্থবাদ তার দখল বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সামরিক শক্তিকে নির্বিবাদে দেশ শাসনের সুযোগ করে দেয়াই ছিল এই মামলার উদ্দেশ্য, আইউব সম্ভবত তাতে একটি খুটি হিসেবে বিবেচিত হন।

### ৭.১৪ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানকে রীতিমতো উত্তপ্ত করে তোলে। তবে মামলা শেষ হওয়ার আগেই সারা দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থান ঘটে যায়। ১৯৬৮ সালের ৭ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডির একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় এই প্রতিবাদ এবং ৩০ জানুয়ারির মধ্যে এটি দেশব্যাপী

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। পঁচিশ মার্চে কিন্তু মার্শাল আইউব পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২'র শুরু পর্যন্ত আইউব যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে তিনি কৃতিত্বের ভূমিকা রাখেন। ১৯৬২ সালে রাজকীয় কায়দায় দেশকে সংবিধান উপহার দিতে গিয়ে এবং তাঁর নিজস্ব নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তিনি প্রথম বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁরই পদ্ধতিতে নির্বাচিত পরিষদ তাঁর ক্ষমতা খর্বের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রলোভন ও ভীতি এই অস্ত্র দুটি ব্যবহার করে তিনি যথেষ্ট সংখ্যক সহযোগী সৃষ্টিতে সক্ষম হন। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণতন্ত্রের শেষ পরীক্ষায় দেখা গেল যে, আইউব এবং তাঁর পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরানো যাবে না। পরোক্ষ নির্বাচন, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা এবং অর্থ বিষয়ক দুর্নীতির চাপে জনমতের অবাধ প্রকাশ হলো দুঃসাধ্য। আইউবের দুর্ভাগ্য যে, কিছু হঠকারী রাজনীতিবিদ ও সেনাপতির কুহকে তিনি পাক-ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মর্যাদা হারালেন। এই যুদ্ধই তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার সম্মুখীন করে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে এলো তাঁর অসুস্থতা। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় চার মাস তিনি ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাঁর অসুখের সময় সাংবিধানিক ধারা ব্যাহত হয়, স্পিকার কখনো ক্ষমতা গ্রহণের আহবান পেলেন না এবং সামরিক বাহিনীই রইলো দেশের নিয়ন্ত্রণ। আরোগ্য লাভের পর দেখা গেল যে, ক্ষমতা ছাড়ার তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই বরং পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধিতার টুটি চাপতে ষড়যন্ত্র মামলার ওপর জোর দেয়া হলো।

কি কারণে আকস্মিকভাবে আইউবের তাসের ঘর ধসে পড়লো- এই প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। দশ বছর ক্ষমতায় থেকে আইউব নিশ্চয়ই অনেক ভালো কাজ করেছেন। তাঁর পতন ছিল তাঁর প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য অনেকগুলো বিষয় সম্মিলিতভাবে তাঁর পতনের পথ প্রশস্ত করে। তাঁর পরিবারের লোভ ও দূর্নীতি তাঁর সুনামকে অনেকাংশে খর্ব করে। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা রাতারাতি বড়লোক বনে যান। অনেকে সন্দেহ করে যে, তিনি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত ছিলেন। সোয়াতের মতো হাজারায় একটি ক্ষুদে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বেশ চালু হয়। প্রসঙ্গত সোয়াতে তাঁর দুই মেয়েরও বিয়ে হয়। তাঁর সহচরদের দুর্নীতি নিয়েও প্রচুর কানাঘুষা ছিল। বৈদেশিক সাহয্য-নির্ভর দেশে সহসা সম্পদের টান পড়লে সরকার খুব বিপাকে পড়ে। পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং এজন্য মনে করা হতো যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ থাকলে সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার উঁচু হবে। চাষী গরিব হচ্ছে আর শ্রমিক মালিক দ্বারা শোষিত হচ্ছে। উন্নয়ন কৌশলের দার্শনিক অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক জানালেন যে, শিল্প সম্পদের ৬৬ শতাংশ, ব্যাংক পুঁজির ৮০ শতাংশ এবং বীমা ব্যবসার ৯৭ শতাংশ মাত্র বাইশটি পরিবারের হাতে আছে। শ্রমিকের বেতন বস্তুতপক্ষে কমে যায়। নগরবাসীর সংখ্যা বাড়ে কিন্তু নাগরিক সেবা সরবরাহ মারাত্মকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে কৃষি বিপ্লবের

*Dhaka University Institutional Repository*

সুযোগ-সুবিধা সবই বড় জমিদার হাত করে নেয়। আখচাষীরা পয়সা পায় না কিন্তু চিনি উৎপাদক মন্ত্রীর মুনাফা বেড়েই চলে। আইউবের মৌলিক গণতন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। গ্রামের সাধারণ মোড়ল সহসা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তার ভোটে শুধু পরিষদে প্রতিনিধিই নন, মায় রাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত হন। তাঁর সঙ্গে জেলা শাসক উজির সঙ্গে ব্যবহার করেন। উজির-নাজির তাঁর খোঁজে আসেন। একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায় আর সচরাচর যাঁরা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা আর ততো ক্ষমতাশালী রইলেন না। মানুষের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায় এবং রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার সাহস তাঁরা সঞ্চয় করে। আইউব-বিরোধী আন্দোলন গ্রামেগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি আইউবের পদ্ধতিতে ভিন্নমতের সুযোগ ছিল না, এক ধরনের দমবন্ধ করা আবহাওয়া ছিল সারা দেশে। বিশেষ করে পাক-ভারত যুদ্ধকালে যে ডিফেন্স অব পাকিস্তান আইন বলবৎ হয় তার আওতায় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা খুব বেড়ে যায়। ১৯৬৯-এ যখন গণআন্দোলন তুঙ্গে তখন এই আইনের কার্যকারিতা রহিত করা হয় জরুরি অবস্থার অবসান ঘোষণা করে। প্রেস ও পাবলিকেশনস অধ্যাদেশের বলে সংবাদ মাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরা হয় এবং সরকারি প্রেস ট্রাস্ট ছিল একুশটি সংবাদপত্র নামধারী ক্রোড়পত্রের প্রকাশক। রাজনৈতিক বিরোধীদের যখন-তখন জেলে নেয়া হতো এবং আইনের শাসন বলে কিছুই ছিল না। সরকার-পুষ্ট সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক অঙ্গন, শ্রমিক মহল ও ছাত্র বলয়ে ছিল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন অধ্যাদেশ জারি করে সেখান থেকেও মুক্তচিন্তা বিতাড়ন করা হয় এবং বিদ্যাপীঠকে বশংবদ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রয়াস নেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গান-বাজনার চর্চা সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো তেমন কিছুই করতে সক্ষম হলেন না। পূর্ব পাকিস্তানে নেতৃবৃন্দকে ধরপাকড় করে মোনেম খান বেশ জমিয়ে বসেছেন। ১৯৬৮ সালের প্রথম অর্ধেকে এই ছিল মোটামুটি অবস্থা। আগরতলা মামলার তদানি আন্দোলনের প্রথম পদধ্বনি জাগালো। সাত নভেম্বর আগুন জ্বলে উঠলো সুপ্ত নগরী রাওয়ালপিন্ডিতে। গর্ডন কলেজের কতিপয় ছাত্র গিয়েছিল আফগান সীমান্তে এবং লান্ডিকোটালের শুল্কমুক্ত বাজারে তারা কিছু কেনাকাটা করে। ফিরতি পথে তাদের শুল্ক বিভাগ আটক করে ও তাদের ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করে। লান্ডিকোটালের বাজারে সাধারণত বড়লোক অথবা ক্ষমতাশালীরাই কেনাকাটা করতেন এবং শুল্ক বিভাগ এতে কোনো ওজর-আপত্তি করতো না। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করে কলেজের ছেলেরা। একই দিনে পিন্ডি পলিটেকটিকের ছাত্ররা প্রতিবাদ করে তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। পুলিশ আর ছাত্রদের মধ্যে লেগে যায় খন্ডযুদ্ধ, কিছু অগ্নিসংযোগ ও লুটের ঘটনাও ঘটে। ভুট্টো একেবারেই সহসা ঘোলা জলে মাছ শিকারে

*Dhaka University Institutional Repository*

নামেন। পুলিশের গুলিতে একটি ছেলে প্রাণ দিল। আর যায় কোথায়, একেবারে এলাহি কান্ড। পুঞ্জীভূত ক্রোধ যেন ফেটে পড়েছে। সেনাবাহিনীর তলব হলো, কিন্তু তারা স্বগোত্রীয়দের গুলি করতে বিরত থাকলো। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে গোলমাল পেকে উঠলো। পেশওয়ারে ১০ নভেম্বরে এক জনসভায় আইউবের প্রতি গুলিবর্ষণ হলো। লাহোর আর করাচিতে ছাত্র এবং উকিলেরা মাঠে নেমে গেলেন। ১৩ তারিখে ভুট্টোকেও গ্রেফতার করা হলো। ১৭ নভেম্বর সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান কঠোর ভাবে আইউব সরকারে সমালোচনা করে বিবৃতি দিলেন। ২৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মহবুব মুরশেদ এই ধরনের আর একটি বিবৃতি দিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। এরা মোটামুটিভাবে সম্মানিত ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

সরকার এই প্রতিবাদ যেন বুঝতেই পারলো না। আমলাদের কমিটি ছাত্র ও জনতার অভিযোগ নিরসনের জন্য মামুলি কিছু সুপারিশ হাজির করলো। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাস দেয়া হলো। ডিপ্লোমার কপির জন্য ফি কমানো হলো। কম নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। শিল্প কারখানায় ন্যায্যমূল্যের পণ্য দোকান স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হলো। নিম্নবেতনের সরকারি কর্মচারীদের ভাতা বাড়ানো হলো। শূন্য পদে জরুরি ভিত্তিতে নতুন নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হলো। গমের দাম নিয়ন্ত্রণ করা হলো। সমস্যটি যে রাজনৈতিক সেই চিন্তাই কারো মাথায় এলো না। শুধু বিদেশি চক্রান্তের গন্ধ সর্বত্র পাওয়া গেল। পূর্ব পাকিস্তানে আগরতলা মামলা-বিরোধী তৎপরতা শক্তিশালী হচ্ছে। এই সময়ে এলো পশ্চিম পাকিস্তানের অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া। ৬ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী আইউবকে পরিত্যাগ করে সরকারকে প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানালেন। আইউবের শুভানুধ্যায়ী মাওলানা মানুষের ভাবসাব ভালো বুঝতেন, তাই আইউবকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে তিনি কালক্ষেপন করলেন না। ১৩ ডিসেম্বর হলো সাধারণ ধর্মঘট ও পুলিশের গোলাগুলি। এবারে সরকারের রাজনৈতিক চৈতন্যোদয় হলো। অইউব ঢাকায় সফরে ছিলেন। ৬ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি জরুরি অবস্থা আবসানের কথা বললেন। আইউবের প্রিয় সেনাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া কিন্তু অবস্থা বুঝে নড়াচড়া শুরু করলেন। সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করলেন। ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা একটি ছাত্র কর্ম পরিষদ গঠন করলো এবং ৩১ ডিসেম্বর কালো দিবস পালন করলো।

*Dhaka University Institutional Repository*

## ৭.১৫ সাধারণ নির্বাচন ঃ

পাকিস্তানের তেইশ বছরে প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম দেশব্যপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের আগে শুধু প্রাদেশিক নির্বাচন হয় এবং সামরিক শাসনের অধীনে সব নির্বাচন হয় পরোক্ষ ভোটে। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ২৭৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর হয় প্রাদেশিক পরিষদের ১৭৯টি আসনে। ১৭ জানুয়ারীতে উপকূলীয় এলাকায় ৯টি জাতীয় পরিষদের ও ২১টি প্রাদেশিক পরিষদের আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে এনপিএল এবং ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেন। তারা বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এক পাকিস্তানের কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং ১৯৪০ সালের পাকিস্তান পস্তাবে দুইটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক সঙ্গে থাকার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, তাই বাংলা বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রয়োজন। ভোটদানে উৎসাহ ছিল প্রচুর। পূর্ব পাকিস্তানে ৫৭, পাঞ্জাবে ৬৯, সিন্ধুতে ৬০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪৮ এবং বেলুচিস্তানে ৪০ শতাংশ ভোট প্রদত্ত হয় এবং ৩ শতাংশ ভোট বাতিল হয়ে যায়। শান্তি প্রিয় পরিস্থিতিতে ভোট প্রদান সম্পন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সরাসরি ছয় দফার সমর্থনে ভোট হয়। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬০টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসন লাভ করে। প্রদত্ত ভোটের ৮২ শতাংশ আওয়ামী লীগ পাওয়ায় বেশির ভাগ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। জাতীয় পরিষদে অন্য দুইজন সদস্য হন পিডিপির বর্ষীয়ান নেতা নুরুল আমিন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়। এঁরা দুইজনই পরবর্তীকালে পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না যে, বাঙালিরা নিজেদের দেশে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ চায় না। ছয় দফার সমর্থনে ছিল দ্ব্যর্থহীন ম্যান্ডেট। ৩ জানুয়ারী এক নির্বাচনী বিজয় সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, "সংবিধান রচনায় আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। কিন্তু মৌলিক নীতিতে কোন ছাড় দেয়া যাবে না।" ছয় দফা নিয়ে আর দর কষাকষির কোন সুযোগ রইলো না। পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল ছিল ভিন্ন রকমের, কোনো দলই সেখানে ম্যান্ডেট পেল না। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে দেখা দিল। ভুট্টোর ব্যক্তিগত আকর্ষণ, তাঁর ভারতবিদ্বেষী বিবেদাগার এবং 'রুটি কাপড় মাখনের' আহ্বান তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলো। ওয়ালি ন্যাপ বেলুচিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো আর সীমান্ত প্রদেশে ওয়ালি ন্যাপ আর কাইয়ুম মুসলিম লীগ আসন ভাগ করে নিল। ভানপন্থী ধর্মীয় দল সবখানে ব্যর্থ হলো। জামায়াতে ইসলামী করাচির মোহাজের মহলে সমর্থন পেল কিন্তু তাদের প্রধান ঘাঁটি পাঞ্জাবে পরিত্যক্ত হলো। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে ব্যক্তিগত আকর্ষণই ছিল সাফল্যের নিয়ন্তা।

Dhaka University Institutional Repository

ভুট্টো এগিয়ে এলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে। জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের ৮৩টি পায় তাঁর পিপিপি। পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদে হয় তাঁর বড় সাফল্য ১৮০ জনের মধ্যে ১১৩ জন, অথচ সিন্ধুতে তিনি কোনো মতে পার পান, ৬০ জনের মধ্যে ৩২ জন।

**নির্বাচনী ফলাফল ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ঃ**

আওয়ামী লীগের জন্য দেশে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা রইলো না। ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিদে তারা একাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৬৭ আসন) এছাড়া তারা পিডিপি, ওয়ালি ন্যাপ এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থনে আরো ১৫ জন প্রতিনিধিকে দলে টানতে পারতো। পিপিপি জাতীয় পরিষদে বৃহত্তর বিরোধী দল হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের দুইটি প্রদেশে তাদের অস্তিত্বই প্রায় ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অতি সহজেই কেন্দ্রে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী এই ফলাফলে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। বাঙালিদের বিভেদ এবং ঐক্যের অভাব ছিল তাদের আধিপত্যের ভিত্তি, এবারে সে সুযোগ আর রইলো না। তারা কখনো ভাবে নি যে, আওয়ামী লীগ এত জনপ্রিয়। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে ইয়াহিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার আবদুর রশিদ মন্তব্য করেন যে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ৬০ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। সামরিক মহলে এবং বিদেশি কূটনৈতিক মহলেও এই ধারণা পোষণ করা হতো। নতুন অবস্থায় কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন হলো। আওয়ামী লীগের ওপর শুরু হয় সাঁড়াশি আক্রমণ। বুদ্ধিজীবী মহল, সাংবাদিক বা আমলা সবাই বলতে শুরু করলেন যে তিনটি বিষয় নিয়ে কি করে একটি জাতীয় সরকার চলতে পারে। সামরিক বাহিনী সক্রিয়ভাবে ছয় দফা প্রতিহতের প্রচেষ্টায় মেতে উঠলো। সব রাজনৈতিক দলের ওপর চাপ এলো। সামরিক শক্তির প্রধান সহযোগী হলেন ক্ষমতালোলুপ ভুট্টো। তিনি গোপনে সামরিক নেতা পীরজাদা, গুল হাসান, হামিদ এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ২০ ডিসেম্বর তিনি আবদার করলেন যে, তিনি বিরোধী দল হিসেবে আসন নেবেন না, তিনি ক্ষমতায় অংশীদার হবেন। তাঁর যুক্তি হলো যে, সিন্ধু ও পাঞ্জাব হলো ক্ষমতার ঘাঁটি এবং এই দুই প্রদেশের নেতা হিসেবে ক্ষমতায় তাঁকে ভাগ দিতে হবে। চারদিন পর তাঁর বক্তব্যের ধুয়ো ছিল একই কথা, তাঁকে ক্ষমতায় ভাগ দিতে হবে। এবারে তিনি এক উদ্ভট দাবি করে বসলেন যে, দেশে দুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আছে এবং তাই ক্ষমতায় ভাগাভাগি হতে হবে। ভুট্টো আসলে পাকিস্তানের বিভক্তি ততদিনে করে সেরেছেন। ৩০ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তিনদিনব্যাপী আলোচনা শেষে ঘোষণা করলেন যে, সংবিধান রচনায় বিপত্তি অনতিক্রমনীয় নয়, তবে তাঁর সময়ের দরকার। আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট ছিল শক্তিশালী ও দ্ব্যর্থহীন

*Dhaka University Institutional Repository*

কিন্তু তাঁর দলের তেমন কোনো অবস্থান নেই এবং ছয় দফার ব্যাপারে তাঁরা কোনো দ্ব্যর্থহীন অভিমতও দেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানি সব মহল থেকে প্রচার চলালো যে, শেখ মুজিব ছয় দফার নিশ্চয়ই কিছু ছাড় দেবেন এবং সামরিক বাহিনীকে জাতীয় সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব কখনো প্রচারণার কোনো ভিত্তি একেবারেই ছিল না। কারণ শেখ মুজিবের প্রতিটি বিবৃতিতে ছয় দফা বারবার সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়।

**সারণি ৭.১ নির্বাচনে ফলাফল ১৯৭০-৭১ (জাতীয় পরিষদ)**

| পূর্ব পাকিস্তান | পাঞ্জাব | সিন্ধু | সীমান্ত | বেলুচিস্তান | উপজা এলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬০ | | | | | |
| | ৬৪ | ১৮ | ১ | | |
| | ১ | ১ | ৭ | | |
| | ৭ | | | | |
| | | | ৬ | ১ | |
| | ৪ | ৩ | | | |
| | | | ৩ | ৩ | |
| | ১ | ২ | ১ | | |
| | ২ | | | | |
| ১ | | | | | |
| ১ | ৩ | ৩ | | | ১ |
| ১৬২ | ৮২ | ২৭ | ১৮ | ৪ | ৭ |

সারণি ৭.১ নির্বাচনে ফলাফল ১৯৭০-৭১ (জাতীয় পরিষদ)

| দল | পূর্ব | পাঞ্জাব | সিন্ধু | সীমান্ত | বেলুচিস্তান | উপজাতি | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Dhaka University Institutional Repository*

| | পাকিস্তান | | | | | এলাকা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | ২৮৮ | | | | | | | ২৮৮ |
| পিডিপি | ২ | ৪ | | | | | | ৬ |
| ওয়ালি ন্যাপ | ১ | | | ১৩ | ৮ | | | ২২ |
| জামায়াতে ইসলামী | ১ | ১ | ১ | ১ | | | | ৪ |
| থানবী জামাত | ১ | | | | | | | ১ |
| পিডিপি | | ১১৩ | ৩২ | ৩ | | | | ১৪৮ |
| কাউন্সিল লীগ | | ১৫ | ৫ | ১ | | | | ২১ |
| কাইয়ুম লীগ | | ৬ | ৪ | ১০ | ৩ | | | ২৩ |
| কনভেনশন লীগ | | ৬ | | ২ | | | | ৮ |
| আহলে হাদিস | | ১ | - | | | | | ১ |
| হাজারভী জমিয়ত | | ২ | ৭ | ৪ | ২ | | | ৮ |
| জমিয়তে আহলে সুন্না | | ৪ | ১ | | | | | ১১ |
| সিন্ধু এমপিপিএমএম | | | | | ১ | | | ১ |
| পাখতুনিস্তান ন্যাপ | | | | | ১ | | | ১ |
| বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট | | | | | ৫ | | | ১ |
| স্বতন্ত্র | ৭ | ২৮ | ১০ | ৬ | | | | ৫৬ |
| মোট | ৩০০ | ১৮০ | ৬০ | ৪০ | ২০ | | | ৬০০ |

উৎস : পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডি.সি, *Pakistan Affairs* ১৫ জানুয়ারী ১৯৭১। ভারত সরকার, পররাষ্ট্র দফতর: *Bangladesh Documents,*

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে নমনীয় করার জন্য দুমুখী অভিযান শুরু হলো। তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখানো হলো। আমলা ও অর্থনীতিবিদরা বলতে শুরু করলেন যে, এবারে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের পালা এবং এতে বঙ্গবন্ধুর নিকনির্দেশনা জরুরী। একই সঙ্গে সামরিক বাহিনীর দাবী সম্বন্ধেও ভয় দেখানো হলো। সামরিক বাহিনী প্রদেশের বাজেট অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। সম্পদের ওপর তাদের নিজেদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের খাতিরে ফেডারেল সরকারের রাজস্ব ক্ষমতার প্রয়োজন। জেনারেল ইয়াহিয়া ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে এই দুইটি বিষয়েই তাঁকে সাবধান করে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক সমঝোতার ব্যাপারে তিনি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপের বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৪ জানুয়ারি ঢাকা ছাড়ার প্রাক্কালে তিনি জানান যে, তাঁর আলোচনা সন্তোষজনক এবং তিনি প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

জানুয়ারি মাসের ১৭ তারখি জেনারেল ইয়াহিতা ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে লারকান গেলেন। তাঁর সেঙ্গ গেলেন জেনারেল হামিদ এবং পীরজাদা। তারপরই ভুট্টো ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন এবং ছয় দফা বিবেচনার জন্য সময় চান। ইতোমধ্যে পাকিস্তান সহসা সামরিক রসদ সংগ্রহে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে পাকিস্তান চীন ও ফ্রান্স থেকে যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করতে থাকে। সর্বশেষে রাশিয়ার সঙ্গেও রসদ সরবরাহের জন্য সমঝোতা হয়। কিন্তু ১৯৭০-৭১ সালে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে উদার হাতে সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ কেনা হয়। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল ৩২৩ মিলিয়ন ডলার, কিন্তু ১৯৭১-এর মার্চে তা নেমে হয় ১৮৪ মিলিয়ন ডলারে। অথচ এই সময়ে রফতানি ও আমদানি দুই ক্ষেত্রেই ছিল মন্দা এবং সঞ্চয়ে যুক্ত হয় ৪২ মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ সাহায্য এবং ৩৫ মিলিয়ন ডলারের এস.ডি.আর-এর হিস্যা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি চলে। আগেই জানা গেছে যে, ১৯৬৯ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বৃহত্তম বিস্তার হয়। এই শক্তি ক্রমাগত বাড়ানো হতে থাকে। প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি মোকাবিলার জন্যই এই উদ্যোগ চলে। একই সঙ্গে দেশে একটি যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে। জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখ দুইজন কাশ্মিরি মুসলমান একটি ভারতীয় ফকার বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে আসে। সেখানে ভুট্টোর মধ্যস্থাতায় যাত্রী ও ক্রুদের মুক্ত করা হয় ৩১ জানুয়ারি; কিন্তু ছিনতাইকারীরা বিমান ছাড়তে রাজি হলো না। তাদেরকে বীর মোজাহিদ হিসাবে অভিনন্দন জানানো হলো এবং তারা খুব ঘটা করে ২ ফেব্রুয়ারি বিমানটি পুড়িয়ে দিল। ভারত ছিনতাইকারীদের নিতে চাইলে তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করা হলো। ভারত এ ব্যাপারে পাকিস্তানের মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনা, ছিনতাইকারীদের ফেরত ও বিমানের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করলো এবং ভারতের আকাশ সীমায় পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বানচাল করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে এই ঘটনা নানা মহলে চিহ্নিত হলো। বঙ্গবন্ধু এই বিষয়ে অনুসন্ধান দাবি করলেন এবং পরিবেশকে ঘোলাটে করতে মানা করলেন। ইয়াহিয়া ৫ ফেব্রুয়ারি জানালেন যে, দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে এবং যে-কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অজুহাতে সারা ফেব্রুয়ারি জুড়ে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও রসদের ফেরি চললো। মাস শেষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায়

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক ঘাঁটি বসলো এবং যোগাযোগ ও সম্প্রচার কেন্দ্র সর্বত্র সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত হলো। সামরিক উপস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে নমনীয় করা। বিমান ছিনতাই ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক ঘাঁটি বানাতে সাহায্য করলো, কিন্তু জনমনে ভারত বিদ্বেষ বা যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি হলো না। তখন শুরু হলো ষড়যন্ত্রের এক বিকল্প ধারা। বীর মোজাহিদদের ছিনতাই হয়ে গেল আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় ভারতের একটি সঙ্কট সৃষ্টির প্রয়াস। শেখ মুজিব বিষয়টির তদন্ত চেয়েছিলেন কিন্তু সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা এক বাক্যে তাঁর সমালোচনা করে। এখন সামরিক সরকারই তদন্ত শুরু করলো এবং তদন্তকারী হলেন জান্তার সদস্যবৃন্দ। এপ্রিলের মাঝামাঝি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় যে, ছিনতাই ভারতীয় অনুচররা সম্পন্ন করে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি সঙ্কট সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে বিদ্রোহ করতে সুযোগ দান। যাদের মোজাহিদ বলে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় এবং বীর হিসেবে সংবর্ধনা দেয়, তাদের সহজেই ইয়াহিয়া জান্তা ভারতীয় অনুচর বানিয়ে দিল, তবে তাদের কখনো ভারতের হাতে সমর্পন করা হলো না বা কোনো শাস্তি দেয়া হলো না। পুরো তদন্ত ছিল শঠতাপূর্ণ এবং প্রতিবেদন ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট, তবে কল্পনার দৌড়টা হয়ে গিয়েছিল একেবারেই অবিশ্বাস্য।

## ৭.১৭ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষনা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধেদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে বিভিন্ন কুটকৌশল অনুসরণ করেন। ফলে বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসন থেকে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার দিকে ঝুকে পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১সালে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে রক্তের বিনিময়ে তাদের অধিকার আদায় করে। অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

### ৭.১৬ ১৯৭০ সালের অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫মার্চ পর্যন্ত চলমান অসহযোগ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম পর্ব। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের অযথা গড়িমসি ও প্রতারণা এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর অসহযোগিতা ছিল এ অসহযোগ

*Dhaka University Institutional Repository*

আন্দোলনের প্রধান কারণ। এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল খুবই ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। আন্দোলনের সাফল্য পরিণতিতে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হয়।

**অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি।**

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি: ১৯৭০সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি (১০টি মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ (৭টি মহিলা আসনসহ) আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে ৩১০টি (১০টি মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি (সংরক্ষিত মহিল আসনসহ) আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত হলেও পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করেন।

২. ছাত্র ও শ্রমিকদের অগ্রসর কর্মসূচী: একাত্তরের ৩মার্চ আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১মার্চ স্থগিত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় জনতা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। সংঘর্ষে বহুলোক নিহত ও আহত হয়। ওইদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম. আবদুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এ ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে পরদিন দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ওইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩মার্চ ছাত্রলীগের পল্টন ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। সমাবেশে ছাত্রলীগ ৫ দফাভিত্তিক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করে যা 'স্বাধীনতার ইশতেহার' নামে চিহ্নিত করা হয়। এতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ঘোষণা করা হয়।

পল্টনের জনসভায় ৪মার্চ থেকে ৬মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ছাত্র সমাজের ইশতেহারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দেশে শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা আপামর জনতা সক্রিয়ভাবে হরতাল পালন করে। ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা অনুষ্ঠান বর্জন করে। ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবীগণ তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ

*Dhaka University Institutional Repository*

তিনদিনের হরতালে ঢাকাসহ সমগ্র দেশের আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে বহু লোক আহত ও নিহত হয়। ইয়াহিয়া খান এ পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অগত্যা ৬ মার্চ বেতার ভাষণে ঢাকায় ২৫মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণা বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানও সে ঘোষণায় আস্থা রাখতে পারেননি। ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দেলনের কর্মসূচী ঘোষণার জন্য জনসভার আয়োজন করা হয়।

৩. শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ও এর গুরুত্ব: পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ সমাবেশে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু নির্দিষ্ট সময়ে রেসকোর্সের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন যা বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ৪টি। যথা ক) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার, খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, গ) গণহত্যার তদন্ত করা এবং ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু উপর্যুক্ত দাবির পাশাপাশি কতগুলো ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের বন্ধ ঘোষণা প্রদান করেন। সেদিন জনসমাবেশের ওপর পাকিস্তান সরকারের কড়া নজর ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ব্যাপক ধ্বংশযজ্ঞ চালানো হবে এ আশঙ্কা থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো ঘোষণা না দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "আমার অনুরোধ, প্রত্যেক মহল্লায় ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি মুক্তি সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশও দেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান।

১৯৭১সালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হলেও বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চ তারিখের ঘোষণার পরপরই দেশে বাঙালি ও সরকার উভয় পক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওইদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ৭মার্চ বিকালবেলা ছাত্র-ছাত্রীরা রাইফেল নিয়ে ঢাকার রাজপথে প্রদক্ষিণ শুরু করে। ৮মার্চ দেশে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায় এবং ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.ও.টি.সি-এর ক্যাডেটর এর প্রশিক্ষন পরিচালনা করে। একইভাবে বাঙালি সৈন্যদের মধ্যেও আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ঘোষণার পর থেকে বাংলাদেশে অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।। অপরদিকে পাকিস্তান সরকার ৭ই মার্চ তারিখেই লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করে। শুরু হয় বাঙালির ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ডাকে ২৫ই মার্চ পর্যন্ত অসহযোগের ফলে দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ৭ই মার্চ শেখ মুজিবের ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ভাষণ বাঙালি সৈন্য ও সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া এ বক্তৃতায় বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। ওইদিন শেখ মুজিব পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে আগাম নির্দেশ দিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান (পরে মেজর জেনারেল প্রেসিডেন্ট) তাঁর 'একটি জাতির জন্ম' প্রবন্ধে এ ভাষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, "৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীণ সিগন্যাল বলে মনে হলো।" শুধু ছাত্র-শ্রমিক নয় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও ভাষণের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া এর থেকে উপলব্ধি করা যায়। ৭ ই মার্চের পর বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসহ বিভিন্ন দলের সংগ্রাম-প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, থানা, এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিরোধ প্রস্তুতি গড়ে ওঠতে থাকে যা ২৬ই মার্চের পর পরিপূর্ণতা পায়। তাই ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

## ৭.১৭ ২৫ ই মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

১৯৭১সালের ২৫মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সংযোজন করে। বিশ্বে স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনতাকে এরূপ হত্যার নজির খুব কমই দেখা যায়। অদম্য বাঙালি জাতি গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং শুরু করে মুক্তির জন্য যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ ই মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫ ই মার্চ এ অপারেশন সংঘঠিত হলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকে এর প্রস্তুতি চলতে থাকে। একদিকে ১৬ ই মার্চ থেকে সমঝোতা বৈঠক শুরু হয়, অন্যদিকে ১৭ ই মার্চ জেনারেল টিক্কা খান, মে.জে.খাদিম হোসেন এবং রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন। ১৯ই মার্চ থেকে পূর্ব বাংলায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের

*Dhaka University Institutional Repository*

বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়ে যায়। একই দিন জয়দেবপুরে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে গেলে সংঘর্ষ বাঁধে। ২০ই মার্চ সরকার অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে এবং জেনারেল হামিদ ক্যান্টনমেন্ট হতে ক্যান্টনমেন্টে ঘুরাঘুরি শুরু করেন। ওইদিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর প্রমুখকে নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এ সময় প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পি. আই. এ. ফ্লাইট বোয়িং ৭০৭ বিমান সৈন্য ও রসদ নিয়ে ঢাকা আসতো এবং অসংখ্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে চট্টগ্রামবন্দরে অপেক্ষা করে। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি. সোয়াত থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়। সব প্রস্তুতি শেষে ২৫ মার্চ গণহত্যার জন্য বেছে নেয়া হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেয়া হয়।

মূল পরিকল্পনায় ছিল রাত ১.০০টা থেকে অপারেশনে চালানো হবে। কিন্তু পথে বিলম্ব হয়ে ভেবে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১১.৩০টার সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তার মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। একই সঙ্গে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর হেড কোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। উল্লেখ্য যে, অপারেশন ২৫মার্চ শেষ লগ্নে শুরু হলেও ঘড়ির সময় অনুযায়ী তা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গড়িয়ে যায়। রাত ১.৩০টার সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর সময় বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল). জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালায় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, গণকটুলী, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। একইভাবে দেশের অন্যান্য জায়গায় গণহত্যা শুরু করে।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাবাণী শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকসেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে পরিচিত।

*Dhaka University Institutional Repository*

### ৭.১৭.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

পৃথিবীর দুটি দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যটি ১৯৭১সালে বাংলাদেশের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল এদেশের মুক্তি সংগ্রামের মাইলফলক ও প্রেরণার উৎস । বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হলে এর বিষয়বস্তু ও নির্দেশনা ছিল একই এবং এতে শেখ মুজিবের কতৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এসব ঘোষণার ফলে বাঙালিদের পক্ষে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব এবং ইপ্সিত বিজয় অর্জনও সহজ হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি পরোক্ষভাবে ওইদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা দিয়েছেন। ওইদিন বিকেলে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও বাঙালি সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি সকলকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

২৫ মার্চ দিবাগত রাত দেড়টায় শেখ মুজিবকে বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওইদিন দিনের বেলা তিনি ঘটনা উপলব্ধি করে যেকোনো জরুরি ঘোষণা প্রচারের লক্ষে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকজন প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে আওয়ামী লীগ সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দি হওয়ার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ট সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌছে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। পরের দিন বিবিসি-র প্রভাতি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। এদিকে দেশের সকল রেডিও স্টেশন ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো আব্দুল হান্নানসহ কতিপয় নেতার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করে চট্টগ্রামে কালুরঘাট প্রেরণ কেন্দ্রটিকে বেতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং এর নাম দেয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। কারো কারো মতে, এ কেন্দ্র থেকে ২৭মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বহুবার ঘোষণাটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে এ সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। তবে ২৬মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা হিসেবে ধরে নিয়ে ২৬মার্চ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

### ৭.১৭.২ একাত্তরের সশস্ত্র গণ প্রতিরোধ

প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ প্রতিরোধ করে। প্রাথমিক এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরোধই ক্রমান্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আকার ও রূপ নেয়। কোথাও এ প্রতিরোধ হয়েছে ছাত্র, তরুণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কৃষক ও শ্রমিকের মাধ্যমে বিদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এতে যোগ দিয়ে প্রতিরোধকে শক্তিশালী করেন। আবার কোথাও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরোধে জনতা অংশ নেয়। তবে সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধ পরবর্তীকালে পরিকল্পিত যুদ্ধের ভিত রচনা করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কিংবা এর অব্যবহিত পরে বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসজ্ঞ চালালে শুর হয় সর্বাত্মক প্রতিরোধ। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের মাত্রা যতো বেড়ে যায়, প্রতিরোধের উত্তাপও ততো বাড়তে থাকে। প্রাথিমিকভাবে বাঙালি লাঠিসোটা, স্থানীয় অস্ত্র এবং পাকবাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র, থানা লুট ও ব্যক্তিগত অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ রচনা করে। ২৮ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক সিডনি শ্যানবার্গ লিখেছেন, লাঠি-বর্শা ও হস্তে নির্মিত রাইফেল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা বিমান, ট্যাংক ও ভারি কামানে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ নানা জায়গায় নানা রূপে হয় এবং এর নেতৃত্বে ছিল নানা শ্রেণীর ব্যক্তি। প্রতিরোধের এই পর্ব চলে মে মাস পর্যন্ত।

### ৭.১৭.৩ মুজিবনগর সরকার

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধকালিন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। বাঙালির মুক্তির বাসনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমর্থনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল মুজিবনগর সরকারের সাফল্য ও কৃতিত্ব। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে। এ সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই তাঁরই নামানুযারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ হয় মুজিবনগর এবং অস্থায়ী সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে। প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর মুজিবনগরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে এর সদর দপ্তর কলকাতায় ৮নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

### ৭.১৭.৪ মুজিবনগর সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণ

২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আত্মগোপন করে ভারতে আশ্রয় নেন। একাত্তরের ১৩ এবং ১৭ এপ্রিলের মধ্যে ৪৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি কুষ্টিয়া সীমান্তে সমবেত হয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করেন। ইতোমধ্যে ১০ এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। ওইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ২৬ মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করে। যদিও মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭এপ্রিল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দেশী-বিদেশী ১২৭ জন সাংবাদিক, কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

**এ ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাক্য হচ্ছে-**

১. "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।"

এদেশে বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং শেষ হয় মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রথম পর্যায়। এর পরের পর্যায় মুজিবনগর সরকার গঠনও কার্যক্রম পরিচালনা।

মুজিবনগর সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়।

**মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা**

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। এসময় মুজিবনগর সরকারের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:

*Dhaka University Institutional Repository*

**মুজিবনগর সরকার**

| | |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান সামরিক শাসকদের হাতে বন্দি) |
| উপ-রাষ্ট্রপতি | : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ) |
| প্রধানমন্ত্রী | : তাজউদ্দিন আহমদ |
| অর্থমন্ত্রী | : এম.মনসুর আলী |
| স্বরাষ্ট্র,ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রী: খন্দকার মোশতাক আহমদ | |
| প্রধান সেনাপতি | : কর্নেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানী, এম.এন.এ. |
| চিফ অব স্টাফ | : কর্নেল (অব.) আব্দুর রব |
| ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এবং বিমান বাহিনী প্রধান | : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে.খন্দকার |

সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১৬-১৭)

### ৭.১৭.৫ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর নির্বিচারে গণহত্যার যে সূচনা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী করেছিল ১৬ই ডিসেম্বর ২৭৬ দিন পর তাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই পরাজয়ের মাধ্যমে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ'র দ্বি জাতিতত্ত্বের ফসল পাকিস্তানের সমাপ্তি ঘটে, বিজয়ী বাঙালি জাতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন জাতি-রাষ্ট্র জন্ম দেয়।

### ৭.১৭.৫.১ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পটভূমি

১. গেরিলা যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পাকবাহিনীর বিপর্যয়: ২৬ শে মার্চ থেকে বাঙালি যুবক, তরুণ, ইপিআর, সেনাবাহিনী ও পুলিশের অপরিকল্পিত প্রতিরোধ জুন মাস থেকে সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধের ফলে সুসংগঠিত হয়। ভারত থেকে আগত ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর আক্রমণ চালালে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অক্টোবরের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকবাহিনীর ২৩৭জন

*Dhaka University Institutional Repository*

অফিসার, ১৩৬ জেসিও এবং অন্যান্য শ্রেণীর ৩,৫৫৯জন সৈন্য নিহত হয়। এছাড়া অগণিত এদেশীয় দোসর মারা যায়। নভেম্বর থেকে স্থল যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী অনেক এলাকা শত্রু মুক্ত করে ভারত সর্বাত্নক যুদ্ধ শুরু করলে এক সপ্তাহের বেশি পাকবাহিনী টিকে থাকতে পারেনি।

২. নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ ও নৌপথে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ সমস্যা: স্থল যুদ্ধে পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের পাশাপাশি বাঙালি নৌ-কমান্ডোরা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, নদী ও সমুদ্র বন্দরে ব্যাপক অভিযান চালায়। মুক্তিযুদ্ধে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযানে ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হলে একদিকে পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, অন্যদিকে বিশ্ব দরবারে মুক্তিযুদ্ধ পরিচিতি লাভ করে। তাই সেপ্টেম্বর থেকে চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে কোনো বিদেশী জাহাজ আসতে রাজি হয়নি। এতে পাকবাহিনীর অস্ত্র ও রসদ সরবরাহে সংকট দেখা দেয়।

৩. যৌথ কমান্ড গঠন ও পাকবাহিনীর পশ্চাদপসরণ: মূলত মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবেশ করতে থাকে। ২১নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরার অধিনায়কত্বে বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ৪টি মিশনসহ ১১টি প্রতিনিধিত্বকারী দপ্তর মুজিবনগর সরকার স্থাপন করে। অক্টোবরে জাতিসংঘে আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপেক্ষে সমর্থনসূচক বিবৃতি আদায়ে সক্ষম হন। জাতিসংঘের ৪৭টি সদস্য দেশ বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখার ফলে ৮নভেম্বর মার্কিন সরকার পাকিস্তানের অর্থ-নিষেধাজ্ঞা বিল পাস করে। এরপর জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে অনেক দেশ সমর্থন দেয়। অন্যদিকে ভারত সরকার মে মাস থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। স্বায়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পরারাষ্ট্রমন্ত্রী শরন সিংসহ উচ্চপদস্থরাও বিদেশ সফর করেন। এভাবে বিভিন্ন দেশে সফল কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে পাকিস্তান অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এরপার পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে যুদ্ধবিরতির লক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়

৫. ভারতের সরাসরি যুদ্ধ ঘোষনা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান: পাকিস্তানি বিমানবাহিনী অতর্কিতে ৩ ডিসেম্বর বিভিন্ন ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ৮-৯ ডিসেম্বর কুমিল্লা

*Dhaka University Institutional Repository*

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী শহর যৌথ বাহিনীর দখলে আসে। যশোর, চাঁদপুর, সিলেট, দাউদকান্দি ও ফেনীর বিস্তীর্ণ এলাকা যৌথ বাহিনীর অধিকারে আসে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল (বর্তমান হোটেল শেরাটন) নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে কূটনৈতিক ও বিদেশী নাগরিকদের আশ্রয় দেয়া হয়। বিশেষ বিমানযোগে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী নাগরিক অপসারণ করা হয়। ১১-১২ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ মুক্ত হলে যৌথ বাহিনী ঢাকা দখলকে প্রাধান্য দেয়। ১২ডিসেম্বর ঢাকায় বিমান হামলা অব্যাহত রাখে।

### ৭.১৭.৫.২ বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

ন'মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতির জীবনে ১৬ডিসেম্বর নতুন প্রভাত নিয়ে আসে। লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোট ৯১,৬৩৪জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এদের মধ্যে ৭৪,৮৫৬ জন সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ও তাদের পোষ্য এবং ১৬,৫৪৫ জন বেসামরিক সদস্য ও তাদের পোষ্য ও অন্যান্য।

Dhaka University Institutional Repository

# অষ্টম অধ্যায়

## ৮.০ গবেষণার ফলাফল ও উপসংহারঃ

বাংলার জাতিরাষ্ট্র বিকাশের আর্থ-সামাজিক পঠভূমি হাজায় বছর ধরে শুরু হওয়া একটি প্রক্রিয়া। সমাজতান্ত্রিক গবেষণায় এই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে হয়েছে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায়। বাঙালী লোক গোষ্ঠীর এথনিক সত্তার বিকাশ থেকে শুরু করে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ কিভাবে একটি জাতিরাষ্ট্র হিসাবে উত্থিত হলো সে বিষয়টিকে দেখা হয়েছে বিষয়টির সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের মৌলিক উপাদান সমূহের কার্যকরন ভূমিকা থেকে। অত্র গবেষণায় যে সমস্ত উপাদান জাতিরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকরন সম্পর্কে আবদ্ধ সেই বিষয়গুলো নিম্নের তুলে ধরা হলঃ

## ৮.১. বাঙালী জাতির উৎপত্তি গত দিকঃ নৃ-তাত্তিক প্রভাব

অস্ট্রিক দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রনে যে জাতির প্রবাহ চলছিল তার সাথে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছিল বাঙালি জাতি। ভারতবর্ষে আর্যদেরও আগমন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে। ভারতে আগমনের অনেক কাল পরেও আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত মোট আটশত বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে আর্যকরনের পালা চলে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেমীয় গোত্রের আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এভাবে অন্তত দেড়হাজার বছরের অনুশীলন গ্রহন বর্জন এবং রূপান্তিকরনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি গড়ে উঠে।

জনপদ ও বঙ্গ শব্দের আবির্ভাবঃ বাংলা নামে একটি অখন্ড দেশের জন্ম একেবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় জনপদ গুলোর মধ্য দিয়ে। গৌড়, বঙ্গ পুন্ড হরিকেল সমতট বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদেও কথা জানা যায়। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তার আইন ই-আকবর গ্রন্থে দেশবাচক বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন সুতরাং অত্র গবেষণার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় বাংলা ইত্যাদি নামের মাধ্যমে প্রথম বাঙালি জাতীয় চেতনা বোধের উৎপত্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে।

## ৮.২. ঐতিহাসিক প্রভাবে জাতিরাষ্ট্র

আবহমান কাল থেকে বঙ্গ নামক ভূ-খন্ডের প্রতি যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির লোলুপ দৃষ্টি এই অঞ্চলের জনগষ্ঠীর মনে ভয়, ত্রাসে ও আধিপত্যের বিস্তার করেছেন। তা মাৎস্যন্যায় বৈশিষ্ট্য প্রাচীন শাসন ব্যবস্থার ফল। গুপ্ত যুগে খৃস্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকে রাঢ়বরেন্দ্রর সঙ্গে বঙ্গ ও যুক্ত হয়। রাজা শশাঙ্ক খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে তার গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা। করেন, তার দখলে সমতটে ও বঙ্গীয় অববাহিকর পশ্চিমে ও বিস্তার লাভ করে। পাল বংশ খৃস্টীয় সপ্তম থেকে একাদাশ শতক পর্যন্ত রাঢ় বরেন্দ্র ও

Dhaka University Institutional Repository

সমতট ছাড়াও পশ্চিমের রাজ্য বিস্তার করেন। সেন বংশে খৃস্টীয় দশশতকের শেষ লগ্ন থেকে প্রায়দুশো বছর গোটা বঙ্গীয় অববাহিকায় তাদের রাজত্ব বহাল রাখেন। দিল্লীতে দাস রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগেই ১২০১ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ারর খিলজি গৌড়ে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী প্রায় দেড় শো বছর বঙ্গীয় অববাহিকা ও বিহারে খিলজিও তুঘলক সম্রাটদের প্রতিনিধিরা শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় এগারো বছর ধরে পরিচালিত নানা অভিযানে বিজয় লাভ করে তিনি বঙ্গীয় অববাহিকার চারটি জনপদেই তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাহে বাঙালা উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্বে সিলেট থেকে পশ্চিমে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত অববাহিকা তখন থেকেই বাংলা নামে খ্যাত হয়। মোগল সুবা বাংলা হয় আরো বিস্তৃত পশ্চিমে উড়িষ্যাদক্ষিন পূর্বে আরাকান এবং পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত। বৃটিশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ও ছিল সুবা বাংলার মত বিস্তৃত। ১৮৭৪ সালে আসামে চলে গেল সিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাসমূহ। ১৯১২সালে বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হলো। ১৯৪৭ সালেবঙ্গ প্রদেশভাগ হয়ে একদিকে হলো বর্তমানে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গরাজ্য।

## ৮.৩. বাংলাদেশে জাতীয়তার বিকাশ

বঙ্গীয় অববাহিকার খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও ঘটে বাংলাভাষার বিকাশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ইন্দো-ইরানিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বাংলাভাষা। উপমহাদেশে খৃস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ধ্রুপদী সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। কথ্য প্রাচীন আর্য ভাষা হিসেবে প্রাকৃত স্থান করে নেয় খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে। প্রাকৃত থেকে উদ্ভব হয় অপভ্রংশের । গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে বিকশিত হয় বাংলা। কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলার উৎস হলো মাগধী অপভ্রংশ সংস্কৃত ও পালি থেকে বাংলা সাহায্য পেয়েছে এবং পরবর্তীকালে আরবী ফারসী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় আধুনিক ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষার বিকাশের পর এই ভাষাই হয় এখানকার মানবগোষ্ঠির প্রধান ঐক্যসূত্র। ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকারবঙ্গ বিভাগ করলে এর বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আন্দোলন হয় ভাষাগত ঐক্য ছিল তার অন্যতম যুক্তি। ভাষার প্রতি আনুগত্য আরও পরে বাংলদেশের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উন্মেষে সর্বপ্রধান অবদান রাখে।

বিশ্বে জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ আধুনিক ইউরোপীয় রেনেসারই একটি ফসল। জাতীয় ভাষার বিকাশ এবং ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে রেনেসা জাতিরাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করে মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে। বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের জন্য কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ বিরতি পর্যন্ত। ১৮১৫সালের ভিয়েনা চুক্তিতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি মিললো এবং প্রক্রিয়া প্রথা মহাযুদ্ধ শেষে ভার্সাই চুক্তিতে ও প্রতিফলিত হলো। অবশ্য এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে পেতে আরো অর্ধশতকেরও বেশি অপক্ষো করতে হলো। উপমহাদেশে বিগত শতকে

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতায় রূপ পেল। তার ফলে ভারতে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার বিকাশে তেমন জোর এলো না। বাংলা প্রেসিডেন্সিতে অবশ্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে এদিকে সাময়িক হলেও খানিকটা দৃষ্টি পড়ে। তবে বৃহত্তর ভারতীয় উপনিবেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি আমূল দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ধর্মে আশ্রয় উপমহাদেশে গঠিত হলো দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে হলো পাকিস্তান। আর বাকী গোটা দেশ হলো ভারত। বৃটিশ শাসনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে বাংলায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পূর্ববাংলায় কিন্তু পাকিস্তানি জাতীয়বাদ মোটেও শিকড় প্রবেশ করাতে সক্ষম হলো না। শুরুতেই ভাষার দাবি পূর্ব অঞ্চলের বাঙালিদের স্বতন্ত্র বাংলাভাষা আন্দোলনের জন্ম দিল এবং বাঙালি তরুণরা ভাষার জন্য আত্মবলিদান সংবিধানই রচনা করা গেল না । এবং যখন ১৯৫৬ সালে একটি সংবিধান চালু হলো তা বাঙালিদের সন্তুষ্ট করতে পারলো না। সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে পূর্ববাংলা হলো বঞ্চিত ও অবদমিত এলাকা। বাংলাদেশের সামাজিক সমতা, ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র্যেও ধারা এবং গণতান্ত্রিক আচার আচরণের সমতুল্য কিছুই পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল না। সেখানে ছিল একটি সামন্ত্রতান্ত্রিক মনোভাব এবং অনুক্রমী সমাজ ব্যবস্থা। পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের সমরিক শাসন (পরোক্ষভাবে ১৯৫৩ সাল থেকে এবং সরাসরি ১৯৫৮ সাল থেকে) বাঙালিদের বঞ্চনা, নির্যাতনও মনো যাতনা বাড়িয়েই চললো। সর্বোপরি পাকিস্তানের তেইশ বছরে অর্থনৈতিক বৈষম্য এমনি বাড়লো যে অধিক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে দারিদ্রতা বেড়ে চললো, জাতীয় সম্পদের প্রবৃদ্ধি হলো বিঘ্নিত এবং এমন কি শিক্ষায়ও তারা পিছিয়ে পড়তে থাকলো। স্বরণ রাখা দরকার যে ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানেরর চেয়ে অনেক এগিয়েছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে যে সমাজ সহস্রাধিক বছর গড়ে উঠেছে তা বস্তুতপক্ষে সংশ্লেষী নয়,বরং যৌগিক । সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যও হয় জাতীয়তার অন্যতম উপাদান।

### ৮.৪ পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিচ্ছেদ প্রক্রিয়াঃ

পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদের যাত্রা শুরু হলো ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দিয়ে। ১৯৫০-এ মতান্তর ঘটলো গণতন্ত্রের রূপ নিয়ে। জনগণের ভোটাধিকার খর্ব করা যাবে না,বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মানতে হবে, হাজার মাইলের দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন একটি দেশে কেন্দ্রীভূত সরকার চলবে না,স্বায়ত্বশাসন হতে হবে ব্যাপক –সংবিধান রচনায় এইসব সমস্য সামনে এসে দাড়ায়। ১৯৫২ সালে আবার রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন সামনে এলো। ১৯৫৪ তে সারা দেশ গণবিচ্ছিন্ন ও দেশের স্বার্থ-সমর্পণকারী মুসলিম লীগ সরকারকে ভোটের মাধ্যমে গদীচ্যুত করে। একই সময়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তাতে কেন্দ্রীভূত সরকারেরর ও উন্নয়ন কৌশলের যথার্থতা নিয়ে শুরু হলো আন্দোলন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পরোক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে ১৯৬৪ সালে আবার শুরু হলো সম্মিলিত বিরোধী দলের ভোটাধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। ১৯৬৬ সনে শেখ মুজিবর বাংলার মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবিনামা ঘোষনা করলেন। সর্ববিষয়ের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে পাকিস্তানে বাঙালিদের নিজেদের ভাগ্য নিজে নির্বাচানের ক্ষমতা দাবি করলো ছয় দফা কার্যক্রম। ঝগড়া ফ্যাসাদ এবং অভাব অভিযোগ সমাধানের জন্য শেখ মুজিব প্রস্তাব করলেন,"তুমিও বাচো এবং আমাকে বাঁচতে দাও।" পরবর্তী দুবছর ধরে চললো সামরিক বাহিনীর নির্যাতন, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা এবং সর্বশেষ দেশদ্রোহিতার মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা।

### ৮.৫ মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিরাষ্ট্রের অনন্য অভ্যুদয়

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সহিংস আন্দোলন এড়িয়ে যাবার জন্য ১৯৭১ সালের গোটা মার্চ মাস জুড়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলন চললো। সংলাপে আহবান জানালেন বাংলাদেশের নেতা। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা প্রকাশ্যে সংলাপে বসে আড়ালে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি পাকাপোক্ত করলেন। অবশেষে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার বানচাল করে কোনোরকম সাবধান বাণী না দিয়ে বা সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা না করে ২৫ মার্চের কালরাতে শুরু হলো পাকিস্তানের অপারেশন সার্চলাইট। নয় মাস ধরে চললো গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা। ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে হলো তাদের অভিষেক। মুজিবনগর সরকার ভারতে আশ্রয় পেল এবং শুরু থেকেই সামরিক শক্তি সংগঠনে মনোনিবেশ করলো। মুক্তিবাহিনী ক্রমে লাখোর্ধ্ব যোদ্ধার বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠলো। তাদের প্রধান কৌশল হলো সীমান্ত এলাকায় সম্মুখ সমর এবং দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা। সারাদেশে নির্দিষ্ট গুটিকয় পাকিস্তানি সমর্থক ছাড়া সবাই গেরিলা যুদ্ধে মেতে উঠলো। কিন্তু নয় মাসের সুদীর্ঘকালে পাকিস্তান তার হত্যাকান্ড ও ধ্বংসলীলায় কোনো বিরতি টানলো না। কোনোরকম আপোসেরও ব্যবস্থা নিল না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সংলাপের পরিবর্তে তারা শুরু করলো দেশদ্রোহিতার জন্য তার বিচার। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই সময় আন্তর্জাতিকভাবেও সঙ্কট সমাধানের কোনো সুযোগ সৃষ্টি হল না। অবশেষে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিতাড়নের জন্য চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হলো। কোটি কোটি বিরোধীর সমুদ্রে পাকিস্তানের লাখ সৈন্য আর প্রায় অর্ধলক্ষ রাজাকার তখন কোনো উপায় দেখছে না, তাদের নৈতিক কোনো শক্তি নেই। তারা ছাউনির বাইরে টহল দিতে ভয় পায়। এই সময়ে ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ পেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারি কামান ও অস্ত্রসম্ভারের সমর্থন। বিপর্যস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তখন নেতৃত্বের দারুন সঙ্কট দেখা দেয়। পশ্চিমের অপদার্থ এবং অসৎ ইয়াহিয়া জান্তা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ৩ ডিসেম্বর এই বেপরোয়া আত্মঘাতী জান্তা ভারতের পশ্চিমম সীমান্তে বিমান আক্রমণ করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু

*Dhaka University Institutional Repository*

হলো ভারত পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধ। পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি যুদ্ধবিরতি। তাতে তারা বাংলাদেশে কিছুটা হলেও দখল রাখতে পারবে, নতুবা সেখান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের সুযোগ পাবে। তাদের বন্ধু ও সমর্থ আমেরিকা ও চীনের সহায়তা সম্বন্ধে তারা ছিল নিশ্চিত। ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সমাধানে বাধ সাধলো এবং বাংলাদেশের মুক্তি নিশ্চত করবার জন্য আর এক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সামরিক কমান্ড গঠন করলো। মার্কিন ও চীনের উদ্যোগে যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রয়াসের অন্ত ছিল না কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার উপর্যুপরি তিনটি ভেটো পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে পলায়নের কোনো সুযোগ দিল না। আত্মসমর্পন ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর রইলো না। সরাসরি মার্কিন বা চীনা হস্তক্ষেপ ছাড়া পাকিস্তানের বাঁচবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ছিল এবং তদপুরি পাকিস্তানের টিকে থাকারও কোনো সময় ছিল না। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড আত্মসমর্পন করলো। বাংলাদেশ হলো রাহুমুক্ত। নয় মাসের ভয়াবহতার হলো অবসান। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলো মুক্ত ভূখন্ডে। এভাবে নতুন জাতিরাষ্ট্র উত্থানের সকল মৌলিক উপাদান (জাতীয়তাবোধ,গণতন্ত্র,ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক মুক্তি) ইত্যাদিও সুশৃংখল সন্নিবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক নতুন জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব হলো।

Dhaka University Institutional Repository

## উপসংহার:

রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'জাতি' বলতে কোনো নরগোষ্ঠীগত কিংবা উপজাতীয় প্রপঞ্চকে বোঝায় না। জাতির রয়েছে পাঁচটি অপরিহার্য উপাদান তথা বৈশিষ্ট্য। এগুলো হচ্ছে একটি রাষ্ট্র, ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত একটি সম্প্রদায় (সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় অর্থে নয়), একটি অভিন্ন ভাষা, একটি সুস্পষ্ট অঞ্চল, অর্থনৈতিক সংহতি এবং যৌথ চরিত্র। মানব ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট কালপর্বে, বিশেষ করে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যুগে অর্থাৎ সাম্যবাদের বিপরীতে জাতিসত্তা একটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। তাই 'জাতি' (ন্যাশন) একটি ঐতিহাসিক সত্তা। প্রত্যেক দেশে জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও পরিণতির প্রশ্নটি তার সমাজ কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের সাথে জড়িত। জাতিসত্তার মৌলিক উপাদান হচ্ছে ভাষা, যা মানুষের শ্রম থেকে প্রথমে উদ্ভব হয়। সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এর বিকাশ ঘটে। সেজন্য ভাষাকে একটি সামাজিক প্রপঞ্চ (ফেনমেনন) বলা হয়। ভাষা মানুষের কর্মকান্ডকে সুসংবদ্ধ করে। উহা একদিকে মানুষের চিন্তা ও প্রকাশের রূপ মাত্র, আবার অন্যদিকে মানুষের চেতনা সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের চিন্তা চেতনা কখনো ভাষা নিরপেক্ষ হতে পারে না। লেনিনের কথায় প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রত্যেকটি বাক্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। তথাপি ভাষা ও চিন্তা কিন্তু অভিন্ন নয়। জন্ম লাভের পর পরই ভাষা আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র সত্তা অর্জন করে। আর এর ফলেই এটা জাতিসত্তার প্রধানতম উপাদানে পরিণত হয়। আধুনিক বিশ্বে জাতি রাষ্ট্র হচ্ছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক একক। স্পষ্টতই এটি সবসময় ছিল না। যদিও উপজাতীয় সমাজ, নগর রাষ্ট্র (প্রাচীন গ্রিসের) প্রাচীন সাম্রাজ্য সমাজের প্রত্যেকটি এক একটি সুনির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা সমন্বিত। এসবের প্রত্যেকটি কোনো না কোনো ধরনের বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক সংহতি সৃষ্টি করে। কিন্তু জাতি রাষ্ট্রের আবির্ভাব অবশ্যই অত্যন্ত আধুনিককালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় মূলত ধনবাদের বিকাশের কারণে। এর পিছনে যে দুটি প্রধান শর্ত কার্যকর ছিল। সেগুলো হচ্ছে আধুনিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন। শেষোক্ত শর্তের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী সামাজিক গোষ্ঠীর আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এদের থাকবে একটি সুচিহ্নিত সাংস্কৃতিক পরিচয়, যারা স্বৈরতন্ত্রের স্থলে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমাজবিজ্ঞানে এ উপাদানটিকেই সঙ্গতকারণে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় বুর্জোয়া শ্রেণী আঠারো শতকে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে সমাজ কাঠামোয় আত্মপ্রকাশ করার ফলে সেখানে জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। কিন্তু ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী দুর্বল অবস্থানে বিদ্যমান ছিল সেখানে জাতীয়তাবাদ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এ রকম পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদই জাতি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে জাতিসত্তা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার বেলায় বস্তুত তাই ঘটেছিল। সে যা হোক, আধুনিককালে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকে আমরা যে পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করি না কেন সমাজবিজ্ঞানে এটি একটি স্বীকৃত 'শ্রেণী আন্দোলন' ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর এ শ্রেণী আন্দোলনের আসল লক্ষ থাকে সর্বসাধারণের সংগ্রামের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে একান্তরে আমরা যে বাঙালী জাতীয়তাবাদভিত্তিক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি তার পিছনে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর আকাংখাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। আর এটি কোন অভিনব আবিষ্কারও নয়। কেননা ১৭৭৬ সনে সংঘটিত আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী ইতিহাসের প্রথম 'জাতি' প্রতিষ্ঠা হিসেবে শনাক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, ১৭৮৯ সনে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এখানে এ কথাটি বলা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লব যৌথভাবে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে এমন এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যার মাধ্যমে আমরা আধুনিক নাগরিকত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণার সন্ধান পাই। সেজন্য বাংলাদেশের বাহাত্তরের সংবিধানে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস একথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিধৃত। তবে এর সাথে আমাদের এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর সর্বত্র জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অভিন্ন ধারায় ঘটেনি। সবদেশেই এক্ষেত্রে নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ধারা অগ্রসর হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট কালপর্বে, বিশেষ করে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যুগে অর্থাৎ সাম্যবাদের বিপরীতে জাতিসত্তা একটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। তাই 'জাতি' (ন্যাশন) একটি ঐতিহাসিক সত্তা। প্রত্যেক দেশে জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও পরিণতির প্রশ্নটি তার সমাজ কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের সাথে জড়িত। জাতিসত্তার মৌলিক উপাদান হচ্ছে ভাষা, যা মানুষের শ্রম থেকে প্রথমে উদ্ভব হয়। সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এর বিকাশ ঘটে। সেজন্য ভাষাকে একটি সামাজিক প্রপঞ্চ (ফেনমেনন) বলা হয়। ভাষা মানুষের কর্মকান্ডকে সুসংবদ্ধ করে। উহা একদিকে মানুষের চিন্তা ও প্রকাশের রূপ মাত্র, আবার অন্যদিকে মানুষের চেতনা সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের চিন্তা চেতনা কখনো ভাষা নিরপেক্ষ হতে পারে না। লেনিনের কথায় প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রত্যেকটি বাক্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। তথাপি ভাষা ও চিন্তা কিন্তু অভিন্ন নয়। জন্ম লাভের পর পরই ভাষা আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র সত্তা অর্জন করে। আর এর ফলেই এটা জাতিসত্তার প্রধানতম উপাদানে পরিণত হয়। আধুনিক বিশ্বে জাতি রাষ্ট্র হচ্ছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক একক। স্পষ্টতই এটি সবসময় ছিল না। যদিও উপজাতীয় সমাজ, নগর রাষ্ট্র (প্রাচীন গ্রিসের) প্রাচীন সাম্রাজ্য সমাজের প্রত্যেকটি এক একটি সুনির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা সমন্বিত। এসবের প্রত্যেকটি কোনো না কোনো ধরনের বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক সংহতি সৃষ্টি করে। কিন্তু জাতি রাষ্ট্রের আবির্ভাব অবশ্যই অত্যন্ত আধুনিককালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় মূলত ধনবাদের বিকাশের কারণে। এর পিছনে যে দুটি প্রধান শর্ত কার্যকর ছিল। সেগুলো হচ্ছে আধুনিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন। শেষোক্ত শর্তের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী সামাজিক গোষ্ঠীর আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এদের থাকবে একটি সুচিহ্নিত সাংস্কৃতিক পরিচয়, যারা স্বৈরতন্ত্রের স্থলে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমাজবিজ্ঞানে এ উপাদানটিকেই সঙ্গতকারণে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় বুর্জোয়া শ্রেণী আঠারো শতকে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে সমাজ কাঠামোয় আত্মপ্রকাশ করার ফলে সেখানে জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। কিন্তু ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী দুর্বল অবস্থানে বিদ্যমান ছিল সেখানে জাতীয়তাবাদ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এ রকম পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদই জাতি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার বেলায় বস্তুত তাই ঘটেছিল। সে যা হোক, আধুনিককালে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকে আমরা যে পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করি না কেন সমাজবিজ্ঞানে এটি একটি স্বীকৃত 'শ্রেণী আন্দোলন' ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর এ শ্রেণী আন্দোলনের আসল লক্ষ থাকে সর্বসাধারণের সংগ্রামের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে একান্তরে আমরা যে বাঙালী জাতীয়তাবাদভিত্তিক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি তার পিছনে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর আকাংখাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। আর এটি কোন অভিনব আবিষ্কারও নয়। কেননা ১৭৭৬ সনে সংঘটিত আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী ইতিহাসের প্রথম 'জাতি' প্রতিষ্ঠা হিসেবে শনাক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, ১৭৮৯ সনে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এখানে এ কথাটি বলা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লব যৌথভাবে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে এমন এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যার মাধ্যমে আমরা আধুনিক নাগরিকত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণার সন্ধান পাই। সেজন্য বাংলাদেশের বাহাত্তরের সংবিধানে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস একথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিধৃত। তবে এর সাথে আমাদের এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর সর্বত্র জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অভিন্ন ধারায় ঘটেনি। সবদেশেই এক্ষেত্রে নিজস্ব কতক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ধারা অগ্রসর হয়েছে। আর প্রত্যেক সমাজের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিও তার অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। যে সমাজের অর্থনীতি যত জনকল্যাণমুখী হবে ততই তার মাতৃভাষা গণমুখী সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। মার্ক্সবাদীরা ভাষাকে সমাজ কাঠামোর বুনিয়াদের অঙ্গীভূত, আর সংস্কৃতিকে তার বহিরঙ্গ বলে বিবেচনা করেন। সেজন্য ভাষার ওপর আঘাত করলে সমগ্র জাতি শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যাঘাত করতে উদ্যত হয়। মাতৃভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ব্যতীত কৃষক, শ্রমিক ছাত্র ও শিক্ষিত মধ্যসস্তরের জনতাসহ সমাজের ব্যাপক অংশ হয় ঐক্যবদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষার প্রশ্নে সমগ্র জাতি যখন সাড়া দেয় তখন সমাজের শ্রেণীগত বৈষম্য ঐক্য সৃষ্টিতে বাধা জন্মায় না। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে মাতৃভাষার সামগ্রিক সামাজিক সত্তা একমাত্র শ্রেণী শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সার্থক রূপ পেতে পারে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আদিম অর্থনৈতিক সত্তার অতিক্রমণের মাধ্যমে নদীমাতৃক বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে অতি সহজেই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এই কৃষি অর্থনীতির বিকাশ লাভের ফলে পাশ্চাত্য অর্থে পুরোপুরি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ গড়ে না উঠলেও বাংলাদেশের প্রাচীন যুগে জাতি বর্ণভিত্তিক এক ধরনের শ্রেণী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একথাও সত্য যে আর্য প্রভাবিত উত্তর ভারতে আর্য সৃষ্ট জাতি বর্ণ ব্যবস্থা যতটা পাকাপোক্ত হয়ে জেঁকে বসে অনার্য অধ্যুষিত পা-ব বর্জিত বাংলাদেশের নরম পলিমাটিতে সেটা খুব শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু বাংলার সামন্ত শাসকশ্রেণী ব্রাহ্মণদের দ্বারা সেখানে মাঝে মাঝে এটাকে মজবুত করার প্রয়াস পেয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার দুর্বল অবস্থানের অন্যতম কারণ হচ্ছে জাতিবর্ণ বিরোধী বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব এবং শেষোক্ত ধর্মের প্রতিরোধে কিংবা এর সাথে সমঝোতা স্থাপনের স্বার্থে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা। উল্লেখ্য, বাংলায় শিল্প ও ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এসব ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বণিক শ্রেণীভুক্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে বাংলা ভাষার বর্ণমালা এক সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদ্যজাতি বর্ণভুক্ত সেন রাজাদের আমলের চেয়ে বৌদ্ধ পাল রাজা ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়। আপেক্ষিকভাবে শেষোক্তদের আমলে সৃষ্ট সাহিত্যে মানবিক উপাদান বেশি পরিলক্ষিত হয়। মোট কথা, ঐ সময় বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের একটা সামাজিক ভিত্তি রচিত হয়। কিন্তু এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ সময়ে বাংলার শাসক শ্রেণীর লোকেরা কখনো সর্ব সাধারণের ভাষা বাংলাকে ব্যবহার করত না। ধর্মীয় ও কোর্ট কাচারির ভাষা হিসেবে হিন্দু আমলে সংস্কৃত ও মুসলিম আমলে আরবি পারসি ব্যবহৃত হত। সেরূপ ব্রিটিশ আমলে বিদেশী ভাষা ইংরেজি পূর্ববর্তী কোর্ট কাচারির ভাষা পারসির স্থান দখল করল। বাংলা ভাষা তখনো শাসক শ্রেণীর কাছে অবহেলিত রইল। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে কমপক্ষে এক হাজার বছর ধরে বাংলার রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের মধ্যে গ্রামীণ সমাজে কৃষি ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত জনসাধারণই বাংলা ভাষাকে তাদের মনের মণিকোঠায় সযত্নে লালন করে আসছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙলার সমাজে উচ্চ শ্রেণী বলে কথিত 'শরীফ' মুসলমানরা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। তারা জনসাধারণের মাতৃভাষা বাংলাকে কখনো নিজের মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করেননি। কাজেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে মূলত পরবর্তীকালে যে বাঙালি জাতি সত্তার বিকাশ ঘটে তার বাস্তব সামাজিক ভিত্তি হল বাংলার গ্রামীণ শিল্পী ও কৃষক সমাজ। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার অব্যবহিত পূর্ব থেকেই বাংলার ব্যতিক্রমধর্মী ভূমি ব্যবস্থা ও মহাজনী কারবারকে কেন্দ্র করে সমাজ কাঠামোয় একটি মধ্য সত্তার গড়ে উঠে। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দী হচ্ছে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারে এমন শক্তি তখনো অর্জন করেনি। উত্তর ভারতের মতো বাংলাদেশের জাতি বর্ণ ব্যবস্থা কঠোরতা ধারণ না করলেও পাশ্চাত্যের সমাজ কাঠামোর ব্যবসায়ী শ্রেণী যে রূপ পদমর্যাদা ভোগ করত বাংলাদেশের হিন্দু সামাজিক স্তর বিন্যাসে বৈশ্য জাতি বর্ণভুক্ত, গোষ্ঠীগুলো পর্যাপ্ত সামাজিক সম্মান লাভ করেনি। বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্ম তত্ত্বগতভাবে হিন্দু জাতি বর্ণ প্রথাবিরোধী হলেও উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো গুণগত পরিবর্তন না আনার ফলে এদের সংস্কারমূলক কর্মকান্ড শুধু উপরিকাঠামোগত সামান্য রদবদলে তজ্জন্য সাধারণভাবে গ্রামীন জীবনযাত্রা ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যখন বাংলা তথা ভারতবর্ষে বৈশ্য জাতি বর্ণভুক্ত গোষ্ঠিগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পুজিবাদী শ্রেণী প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এছাড়া, একদিকে এরা দেশীয় সামন্ত রাজন্যবর্গের সুনজরে ছিল না, আবার অন্যদিকে বিদেশী বণিকগোষ্ঠি ভারতীয় সামন্ত শাসকবর্গের আনুকূল্য লাভ করায় বিদেশী বনিকের মানদ- প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে রাজদ-রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতের পাশ্চাত্য ধরনের পুজিবাদ বিকাশের অসুবিধা প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতীয় জাতি বর্ণ সংবলিত সমাজ কাঠামো ছাড়া আরো দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে ভারতীয় ধর্মের পুজিবাদ বিরোধী ভূমিকা। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের প্রোটোস্ট্যান্ট ধর্ম যেরূপ সমাজ জীবনে যুক্তিশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে ধনতান্ত্রিক মনোভাব সৃজনে সহায়তা করেছিল কোনো ভারতীয় ধর্মই সে ধরনের ভূমিকা পারন করতে পারেনি। এমতের প্রবক্তা হচ্ছেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার। ভারতে পুজিবাদ বিকাশ প্রসঙ্গে তিনি কী মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। মাক্স ওয়েবার ভারতে প্রভূত ধনসম্পদ সঞ্চিত হওয়ার কথা উলেন্নখ করে বলেছেন ভারতে পুজিবাদের স্বতন্ত্র সূচনা কখনো ঘটেনি, এক্ষেত্রে যতটুকু বিকাশ হয়েছে ততটুকু বিদেশী শাসনামলেই হয়েছে। জাতিসত্তার বিকাশের দিক থেকে উক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে বনিক শ্রেণীর জাগরনের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুজিবাদী বিকাশের ফলশ্রম্নতি হিসেবে যে জাতিসত্তার জন্ম হতে পারত তা উপযুক্ত কারনের জন্য স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করতে পারল না। অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাশ্চাত্য ধরনের সামনস্ক পুজিবাদী অর্থনীতির আওতায় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটল। যেহেতু জাতিসত্তা মুলত ধনবাদী বিকাশের ফল সেহেতু কেন প্রাক ব্রিটিশ যুগে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে জাতি বর্ণ ভিত্তিক ভারতীয় সামনস্কবাদী সমাজের অভ্যনস্করে পাশ্চাত্য ধরনের পুজিবাদী অর্থনীতি গড়ে উঠল না সে প্রশ্নটি আজো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্যের মতো ভারতে ধনবাদী অর্থনীতির বিকাশ না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে প্রাক ব্রিটিশ যুগের ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার আনুষ্ঠানিক অনুপস্থিতি। অর্থাৎ ভারতে পুজিবাদের পূর্বতন উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্তবাদের অপূর্ণ বিকাশ কিংবা এক ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী সমাজ কাঠামোর উদ্ভব। এ মতবাদের মুল প্রবক্তা হচ্ছেন কার্ল মার্ক্স। সে যা হোক বাংলার সামাজিক ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় এক শ বৎসর পূর্ব থেকে বাংলার ভূমি ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য ধরনের ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি শুরু হয়েছে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার মাধ্যমে শুধুমাত্র এর আগে যা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুপস্থিত ছিল

Dhaka University Institutional Repository

তাকেই আইনানুগভাবে স্বীকার করে নেওয়া হল। আর এভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের ধারা একটু অগ্রসর হল। ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিপ্লবের সময় ইংল্যান্ডে শিল্প পুঁজিপতিদের শাসন শুরু হয়। ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভারতবর্ষের বাজার তখন ব্রিটিশ পণ্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী ঔপনিবেশিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এর ফলে কৃষক শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত জনগনের অসন্তোষ দানা বাধতে থাকে। এই পটভূমিতে ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের কৃষি বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এ. ও. হিউমের উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছর (১৮৫৮ ইংরেজি) বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় একসাথে প্রতিষ্ঠিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশে সমাজ কাঠামোয় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করে। আর এদের প্রায় সকলেরই রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে বিশেষ করে, বাংলায় উক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ জাতি বর্ণভূক্ত হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগে বিদেশী ব্রিটিশ শাসকবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একমাত্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠিকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ এবং এর দুই তিন বৎসর পর গোড়া হিন্দুদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে হিন্দু মহাসভার জন্ম দেয়। এরই পরিণতি হিসেবে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে এরূপভাবে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে উপমহাদেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলগুলো দাবি উত্থাপন করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলার মুসলিম লীগ বিরোধী ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মুসলিম প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন কৃষক প্রজাপার্টি ১৯৪৩ সালে সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। বাংলার কৃষকদের বেতর এ ধরনের চেতনার সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ ১৯৪৭ সালের ২৭ শে এপ্রিল কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে যুক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বাংলার মুসলিম লীগের বামপন্থী সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এবং বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রগতিশীল নেতা শরৎ বসু সোভারিং এন্ড ইউনাইটেড স্টেট অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। (কিসিং কনটেমপোরারি আরকাইভস ১৯৪৬-৪৮, পি-৮৬৩৪)। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি, মানবেন্দ্র নাথ রায়ের রেডিক্যাল ডেমোক্রোটিক পার্টি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠন এ প্রস্তাব সমর্থন করে। অপরদিকে ভাষাভিত্তিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রগঠনের বাঙ্গালি নেতৃবর্গের এ পরিকল্পনা কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক অনুপ্রানিত এই অজুহাত তোলে বিভেদকামী ব্রিটিশ শাসকবর্গ, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ এটা গ্রহণ করেননি। (দ্রষ্টব্য : দি ইন্ডিয়ান এনুয়াল রেজিস্টার, জানুয়ারি -জুন ১৯৪৭, ভলিউম ১, পৃ-১৮৩ এবং ২৬৬ ডি এন বানার্জি, ইস্ট পাকিস্তান কেস স্টাডি ইন মুসলিম পলিটিকস পৃ-১৭০-৮ দি ডন (দিলস্নী) ১০ ই জুন ১৯৪৭ জন স্টিপেন্স পাকিস্তান, ওল্ড কান্ট্রি নিউ ন্যাশন: পৃ২০১)। প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তখনো এত ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি যাতে তারা ব্রিটিশ শাসকবর্গ ও

Dhaka University Institutional Repository

তার সহযোগী ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত চাপকে সার্থকভাবে প্রতিহত করতে পারে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে বাংলার কৃষকদের শ্রেণী সংগ্রাম পর্যন্ত বিপথগামী হয়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে চৌদ্দশত মাইলের ব্যবধানে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে পাচটি ভাষাভাষী জাতি গোষ্ঠি সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এক রাষ্ট্র এক ধর্ম ও এক ভাষার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি বুর্জোয়া, সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শাসনকগোষ্ঠি পাকিস্তানে বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানকে কার্যত একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত করার পায়তারা গোড়া থেকেই শুরু করে। শুধু তাই নয়, তারা একসাথে পশ্চিমাঞ্চলের ব্রিটিশ বিরোধী, স্বাধীনচেতা বেলুচ ও পাঠানদের উপযুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমাঞ্চলের চারটি ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠিকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করা হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের মাতৃভাষা বাংলার উপর চরম আঘাত হানা আরম্ভ হয়। ফলে ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে মুলত পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে স্বাতন্ত্রশাসন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তান ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চরম মার খায়। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল আমেরিকা প্রথমে স্বাধীন ভারতকে বাগে আনার প্রয়াস পায়। কিন্তু কতকটা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ও সামাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় সমৃদ্ধ নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়তে নারাজ হওয়ায় পাকিস্তানের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের পরিবর্তে ১৯৫০ সাল থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরংকুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি ঘোষিত হয়, যা ঐ বৎসরের মে মাসে সম্পাদিত হয়। ১৯৫২ সালের সাফল্যজনক বাংলা ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী একটি মোর্চা গঠন করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদ পুষ্ট মুসলিম লীগ উক্ত নির্বাচনী যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। বস্তুত ঐ সময় থেকেই বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্ত পররাষ্ট্রনীতির দাবি গণাতন্ত্রিক প্রগতিশীল মহল থেকে একযোগে জোরেশোরে উচ্চারিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পাকিসত্মান নামক রাষ্ট্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব থেকেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের ভারত শাসনের ক্ষমতা পাকিস্তানের করার প্রস্তুতি পর্বে পাকিসত্মানের ভাবী রাষ্ট্রনায়কদের ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগকে এমনভাবে পরামর্শ দেওয়া শুরু করে যে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে পূর্ব পাকিসত্মানের উপর পশ্চিম পাকিসত্মান ভিত্তিক পাকিসত্মানি শাসকবর্গের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অতএব ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে উলিস্নখিত অটোনোমাস ফর্ম অব পাকিস্তানকে সামরিক ও ভৌগোলিক দিক বিবেচনা করে ইউনিটারী পাকিস্তান এ পরিণত করার প্রস্তাব পূর্ব বাংলার মুসরিম লীগের প্রগতিশীল সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের প্রতিবাদ সত্বেও অগণতান্ত্রিকভাবে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন না ডেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রধান কর্তৃক আহুত মুসলিম লীগ দলীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের ১৯৪৬ সালের ৯ ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় পাস

Dhaka University Institutional Repository

করিয়ে নেওয়া হয়। মূলত, ভারতীয় মুসলিম বুর্জোয়া, সামনন্ত প্রভু ও বুদ্ধিজীবীদের (যাদের বেশিরভাগই ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত পরই পশ্চিম পাকিসত্মানে চলে আসে) স্বার্থে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের অনুপ্রেরণায় এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। আমার উপযুক্ত বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নে কতকগুলি প্রমাণ উপস্থাপিত করছি। তৎকালীন বাংলার গভর্নর আর জি কেসীর সাথে বেঙ্গল মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। লাহোর প্রসত্মাব ভিত্তিক পাকিস্তানের কাঠামো সম্বন্ধে কেসী সাহেবের দুশ্চিনত্মার অনত্ম ছিল না। ১৯৪৫ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি তার ডায়েরিতে কী লিখেছিরেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সোভিয়েত ইউনিয়ন সেসময় পূর্নগঠন ব্যস্ত ও চীন তখনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে ব্রিটিশ শাসকবর্গ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সাহস ও শক্তি প্রত্যৰ করেছে তাতে এবং আরেকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চীনের অবুযদয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তাদের আতঙ্কিত হবার যথেস্ট কারণ ছিল। (প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬১)। কেননা নব্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। আর এৰেত্রে এই উপমহাদেশের সীমান্তবর্তী দুটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থান সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে খুবই আশঙ্কার কারণ হয়ে দাড়ায় বৈকি। সে যা হোক পাকিস্তান আমলে গোড়র দিকে পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাসা আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ জাতি রাষ্ট্র গঠনের যে অঙ্কুরোদগম ঘটে, তাহাই গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তির দুই দশক কাল নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলে ১৯৭১ সালে বাসত্মব রূপ পরিগ্রহ করে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাজদ বিভ্রান্ত চীনা নেতৃত্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠি পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের জনগনের বিরুদ্ধে মদদ যোগায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিক কারণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপ গ্রহণ করে। বর্তমান বিশ্বের যে কোনো দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপ ধারণ না করে পারে না। আর এজন্যই বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র যে কোনো দেশের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করে। বাংলাদেশে একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান আমলের সুদীর্ঘকালের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামই শুধু সাফল্য লাভ করে নি এটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করায় বাংলাদেশ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির অনুসৃত মার্কিন সামম্রাজ্যবাদ নির্ভর পররাষ্ট্র নীতির শৃঙ্খল থেকেও অব্যাহতি পায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিরোধী জোট সেন্টো ও সিয়াটোর সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের আর কোনো সম্পর্ক রইল না। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবি সাফল্যমন্ডিত হয়। সুদীর্ঘ পচিশ বছরের সংগ্রামের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই নীতি চতুষ্টয় গৃহীত হয়। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ঘটায় উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মুলনীতিগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

*Dhaka University Institutional Repository*

হয়। ফলে বাংলাদেশের সমাজ প্রগতির ধারা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। তবে ইতিহাসের ধারাকে কেউ চিরদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, কেবলমাত্র বিলম্বিত ও বিপথগামী করতে পারে। বাংলাদেশের শোষিত জনগণ শ্রেণী সচেতন ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলেই ব্যাপক অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম শুরু হবে এবং তারই ফলশ্রুতিতে শোষণ মুক্ত সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। এজন্য একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ঐক্য একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় সামন্তবাদী উপাদানগুলোর সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে, অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে প্রতিহত করে এবং রাজনীতি ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় মৌলবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান ধারণার অনুপ্রবেশ চিরতরে রুদ্ধ করে প্রথমে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে হবে। আর এর মাধ্যমেই জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংস্কৃতি সংহত সংরক্ষিত ও সমৃদ্ধ হবে। বস্তুত, সামন্তবাদ, মৌলবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালি জাতিসত্তার সার্থক পরিণতি ঘটানো সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জী

## বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

আকাশ, এম,এম (১৯৯০) *ভাষা আন্দোলনঃ শ্রেণী ভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*। ঢাকাঃ ইউ,পি,এল গবেষণা কেন্দ্র।

আজাদ, আব্দুর রহিম ও রেজা শাহ আহমদ (১৯৮৭) *বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা*, ঢাকা, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ।

আজাদ, লেনিন (১৯৯০) *বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোঃ প্রত্যয়গত সমস্যা ও তিন দশকের পরিবর্তন*।

আবদল্লাহ, কাজী আবু মোহাম্মদ, ও সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ (১৯৭০) *ঢাকাঃ সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ*।

আরিফ, কাজী (১৯৮৯) *"তিন দশকের ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রলীগের ইতিহাস", তারোকালোক জানুয়ারী ১-১৪.*

আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৮৯) *শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আহমদ আবুল মনসুর (১৯৬৮) *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।

আহমদ, আলাউদ্দীন, *মাওলানা ভাসানী ও শাহপুর কৃষক সম্মেলন মজলুম জননেতা*

আহমদ, কামরুদ্দীন (১৯৮২) *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং তারপর*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ।

আহমদ, কামরুদ্দীন, (১৩৮২) *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ (দ্বিতীয় খন্ড)*, ঢাকা, ইনসাইড লাইব্রেরী।

আহমদ, ফয়েজ, (১৯৮৮) *সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগত চেতনা মওলানা ভাসানী মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, ২য় সংস্করন, ঢাকা, *বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি* (প্রকাশকাল নেই)।

ইসলাম, সিরাজুল, (১৯৯৩) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা, এপিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম, মোঃ নজরল, (২০০৯) *রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*, ঢাকা, প্রগতি পাবলিশার্স ।

উমর, বদরুদ্দীন, (১৯৮৭) *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।

*Dhaka University Institutional Repository*

উমর, বদরুদ্দীন, (১৯৮৫) *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা, বইঘর।

উমর, বদরুদ্দীন, (১৯৮৪) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক*, ঢাকা, মাওলা বাদাস।

এঙ্গেলস্, ফ্রেডারিক, *জার্মানির কৃষক যুদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকা মাকৃস এঙ্গেলস রচনা সঙ্কলন*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় মস্কো, প্রগতি প্রকাশন।

এঙ্গেলস্ ফেডারিক, *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি মার্কস এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, ২য় অংশ প্রথম অংশ, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন।

এঙ্গেরস্ ফ্রেডারিক, *ই ব-ক সামীপে চিঠি মার্কস এঙ্গেরস রচনা সংকলণ দ্বিতীয় খন্ড*, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো জাতি প্রকাশন।

এ.এফ. এস আহমদ, (১৯৭৬) *সোস্যাল আইডিয়াজ এ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল*, ১৮১৫-১৮৩৫, কলিকাতা।

এ.আর.মলিক, (১৯৯২) *ব্রিটিশ পলিসি এ্যান্ড দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল*, ১৯৫৭, কলিকাতা ।

ওয়াকিল আহমদ, (১৯৮৫) *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ঢাকা।

করিম, আবদুল (১৯৯৩) *বাংলার ইতিহাস (মুঘল আমল)*, ১ম খ, রাজশাহী।

করিম, আবদুল প্রফেসর ড. আবদুল, (২০০৮) *বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী।

কবীর, মফিজুল্লাহ, (১৩৮১-৮২) *পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আন্দোলনঃ তুলনায় কয়েকটি দিক*, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ইতিহাস সমিতি, ।

কামাল, মেসবাহ, (১৯৮৬) *আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, বিবর্তন, ।

খান, আতাউর রহমান (১৯৭০) *স্বৈরাচারের দশ বছর*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ।

খান, মুহম্মদ আইয়ুব, (১৯৬৮) *প্রভু নয় বন্ধু*, ঢাকা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ।

খা, ফজলুর রহমান, *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীঃ শতাব্দীর নায়ক, (১৯৮৮) মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ।

চক্রবর্তী, রজনী কান্ত, (১৯৬৩) *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, ২য় ও ৩য় খ, কলিকাতা,

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত) (১৯৮৭) *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ।

*Dhaka University Institutional Repository*

সেহলবী, শাহেদ আহমদ (১৯৬৬) *পাক-ভারত যুদ্ধ-কয়েকটি বিশিষ্ট দিক*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

নহরহরি কবিরাজ (১৯৮২) *ওয়াহাবী এ্যান্ড ফরায়েজী রেবেলস্ ইন বেঙ্গল*, নয়াদিল।

ফরহাদ, মোহাম্মদ (১৯৮৭) *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

বন্দোপাধ্যায়, রাখাল দাস (১৯৭১) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খ, কলিকাতা, ২য় মুদ্রণ ।

বারানভ, এস;এস (১৯৮৬) *পূর্ববাংলাঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

বাসার, আবুল (১৯৭০) *৬-দফা বনাম পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন*, পাবনা, মোফাখখার চৌধুরী।

ভি.এ. স্থি , (১৯৫৮) *অক্সফোর্ড হিষ্টরি অব ইন্ডিয়া*, টি.জি.পি. স্পিয়ার কর্তৃক সংশোধিত।

*ভাসানী, মাওলানা* (১৯৮৮) ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৮১) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, আধুনিক যুগ, ৩য় সংস্করণ।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র (১৩৭৭) বাংলা সন *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, কলিকাতা ।

মহাপাত্র ড. অনাদিকুমার (২০০১) *রাজনীতিক সমাজততত্ব*, কোলকাতা, সুহৃদ পাবলিকেশন।

মাহমুদ ডঃ এ.বি.এম, ইসলাম ডঃ সিরাজুল, (২০০৬) বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।

মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী* (১৯৮৩) (অনুবাদ ও সম্পাদনা আ.ক.ম. যাকারিয়া), ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, সুখময় (১৩৭৭) *বাংলা সন বাংলার ইতিহাসের (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা।*

*মুখোপধ্যায়, সুখময়, (১৯৯৮) বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ), ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা ।*

মুহিত, আবুল মাল আবদুল, ২০০০ *বাংলাদেশ : জাতি-রাষ্ট্রের* উদ্ভব; ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ।

রবার্টস পি.ই., (১৯৫২) *হিষ্টরি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*।

রশিদ-হারুন-অর, (২০০১) *বাঙালী ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, হাসিনা প্রকাশনা।

রহমান, শেখ হাফিজুর রহমান (২০০১) *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, ঢাকা, জোনাকী প্রকাশনী।

রহমান, আতিউর, ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি পৃষ্টা ৩০

*Dhaka University Institutional Repository*

রায়, নীহার রঞ্জন (১৯৪৯) *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব–কলিকাতা।

রায়, জয়ন্ত কুমার (১৯৮২) *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ২০০৯, ঢাকা, সুবর্ণ প্রকাশ

সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলাদেশের সুফী সাধক*, ঢাকা।

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৮১) *বাংলাদেশে ভূমিসংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্নয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃঃ ৩৪।

সুশীল (১৯৮২) *প্রাক পলাশী বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবন* (১৭০০-১৭৫৭) খ্রীঃ, কলিকাতা।

সেন, দনীশ চন্দ্র (১৯৪৯) বৃহৎ *বঙ্গ*, কলিকাতা।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (১৩৪১) বৃহৎ *বঙ্গ*, কলিকাতা।

সেলিম, গোলাম হুসাইন. *রিয়ায উস সালাতিন* (১৯৭৪) (অনুবাদ আকবর উদ্দীন), ঢাকা।

হক, ওয়াহিদুল, ভাষা আন্দোলন-পূর্ব বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস একটি দ্রুত দৃষ্টপাতঃ প্রবন্ধ বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, পৃষ্ঠা: ১-৬

হক, মুহাম্মদ ইনামূল (১৯৯৫) *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা।

....., *বাঙলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, (১৯৯৭) ঢাকা, ২য় সংস্করণ।

....."বাংলায় মুসলিম শাসনের আদি পর্ব (১২০০-১৩৩৮)", কলিকাতা, ১৯৮৭, মুখোপাধ্যায়,

Dhaka University Institutional Repository

## English Books and Articles:

Ahmed, Feroz, (1972) "Structure and Contradiction in Pakistan" *Imperialism and Revolution in South Asia* Edited by Kathleen Gough and Hari P. Sharma, New York: Monthly Review Press.

Ahmad, Kamruddin (1975) A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh Dacca: Inside Library.

Alavi, Hamza, (1976) "The Rural Elife and Agricultural Development in Pakistan, *Rural Development in Developing Societies* edited by Hamza Alavi and Teodor Shanin, London. The Macmillan Press.

Ali, Mohammad Mohar (1985) *History of the Muslims of bengal,* Vols I A & I B, Riyadh.

Blaut, James M. (1987): The National Question-Decolonizing the theory of Nationalism London: Zed Books Ltd.

Breuilly, John (1982): Nationalism and the state Manchester: Manchester University Press.

Burnel, Peter, J (1986) *Economic Nationalism in the Third World*, Colorado: Westview Press.

Callard, Keith, (1957) *Pakistan: A Political Study New York*, The Macmillan Company.

Chowdhury, A.M (1967) *Dynastic History of Bengal*, Dhaka,

Chowdhury, (1972) *The Genesis of Bangladesh*, Newyork : Asia Pulelishing House, p.7 (vii)

Dahl. Robert A (1967) *Pluralist Democracy in the United States*, Chicago: Rance McNally.

Davis, Horace B (1978) *Toward a Marxist Theory of Nationalism*, New York Monthly Review Press.

Dutta, K.R, Dasgupta and Chatterjee A (1973) *Bangladesh Economy: A Analytical Study Calcutta*, People's Publishing House.

Eaton, Firhard, M (1993) *The Rise of Islam and the Bengal Frontier,* (1204-1760 A.D.) University of California Press.

Ghosh, Shyamali (1990) *The Awami League: (1947-1971)*, Dhaka, Academic Publisher.

Dhaka University Institutional Repository

Jahan, Rounaq (1973) *Pakistan-Failure in National Integration*, Dacca, Oxford University Press.

Jahan Rounak (1972) Pakistan, *Failure in National Integration*, Newyork : Columlia University Press.

Jannuzi, ET and Peach, J.T (1982) *The Agrarian Structure of Bangladesh: an Impediment to Development*, Madras, Sangram Books.

Karim, Abdul (1959) *Social History of the Muslims of Bengal.* Dhaka.

Karim, K.M (1974) *The Provinces of bihar and Bengal under Shah Jahan*, Dhaka.

Khan, Mahmood Hasan (1981) *Underdevelopment and Agrarian Structure in Pakistan*, Colorado, Westview Press,

Kohn, Hans (1962) *The Age of Nationalism*, New York, Macmillan,

Majumd. R.C. (1943) *History of Bengal,* Vol. I, Dhaka University,

Nairn, Tom (1977) *The Breakup of Britain*, London, New Left Books,

Nasim, (2002) Lieutenant Genenal A S M, *Bangladesh : Fighls for Independence*, Dhaka, Cohemlia Prokashani.

Nayak, Pandav ed- (1984) Pakistan: Society and Polities, New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd. *The Pakistan Development Review*. Vol. XX, No. 4

Nayak, Pandav, "Political Economy of the State of Pakistan Pakistan", *Society and Politics*, New Delhi, South Asian Publishers Pvt. Ltd.

Pakistan, (1947-1967), Ministry of Economic Affairs Central Statistical Office, Twenty Years of Pakistan in Statistics,

Poulantzas, (1978) Nicos, *State, Power, Socialism*, London, New Left Books.

Rahim, M. Abdur (1963) *Social and Cultural History of Bengal,* Vol-I, Karachi.

Sarkar, N (1948) *History of Bengal,* Vol-2. Dhaka University

Sayeed, Khalid B (1968) *Pakistan: The Formative Phase 1857-1948*, London: Oxford University Press

Dhaka University Institutional Repository

Sayeed, Khalid B (1982) *The State, Industrialization and class formation in India,* London, Routledge and Kegan Paul,

Shafi, M (1969) *East Pakistan Labour Code-with Commentary Karachi*, Bureau of London Publications.

Shelly, Mizanur Rahman (1982) *Emengence of Bangladesh and Role of Awami League* New Delhi: Bikash Pakishing House.

Snyder, Louis L (1964) *The Dynamics of Nationalism: Readings in its Meaning and Development,* Princeton University Press,

Sombert, Werner (1968) *Socialism and the Social Movement,* New York, Augustus M. Kelly Publishers,

Stewart, Coarles (1913) *History of Bengal.* London

Stevens, Robert D.et.al.,-ed (1976) Rural Development in Bangladesh and Pakistan Honolulu, *An East West Center Book*

Tarafdar, M.R.*Hussain Shahi Bengal (*1998) *A Socio-Political Study (1493-1538 A.D.),* Revised edition, Dhaka

Vorys, Karl Von, (1965) *Political Development in Pakistan,* Princeton University Press.

Williams, Raymond, (1961) *Culture and Society: 1080-1950*, Harmonds Work: Pengain Books.

-------- Agriculatural Census, (1960) *Compiled from East Pakistan Statistical Digest 1965*, Dacca: EPBS. pp. 86 87.

Dhaka University Institutional Repository

Mr Arthur Bottomley (second from left), leader of the British Parliamentary delegation, and his three other members, Mr James Ramsden, Mr Toby Jessel and Mr Reg Prentice, on their arrival at Calcutta airport from Bangladesh on Monday.—Statesman.

# Reign Of Terror Persists In E. Bengal, Says British M.P.

By a Staff Reporter

[illegible] British M.P.s came to [illegible] by air from Dacca [illegible] afternoon. Their ob[illegible] the present situa[illegible] Bengal, [illegible] the following con[illegible] atmosphere of terror [illegible] Army-ruled East [illegible] are still fighting [illegible] situation"; people [illegible] chopped off, with bul[illegible] [illegible] the [illegible] [illegible] and [illegible] [illegible]

[illegible] Mr Arthur [illegible] Mr Reg Pren[illegible] both of whom were [illegible] Overseas Development [illegible] Mr James Ramsden, for[illegible] Conservative Secretary of [illegible] War and Mr Toby Jes[illegible] [illegible] They were re[illegible] Mr Asoke Roy, Joint [illegible] Ministry of External Af[illegible] [illegible] Deputy High [illegible] in Calcutta, Mr [illegible] and [illegible] Government [illegible] They are staying at Raj [illegible]

[illegible] addressing a Press con[illegible] in Dacca, Mr Toby Jessel [illegible] had evidence of [illegible] [illegible] persecution of Hin[illegible] East Pakistan. "We can[illegible] a reign of terror and expect the country to flourish economically," he added.

The Conservative M.P. said: "Continued sackings of villages and disappearance of local people add to fear. The Pakistani Army must stop trigger-happy and arbitrary units."

Mr Reg Prentice did not think that the evacuees should go back to East Bengal under the present situation, as "an atmosphere of fear" was persisting there. He said that there was complete Army rule there and that the people "are basically afraid of the military rule". He said that some sort of terror complex was prevalent in the eastern sector of East Bengal.

The team, which stayed in East Bengal for four days, visited Chuadanga, Rajshahi, Chittagong, Sylhet, Barisal, Dacca and Mymensingh by plane or by helicopter. Describing the tour, Mr Arthur Bottomley said that "we had a pretty wide journey in a helicopter flying low so that we could see everything." Mr Toby Jessel said that they saw few people in some places and some villages with demolished houses. Mr Jessel said that they were to have visited a village today but "we could not go there as the village had been completely sacked by the Pakistani Army and all sorts of obstacles were put to prevent our visit there".

Asked whether he thought there could be any political settlement in East Bengal, Mr Ramsden said that restoration of normal conditions was more pressing than a political settlement.

About the return of evacuees, Mr Jessel said that the Pakistan Government was disappointed with too small a number of refugees returning to the reception centres in East Bengal. He said that the Pakistan Government was expecting about 500 evacuees to return to the newly set up Chuadanga reception centre every day, but they saw only 200 refugees, including two Hindus, there.

Replying to a reporter, Mr Ramsden said that "parts of Dacca appeared to be normal but it could not be said there was normalcy there." Rail and steamer services in the country, he said, operated in limited areas.

Replying to a question whether he had seen any sign of persecution in East Bengal, Mr Bottomley said: "I would not like to use the word "persecution". The fact is that it happened and it must be stopped. We saw people with hands chopped off, with bullet wounds and still suffering."

The M.P.s will submit their reports to their respective party leaders on their return to England.

## Experts Framing New Constitution, Says Yahya

NEW DELHI, June 28—President Yahya Khan today disclosed plans to give Pakistan a new Constitution, report PTI and UNI.

In a 55-minute broadcast to the nation—his first since March 26—the President said he had already entrusted to a group of experts the task of framing a Federal Constitution "based on Islamic ideology" which would come into effect from the first session of the National Assembly the date of which he did not announce.

He said the experts group was preparing the Constitution as he had "come to the conclusion" that the task of framing the Constitution by the National Assembly was "not possible in the present circumstances".

The President said it was not his intention to hold fresh elections. The National and Provincial Assemblies would be revived under Martial Law and those who had indulged in "anti-State activities" would be disqualified and by-elections held to fill the vacancies. The Awami League remained banned and its representatives would participate in the Assemblies in their individual capacities.

While civilian Governments would be established under the new Constitution at the Centre

(Continued on page 7 col. 8)

# ইয়াহিয়ার প্রস্তাব নিতান্তই এক ধাপ্পা

—গার্ডিয়ান

নয়াদিল্লি, ২১ জুন—গতকাল জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে সব প্রস্তাব করেছেন, প্রধান প্রধান ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি আজ তাতে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। লন্ডনের গার্ডিয়ান-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (ইয়াহিয়া) সত্যকার কোন পরিকল্পনা ও প্রস্তাব দেননি। তাঁর প্রস্তাব নিতান্তই এক ধাপ্পা। এটা লজ্জার কথা। শেখ মুজিবর ও তাঁর দলের লোকেদের কার্যকলাপের জন্যই বাংলা দেশে সামরিক ব্যবস্থা নিতে হয় বলে পাক প্রেসিডেন্ট যে যুক্তি দিয়েছেন, তার উল্লেখ করে এই সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে: তিনি (মুজিবর) কখনও প্রকাশ্যে বলেননি যে তিনি [illegible] ব্যবহার করবেন।

[illegible]

রণাঙ্গনে মেশিনগান কাঁধে এক বীর মুক্তিযোদ্ধা

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ

SANGBAD

No. DA. 166, Po. Box No. 1228 Gram: SANGBAD

Tuesday, November 19, 1968



১৯শে নভেম্বর, ১৯৬৮ প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের নীতির প্রতিবাদে ঢাকায় আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিলের প্রথম সারিতে বাম দিকের ব্যানার বহন করছেন লেখক মুহাম্মদ নুরুল কাদির। তার পাশে ডঃ কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের ব্যানার বহন করছেন আল-মুজাহিদ, তার পাশে রয়েছেন আজিজুল হক (নান্না মিয়া)

পঃ পাকিস্তানে নির্যাতন-গ্রেফতারের প্রতিবাদে

## ঢাকায় আইনজীবীদের বিক্ষোভ-মিছিল



রণাঙ্গন পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহ্‌মদ

## Heath promises early reply to Mrs. Gandhi

By J. D. SINGH

"The Times of India" News Service

LONDON, August 13: The British Prime Minister Mr. Edward Heath, is believed to have promised an early reply to Mrs. Indira Gandhi's letter requesting him to use his influence with the Pakistani regime for the release of Sheikh Mujibur Rahman.

Mrs. Gandhi's letter was delivered to the British Prime Minister through the Indian High Commission in London yesterday. Similar letters have been sent by the Indian Prime Minister to leaders of other countries.

It is understood that Mr. Heath shares India's concern at the fate of the Awami League leader. Circles close to him feel that Sheikh Mujib's secret trial will not be conducive to a political settlement in East Bengal which Britain has stipulated as a pre-condition for resuming economic aid to Pakistan.

The trial will only exacerbate feelings in East Bengal against the Yahya regime and possibly bring retaliation from the Bangla Desh guerillas.

## বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাঙলা দেশের সমর্থনে প্রস্তাব

বুদাপেষ্ট, ১৮ই মে—হাঙ্গেরীর এই মনোরম রাজধানীতে গত ১৩ই থেকে ১৬ই মে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনের অধিবেশনে বাঙলা দেশের সমর্থনে জোরালো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ প্রস্তাবে বিশ্বের সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষকে ইয়াহিয়া খানের সরকার কর্তৃক পূর্ব-বাঙলায় গণহত্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো এবং বাঙলা দেশের সংগ্রামী মানুষকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্মেলনে স্বাধীন বাঙলা দেশ সরকারের ৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং তাঁরা অবিলম্বে বাঙলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান। বিশ্বশান্তি সম্মেলনের এই অধিবেশনে বাঙলা দেশের সমর্থনে পৃথিবীর সর্বত্র জনমত গঠন করবার জন্য বিশ্বশান্তি সংসদের পক্ষ থেকে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। আফ্রোশিয়ার বহু দেশ সহ পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বাঙলা দেশের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্মেলনে ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের পক্ষ

## পূর্ববাংলায় গণহত্যা চলছে

### ফরাসী লেখকের অভিমত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন—প্রখ্যাত ফরাসী লেখক শ্রীজয়ক্রেস ... ফ্রান্সের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র ... পলিটিক সে বাতিন'-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, পূর্ববাংলায় ব্যাপক গণহত্যা চলছে। প্রথমে ... ৭০ লক্ষ অ-মুসলমানকে হত্যা করে। পরে তা ... ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রী ... বলেন, ... অথবা বৃহৎ শক্তিগুলি যদি গণহত্যা বন্ধে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশে গণহত্যাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# দৈনিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

## রাজধানীতে ছাত্রদের বিরাট শোক মিছিল



### পিণ্ডি ও ... কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ



২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৯ পুলিশের গুলিতে আসাদুজ্জামান শহীদ হন। শহীদ আসাদুজ্জামানের স্মরণে মোহাম্মদপুরের 'আসাদ গেট' নামটি চালু হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের দমননীতি ও নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান মুহাম্মদ নূরুল কাদির পদত্যাগ করেন। দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রতিবেদন।

দৈনিক পয়গাম

ঢাকা : বুধবার ১৬ই আষাঢ় ১৩৭

# আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার কর্মকর্তা নির্বাচিত

ঢাকা, ২৯শে জুন।—গতকল্য সন্ধ্যায় ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়ন-এর অন্তর্গত দক্ষিণ কমলাপুর, আরামবাগ, পুরানা পল্টন, নয়া পল্টন, ফকিরাপুর, মতিঝিল, দিলকুশা, [illegible] (আংশিক) ইত্যাদি এলাকার মহিলাদের [illegible] উক্ত সভায় [illegible] দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি [illegible] করেন। উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস [illegible] আহম্মদ, ঢাকা সহর আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস সাজেদা চৌধুরী, দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মো: ওবর আলী ও সভাপতি এডভোকেট মো: নূরুল কাদের।

উক্ত সভায় দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার কার্যনির্বাহক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নির্বাচিত হন :—

(১) সভানেত্রী—মিসেস রাশিদা আখতার, (২) সহ-সভানেত্রী—মিসেস আলমাস খানম, (৩) সহ-সভানেত্রী—মিসেস ছালেয়ারা বেগম, (৪) সহ-সভানেত্রী—মিসেস তাবিন্দা আখতার, (৫) সাধারণ সম্পাদিকা—মিসেস শাহরিয়া কাদের (৬) যুগ্ম সম্পাদিকা—বেগম জাহা-[illegible] খাতুন (৭) যুগ্মসম্পাদিকা—মিস আখতার জাহান বেগম, (৮) সাংগঠনিক সম্পাদিকা—[illegible] আঞ্জুমান বানু, (৯) প্রচার সম্পাদিকা—মিসেস চামুনাহার বিবি, (১০) অফিস সম্পাদিকা—মিস হাসিনা তালুকদার, (১১) শ্রম-সম্পাদিকা—মিনুরানী রায়, (১২) কৃষি সম্পাদিকা—বেগম লুৎফুন্নেছা, (১৩) সমাজকল্যান সম্পাদিকা—মিস নিলুফা বেগম, (১৪) সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা—মিস নিলুফা বেগম, (১৪) সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মিস ফাব্রল ইয়াসমিন, (১৫) কোষাধ্যক্ষা—বেগম সামসুন নাহার।

উক্ত সভায় অল্পকিছু দিনের মধ্যেই দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মহিলা ও পুরুষ শাখার উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মী ভাই-বোনদের বক্তৃতা দেওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়মিত ক্লাশ আরম্ভ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository



১৯৭০ সালে ঢাকার ইডেন হোটেলের ময়দানে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের দৃশ্য। বাম দিক থেকে ৩য় ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য এডভোকেট মুহাম্মদ নূরুল কাদিরকে (মুজিব কোট গায়ে) দেখা যাচ্ছে। ফটো: দৈনিক ইত্তেফাক

# ক্ষমতা দখল নয়-দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে

## কাটাসুর সভায় শেখ মুজিবের তেজোদৃপ্ত ঘোষণা

(স্টাফ রিপোর্টার)

[illegible]



রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ঢাকায় আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিলের প্রথম সারিতে বামদিকের ব্যানার বহন করছেন লেখক মুহাম্মদ নূরুল কাদির। মাঝখানে ব্যারিষ্টার [illegible] আলী (সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি)। তাঁর পাশে আজিজুল হক (নান্না মিয়া), প্রথম মহিলা এডভোকেট কামরুন্নাহার লাইলীকে (মরহুম) দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের ব্যানার বহন করছেন আল-মুজাহিদ।

*Dhaka University Institutional Repository*



দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

# বাংলার উপকূল অঞ্চলে মহাপ্রলয়

## ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য প্রাণহানিঃ আট শতাধিক মৃতদেহ উদ্ধার

( ষ্টাফ রিপোর্টার )

## পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস



দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা

# বিদেশ হইতে আমদানী করা 'ইজম' বা 'সিস্টেম' নহে, দেশের মাটির সাথে সংযোগ রাখিয়াই শোষণহীন সমাজ গড়িব

১লা সেপ্টেম্বর হইতে মহকুমাগুলি জেলা হইবে

বাকশাল কোন সাধারণ

*Dhaka University Institutional Repository*

INDO-SOVIET SPECIAL

BLITZ

INDIA'S GREATEST WEEKLY

EVERY SATURDAY PRICE 30 PAISE

# *Pak saboteurs trained by US & Chinese experts*

NEW DELHI: Although newspaper reports of the MUKTI BAHINI operations in Bangla Desh have been cheering one up lately, the scale of the activities, according to political observers, is too inadequate.

ON THE OTHER HAND, REPORTS REACHING DELHI SPEAK OF A PAKISTANI PLOT OF MASSIVE INFILTRATION OF TRAINED SABOTEURS TO DISRUPT OUR COMMUNICATIONS AND TRANSPORT. THE RECENT DERAILING OF GOODS TRAINS SEEMS TO BE THE BEGINNING OF THIS OPERATION.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# SAVE MUJIB... HANG YAHYA!

— R. K. KARANJIA

THE PARANOID YAHYA KHAN AND HIS MORONIC YAHOOS are evidently not satisfied with the rape and murder of a whole state of 75 million people.

THEIR blood-thirst has not been appeased by the savage and merciless slaughter of 500 thousand innocent men, women and children, nor by the barbarous expulsion from their homes and land of 10 million people.

IT does not gratify their sadistic bestiality that while cities, townships and villages have been napalm-bombed and exterminated with cannon and rocket fire, that almost every structure has been razed to the ground, and that the famed rivers of Bangla Desh today flow red with human blood or are choked with the masses of human corpses thrown into them.

THE blood-intoxicated brutes thirst for more blood.

HAVING committed History's vilest crime of genocide against a whole land and its people, they now want to wipe out the leader and symbol of their revolution.

THEY have put BANGA BANDHU MUJIB-UR-REHMAN on a typical Yahoo mis-trial on fabricated charges of high treason and conspiracy against the State; and Yahya Khan has shamelessly proclaimed the judgment even before the impeachment began with his sanguinary announcement that his victim would be dead by the month's end.

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ শহীদ মিনারের সামনে বিশাল সমাবেশ

*Dhaka University Institutional Repository*

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
******

INDIAN NEWS REVIEW

Bombay, Asadha 31,1893
July 22,1971

The impressions of Mr. Nurul Quadir, a close associate of Sheikh Mujibur Rehman, over the present state of affairs of Bangla Desh are recorded by the latest Indian News Review which will be released all over India in the cinema houses on Friday, July 23.

Among other items also recorded by the latest News Review are the formation of a new Ministry in Rajasthan, a mass Vasectomy Camp at Ernakulam, Shankar's International Children's Art Exhibition at Ahmedabad, the solvent extraction plant of the Oil Technological Research Institute at Anantapur in Andhra Pradesh, glimpses of a modern plant near Madras for manufacturing the cardiograph paper and the Bangalore Derby race.

The Regional Round-up (North) covers the presentation of Punjab Government's literary awards for 1970-71, a nutrition programme at Amritsar, anti-polio vaccine campaign in New Delhi, and the 552nd Urs of the saint Hazrat Syed Badiuddin at Makanpur in Uttar Pradesh.

BLM/mk.
22.7.'71/13.00/By-398

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো / ইন্ডিয়ান নিউজ রিভিউ/২২শে জুলাই, ১৯৭১ বোম্বে থেকে প্রকাশিত সার্কুলার। উক্ত সার্কুলারে বলা হয়েছে- মুহাম্মদ নূরুল কাদিরের মুক্তি ইন্টারভিউ সমগ্র ভারতে সিনেমা হল সমূহে ২৩শে জুলাই, ১৯৭১ থেকে দেখানো হবে।

একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বিশাল নারী মিছিল।

একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বিশাল জনসমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দৃশ্য।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাচীনতম দৈনিক

আজাদ

The Azad

# মুক্ত মানব শেখ মুজিব

# আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত

এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে এসো জনতার মুখরিত সখ্যে

নেপথ্য প্রস্তাব?

ভাসানীর স্বাধে মুজিব

মনি সিংসহ ৩৪ জন রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

পুরানো

মুক্ত মানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



*Portrait of a dauntless fighter...*

## Mujib has inherited Netaji Bose's legacy

What we can do...



স্নেহপরায়ণ পিতা শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনাকে আদর করছেন

১৯৭১ সালে বোম্বে থেকে প্রকাশিত "BLITZ" পত্রিকার একটি প্রতিবেদন।

*Dhaka University Institutional Repository*

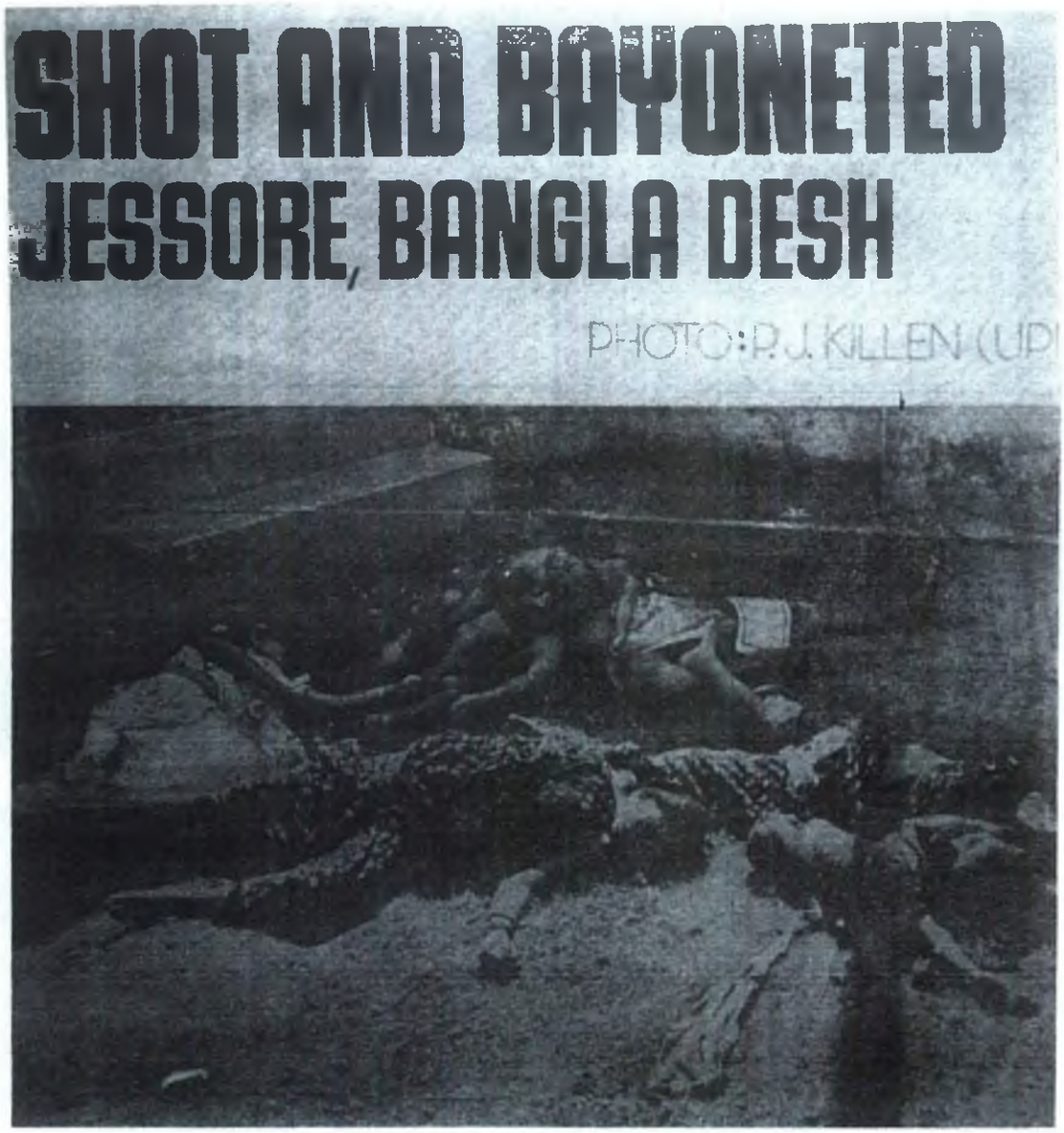


১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধ সময় যশোরে গণহত্যার দৃশ্য। ইউ.পি.আই এর পি.জে. কিলেন ছবিটি তুলেছিলেন

*Dhaka University Institutional Repository*

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

জয়বাংলা

# সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী হানাদারদের বিতাড়িত করবেই——মওলানা ভাসানী—

পিকিংপন্থী বাংলা দেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা, অশীতিপর বৃদ্ধ জন-নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছেন তাতে তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। জয় তাদের হবেই।

মওলানা সাহেব ঘোষণা করেন যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষ হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করে বাংলাদেশের পবিত্র ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবেই।

গত ২১শে মে বাংলা দেশের কোন এক জায়গায় অবস্থানরত বিশ্বের প্রবীনতম রাজনীতিকদের অন্যতম মওলানা ভাসানী সাপ্তাহিক 'জয়-বাংলার' আত্ম-প্রকাশকে অভিনন্দিত করে প্রদত্ত এক বাণীতে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

উক্ত বাণীতে বয়োবৃদ্ধ জন-নেতা মওলানা ভাসানী বলেন "বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এক অসম অনড় মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছেন। ইতিহাসের এই মহালগ্নে মরণ-বিজয়ী নিরস্ত্র জনসাধারণকে পথ নির্দেশের জন্য আজ বলিষ্ঠ একটা সংবাদ-পত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য 'জয় বাংলা' সাপ্তাহিকটির প্রকাশ একটা সঠিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আমি এই সাপ্তাহিকের সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করি, এবং কর্মীদের মোবারকবাদ জানাই।

আমার স্থির-বিশ্বাস আছে যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ হানাদারবাহিনীকে পরাভূত করে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবেই ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের সু-নিশ্চিত। জয় বাংলা।"

২৪/৫/৭১

## সংগ্রামী বাঙ্গালীর প্রতি সম্মান

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

Mr. Md. Nurul Quadir, Advocate, Dacca High Court, an Awami League representative from 'Bangla Desh' is going to U.N.O & other countries to let them know the real massacre and genocide of the unarmed innocent Bengalees by the brutal force of the West Pakistani Army. I, on behalf of Awami League of Bangla Desh appeal to you all to give him all possible help and co-operation so that 75 million of Bengalees may be saved from the further continuous genocide done by the West Pakistani army every day in whole of Bangla Desh.

[illegible signature]

(PROF. MD. YUSUF ALI)
Member of the National Assembly.
Chief Whip, Awami League Parliamentary Party, Dacca.
Member of the Awami League Parliamentary Board.
Member, All-Pakistan Awami League Executive Committee (now defunct).

Dinajpur
Bangla Desh
1st April, 1971.

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেয়ে যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মুহাম্মদ নূরুল কাদির ভ্রাম্যমাণ কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারেন সেই জন্যে কলকাতা এম.পি. হোস্টেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিনের রুমে বসে এই অনুমতি পত্রটি আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ তাৎক্ষণিকভাবে লিখেছিলেন, অবশ্য তিনি তারিখ দিয়েছিলেন - দিনাজপুর, বাংলাদেশ, ১লা এপ্রিল, ১৯৭১

*Dhaka University Institutional Repository*

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পিতামাতা।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগরে বাংলাদেশের মন্ত্রীপরিষদ প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করার পর ইংল্যান্ডের মহামান্য রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নিকট অভেদ্য বার্তা প্রেরণ করেন যার ফলশ্রুতিতে প্রবাসী সরকার লন্ডনে প্রবাসী সরকারের দ্বিতীয় রাজধানী (Second working capital) হিসেবে বেছে নিয়ে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশ্ব জনমত গঠনের কাজে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রবাসী সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, যাঁর প্রতি মহামান্য রাণীর সরকারের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। সৌজন্যে : মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম। লেখক : মুসা সাদিক।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন দেশ সফরে বের হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হোয়াইট হাউসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে দেখা করেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

# গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

(২২ ডিসেম্বর'৭১ - ১০ জানুয়ারী ১৯৭২)

শেখ মুজিবুর রহমান
রাষ্ট্রপতি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

তাজউদ্দিন আহমেদ
প্রধানমন্ত্রী

## প্রথম মন্ত্রি- সভা সম্প্রসারন

খোন্দকার মোশতাক আহমেদ
আইন ও সংসদীয়
[illegible] ভূমিরাজস্ব

এম মনসুর আলী
অর্থ, বানিজ্য ও শিল্প

এ এইচ এম কামরুজ্জামান
স্বরাষ্ট্র, ত্রান ও পুর্নবাসন

শেখ আব্দুল আজিজ
যোগাযোগ

ফনীভূষন মজুমদার
খাদ্য ও কৃষি, স্থানীয় সরকার

আলহাজ্জ জহুর আহমেদ চৌধুরী
স্বাস্থ্য, শ্রম ও পরিবার পরিকল্পনা

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
শিক্ষা, পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ

আব্দুস সামাদ আজাদ
পররাষ্ট্র

*Dhaka University Institutional Repository*

## আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল

### INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

[signature]

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi [signature]

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর নিকট ৯১,৫৪৯ জন সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের পর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক দলিলের প্রতিলিপি



ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ শীতের পড়ন্ত বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়) পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পক্ষে লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী, সামরিক আইন প্রশাসক জোন-বি এবং কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান) মিত্রবাহিনীর কাছে ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করছেন। পাশে বসে আছেন লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা, পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং প্রধান। উক্ত অনুষ্ঠানে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার (বাম থেকে প্রথম)